LIBRARY

SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM

BHADAINI, VARANASI-1

No. 3/139

Book should be returned by date (last) noted below
or re-issue arranged. Otherwise a fine of 10 Paise
daily shall have to be paid.

LIBRARY
No.... 9/A0
Shri Shri ... mayee Ashram
BANARAS. 3/139

9/120 3/139

মহর্ষি রমণ

LIBRARY
No. 9/120
BANARAS 3/139

শ্রীবিষ্ণুপদ কীর্ত্তি

৭/৮০
3/139

মহর্ষি রমণ

শ্রীবিভূপদ কীর্ত্তি

LIBRARY 3/139
No.....৭/৮০
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

শেফালিকা প্রকাশনী
৬৪ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মহেশ লাইব্রেরী
পুস্তক-বিক্রেতা।
২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
(কলেজ স্কোয়ার) কলিকাতা-১২

দ্বিতীয় সংস্করণ
১লা আশ্বিন, ১৩৭০

প্রকাশিকা
শ্রীমতী শেফালিকা কীর্তি
শেফালিকা প্রকাশনী
হার্ভার্ড কলেজ ভবন
৬৪ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর
শ্রীকমল ভট্টাচার্য
লক্ষ্মী প্রিন্টিং য়্যাণ্ড কোং
৭ শুঁড়া ক্রশ লেন
কলিকাতা-১০

দাম : চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

3/139
৭/১৪০

আমার বাবা-মায়ের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদিত
এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি নান্তুর হাত দিয়ে তাদেরই
হাতে অর্পণ করলাম যারা একে উত্তরাধি-
কারীর শ্রদ্ধায় গ্রহণ করবে। রুমু, মনীষী
এদের সর্বাগ্রগণ্য। এই সঙ্গে আছে,
স্নেহমাসীমা, রেণু, বৌমা, টুটু, সমু,
কৃষ্ণা, সাধু, বুজু এবং টুলটুল—
আমার কাছে যার আদরের
নাম বাব্‌জু, এবং যার
পোশাকী নাম মৈনাক
বসু, বি. এ. (হন্‌স্)।

২৯শে শ্রাবণ, ১৩৭০

বিভুপদ কীর্তি

LIBRARY
No.....
Shri Shri ...

LIBRARY
No.....
Shri Shri ma Anandamayee Ashram
BANARAS

অরুণাচলেশ্বর রমণ

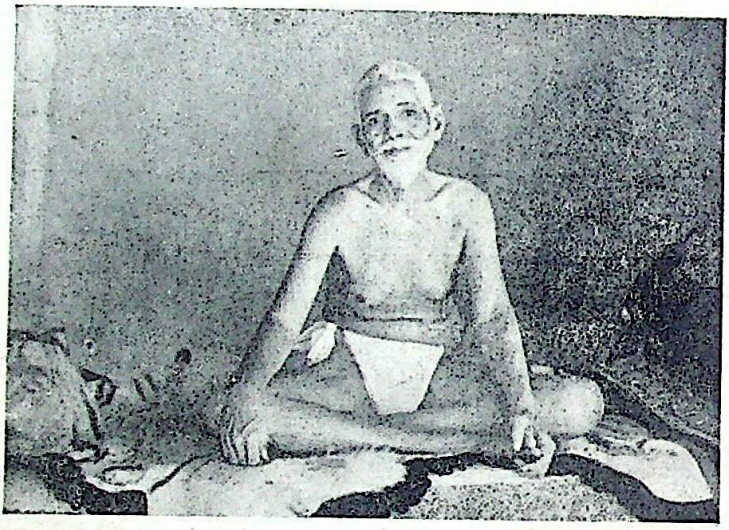

জীবন-সায়াহ্নে রমণ

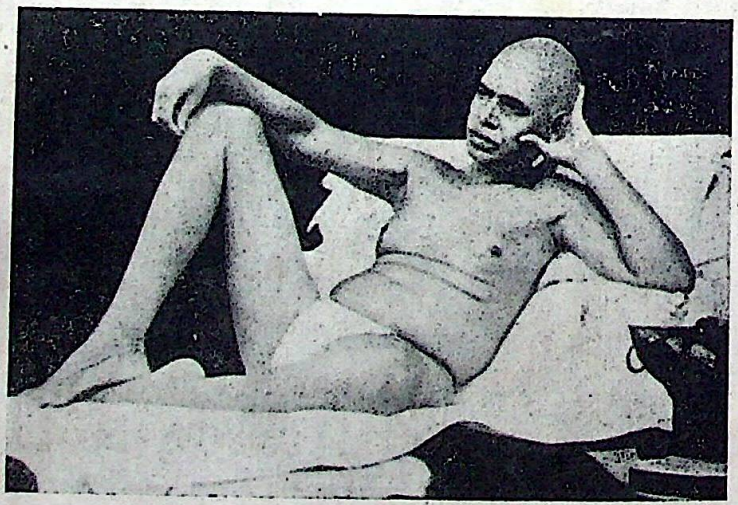

চিরদিনের একা

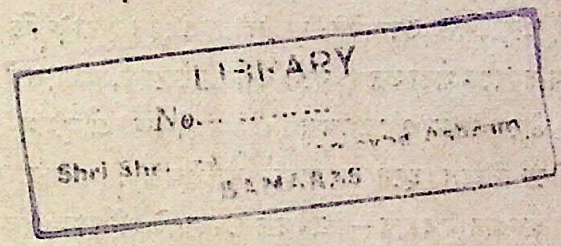

এই সেদিন, ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৪৬ সাল, মহর্ষি রমণের সাধনার জীবনে পঞ্চাশ বৎসর অতিক্রান্ত হ'ল। অরুণাচলের পুণ্যতীর্থে সমবেত হলেন শ্রদ্ধা-ভক্তি-প্রণিপাতের অর্ঘ্য নিয়ে দিক-দিগন্তের অগণিত, খ্যাত-অখ্যাত পূজারীর দল। বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন ভাব, বিভিন্ন দেশ-কাল-পাত্রের বিরুদ্ধ আবেষ্টনকে অতিক্রম ক'রে পরিচয়ের স্রোতগুলি কেমন ক'রে যে পথ চিনে এসে হাজির হ'ল মহামিলনের সাগর-সঙ্গমে—এ এক আশ্চর্য সংঘটন। কিন্তু যাঁকে অবলম্বন ক'রে এবং কেন্দ্র ক'রে ঘটে গেল এই অভিনব সমাবেশ, আশ্চর্য বস্তু হিসাবে তাঁর তুলনা সচরাচর মেলে না।

সাতষট্টি বৎসরের এই পুরুষোত্তমের পদপ্রান্তে যাঁরা দেশ-দেশান্তর থেকে ছুটে এসে তিরুভান্নামালাইয়ে সমবেত হলেন, তাঁদের সঙ্গে এই সর্বত্যাগী নিষ্ক্রিয় নিস্ত্রৈগুণ্য একক মানুষটির কোথায় কি যোগ ছিল কে জানে! কোথায় প্যারিস, কোথায় নিউইয়র্ক, কোথায় জুরিখ্, কোথায় অক্সফোর্ড, কোথায় ক্যালিফর্নিয়া, কোথায় চেকোস্লোভ্যাকিয়া কোথায় সুইট্জারল্যাণ্ড—আর কোথায় এই অখ্যাত অজ্ঞাত গণ্ডগ্রাম। যাঁর অলোকসামান্য সাধনা বা সিদ্ধির পরিচয় কেউ জানে না, তাঁরই অনায়াস অনন্যতন্ত্র সাধনার পঞ্চাশোত্তম বৎসরে এমনতর আশ্চর্য

প্রশস্তির শ্রদ্ধাঞ্জলি বহন ক'রে স্বনামধন্য এত মনীষী কেমন ক'রে এসে এভাবে সমবেত হলেন, তার যৎসামান্য ইঙ্গিতমাত্র পাওয়া যাবে এই উপলক্ষে প্রকাশিত শুভেনির বা স্মারকগ্রন্থে। রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণ পরমপুরুষ রমণকে সত্যস্বরূপ বলে বর্ণনা করেছেন, অধ্যাপক রিচার্ডসন বলেছেন তাঁকে জ্ঞান ও প্রেমস্বরূপ। অধ্যাপক গ্রীন্‌লেস্ তাঁর কথা বলতে গিয়ে বিহ্বল হয়ে বলেছেন শান্তিস্বরূপ, মেজর স্যাড্‌উইক বলেছেন করুণার অবতার—প্রেমস্বরূপ, ক্যালিফর্নিয়ার এলিয়েনর নয় তাঁকে দেহধারী পরমেশ্বরের রূপে প্রত্যক্ষ করেছেন। দেশী-বিদেশী, খ্যাত-অখ্যাত কত লোক কত ভাবে মহর্ষির চরণে দিয়েছেন শ্রদ্ধা-ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি। কিন্তু এ সমস্ত কিছুর মাঝখানে রমণ রয়ে গেছেন চিরদিনের অজ্ঞাত: মন দিয়ে যাঁকে জানা যায় না, কথা দিয়ে যাঁকে বলা যায় না।

পঞ্চাশ বছর পূর্বে, মাত্র সতেরো বছরের কিশোর ছেলেটি কোন্ অলক্ষ্যের আহ্বানে গৃহত্যাগ ক'রে, পরিচিত জীবনের ও অভ্যস্ত জগতের মায়া কাটিয়ে অদৃষ্টপূর্ব অরুণাচলের পাদমূলে যেদিন নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন, সেদিনটি ছিল ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর। 'অলক্ষ্যের আহ্বান' কথাটির যে এ ক্ষেত্রে সার্থকতা আছে, তার প্রমাণ মহর্ষির সমগ্র জীবন। কে যে কোথা থেকে কেমন ক'রে এসে, সবার অজ্ঞাতসারে কিশোর মনটিকে নিয়ে কি খেলা খেলে গেল, তার পরিচয় হয়তো বা একমাত্র মহর্ষি রমণই জানেন। লৌকিক ভাবে গুরু, মন্ত্রদাতা, পথপ্রদর্শক বলতে যা বোঝায়—এমন কোন যোগাযোগ তাঁর জীবনের মূলে কোনদিন ঘটেছিলো বলে সন্ধান পাওয়া যায় না। অথচ সেই কারণে অলৌকিক প্রাপ্তির বা পরিণতির কিছুমাত্র ব্যাঘাত কোথাও ঘটেছে বলে মনে হয় না। বরং মনে হয়, এই আত্মসমাহিত আত্মোপলব্ধির জীবনে যেভাবে যেটুকুই ঘটেছে সেটুকুই তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে হয়ে আছে অনুপম। বাইরে থেকে আহরণ ক'রে যোগ করবারও যেমন

কিছু ছিল না, অতিরিক্ত বোধে বাদ দেবারও তেমনি কোথাও কিছু ছিল না।

মহর্ষি রমণের শৈশব-জীবনের বিবরণ কতটুকুই বা আমরা জানি! বাইরে থেকে দেখলে ওই বয়সের আর পাঁচটা ছেলের চিরাচরিত জীবন-যাত্রা থেকে এমন কোন পার্থক্যই চোখে পড়ে না। পড়াশুনায় আগ্রহ ছিলো না,—ক'টা ছেলেরই বা থাকে? বারো বৎসর বয়স কালে পিতা সুন্দরম্ আয়ার তিনটি নাবালক ছেলের দায়িত্ব কাটিয়ে লোকান্তরে প্রস্থান করেছেন। দাদাদের বয়সও শাসন-কার্য রীতিমতভাবে চালাবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। বাকি রইলেন বিধবা মা; সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব তাঁর স্কন্ধে। এমনতর অবস্থায় মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষাব্যবস্থা বিদ্যায়তনের মধ্যেই থাকে সীমাবদ্ধ হয়ে। রমণের বেলাতেও তাই হয়েছিলো। পাঠশালার প্রাচীরের বাইরে যে অবারিত খেলার মাঠ দিগন্তব্যাপী আনন্দলোকের আবেদন এনে পৌঁছে দেয় কিশোর মনের দ্বারে, রমণের মনের আকর্ষণটাও ছিলো কতকটা সেই-দিকেই। কিন্তু সেখানেও তিনি যে পরিপূর্ণভাবে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারেন নি, তার প্রমাণ আছে।

বছর দশেক মাত্র যখন তাঁর বয়স তখন থেকেই কেমন একটা তন্দ্রাতুর আচ্ছন্নতার ভাব প্রায়ই তাঁকে পেয়ে বসতো। আধ-জাগা ঘুমঘোরে কখনো বা কাটতো রাতের পরে রাত; কখনো বা নিদ্রা হয়ে উঠতো অচৈতন্যের মতই গভীর। সহপাঠি দুরন্ত বালকেরা সুবিধা পেলেই এই সুযোগে নানা ভাবে করতো তাঁকে নির্যাতন। রীতিমত জেগে আছেন, চলাফেরায় কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নেই; যন্ত্রচালিতের মত বহু পথ ঘুরে এলেন সঙ্গীদের পরিচালনায়—অথচ এর মধ্যে একবারও তিনি জাগেন নি। কে জানে, কেন অবস্থাটিকে অস্বাভাবিক বলে কারুর মনে হয় নি। বালকের স্বাস্থ্য ভালই—একটু বেশি ঘুমায় বলে দুশ্চিন্তার কোন হেতু ছিল না। অতএব এদিকে বিশেষ ভাবে কারুর

দৃষ্টিও পড়ে নি। এমন সময় নিঃশব্দে ঘটে গেল রমণের জীবনে এক আকস্মিক বিপর্যয়। বাইরের জীবন ও জগত যেমন ছিল রয়ে গেল ঠিক তেমনিই; অন্তরলোকে ঘটে গেল এক নিমেষে সহসা এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন।

কিশোর বালকের এই উৎকট নিদ্রালুতার ব্যাপারটি যে তুচ্ছ করবার মত ছিল না, তা বোঝা যায় মহর্ষির নিজের উক্তি থেকে। 'ডিণ্ডিগালে যখন ছিলাম তখন আমি এগারো বছরের বালক মাত্র। কি একটা উৎসব উপলক্ষে বাড়ির সবাই গেছে মন্দিরে পূজা দিতে। একা বাইরের ঘরে বসে আমি পড়াশুনা করছি। কিছুক্ষণ বাদে নিদ্রাকর্ষণ বোধ ক'রে, আমি সেই ঘরের দরজা জানালা বেশ ক'রে বন্ধ ক'রে ঘুমিয়ে পড়লাম। অনেক রাত্রে পূজা সাঙ্গ ক'রে সবাই যখন বাড়ি ফিরলো, তখনই বেধে গেল গোলযোগ। দরজায় বারংবার ধাক্কা দিয়ে, উচ্চৈঃস্বরে ডাকাডাকি ক'রে কিছুতেই যখন আমার সাড়া পাওয়া গেল না, তখন নিতান্ত নিরুপায় হয়ে সামনের বাড়ি থেকে চাবি ধার ক'রে এনে কোন গতিকে ঘরের লোকেরা ঘরে প্রবেশ করে দেখলো আমি অঘোরে ঘুমিয়ে আছি। তার পরে আমাকে জাগাবার জন্য ঠেলাঠেলি, ধাক্কাধাক্কি মারধোর চললো: চিমটি গাঁট্টা চড় কিছুই বাদ গেল না। কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। আমার সেই কালঘুম ভাঙাবার সাধ্য কারুর হ'ল না। শেষ পর্যন্ত শুনেছিলাম তারা আমাকে চ্যাংদোলা ক'রে তুলে নিজের বিছানায় শুইয়ে দিয়ে তবে রেহাই পায়। কে জানে, কেমন ছিল আমার সেই ঘুম! কেউ কেউ নাকি বলেছে সে ছিল এক ধরনের স্নায়ুর রোগ। যার যা খুশি বলুক: এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কি?'

আর একবার কাকার বাড়ির দোতলার ঘরে রমণ একা বসেছিলেন তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবে। শরীরে কোন গ্লানি নেই। সহসা বিনা কারণে তাঁর সমগ্র চেতনাকে আচ্ছন্ন ক'রে এসে উপস্থিত হ'ল মৃত্যুভয়। তাঁর

মনে হ'ল এখনি তাঁর মৃত্যু হবে। কেন মৃত্যু হবে, কেমন ক'রে মৃত্যু হবে—এ আশঙ্কার ভিত্তি কি, এসব চিন্তার বা যুক্তির তখন অবসর ছিল না। মনে হ'ল মৃত্যু নিশ্চিত এবং সন্নিকট। ডাক্তার ডাকার প্রয়োজন কিংবা গুরুজনদের জানানোর প্রয়োজনও মনে এলো না। তখনকার মনের ভাবটি তাঁর নিজের ভাষায় যেভাবে তিনি বলেছেন, অবিকল সেই ভাবেই দেওয়া হ'ল ঃ

"মৃত্যুভয়ের সম্মুখীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার চিন্তাস্রোত হয়ে গেল অন্তর্মুখী। নিঃশব্দ ভাবনা হ'ল শুরু ঃ এইতো মৃত্যু এলো। এর অর্থ কি ? মৃত্যু হচ্ছে কিসের ? মরে তো এই দেহটাই। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর স্বরূপটি নিখুঁত ক'রে ফুটিয়ে তোলবার প্রয়োজনে হাত-পা টান ক'রে ছড়িয়ে কাঠ হয়ে রইলাম পড়ে। ওষ্ঠাধর চেপে হয়ে রইলাম রুদ্ধশ্বাস ঃ 'আমি' বা অন্য কোন শব্দোচ্চারণের পথও হ'ল বন্ধ। তখন ভাবলাম এইতো এবার দেহ হয়েছে মৃত। শ্মশানে গিয়ে ছাই হবে এবার এই দেহ। কিন্তু দেহের সঙ্গে সঙ্গে 'আমি'ও কি পুড়ে ছাই হ'ব ? দেহটাই কি 'আমি' ? নিথর নিস্পন্দ আমার দেহ। কিন্তু আমার ব্যক্তিত্ব রয়েছে পূর্ণমাত্রায় জাগ্রত। দেহাতীত সত্ত্বা ধ্বনিত হচ্ছে আমিত্বের রূপে। অতএব আমি নিশ্চয়ই দেহের বাইরে—দেহ ছাড়িয়ে, আর একটা কিছু। মরে এই বাস্তব দেহটা। ইন্দ্রিয়াতীত সত্ত্বাকে মৃত্যু পারে না স্পর্শ করতে। সেই মৃত্যুহীন সত্ত্বাই তো 'আমি'।"

"বুদ্ধিগ্রাহ্য যুক্তির রূপে একটির পর আর একটি ক'রে চিন্তাগুলি আসে নি। একসঙ্গে ঝল্‌সে উঠলো আমার সামনে যেন জীবন্ত সত্যের সমগ্র স্বরূপটি—বিনা প্রশ্নে, বিনা তর্কে উদ্ভাসিত হ'ল আমার চৈতন্যে। আমার মধ্যেকার 'আমি'টা একমাত্র সত্যবস্তু বলে স্বীকৃত হ'ল নির্বিচারে আমার মনের কাছে। যাবতীয় দৈহিক ক্রিয়ার কেন্দ্রস্থল বলে বুঝে নিলাম আমার 'আমি'কে। সেই থেকে যেন

চিরদিনের মত রইলো এই 'আমি'র কেন্দ্রটি আমার চৈতন্য-জগতের মধ্যমণি হয়ে। মৃত্যুভয় সেই যে নিঃশেষে অন্তর্হিত হয়ে গেল—সেও গেল চিরদিনের জন্যই। সেইদিন থেকে আজ পর্যন্ত আছি আমি আমার মধ্যে মগ্ন হ'য়ে। অন্য চিন্তা আসে যায় একটি সুরের নানা তাল-মান-লয়ের মত, কিন্তু আসল সুরটি থাকে এসবের মাঝখানে আপনি অবিকৃত। পড়াশুনা কথাবার্তা ও অন্য সব কিছুর মাঝে 'আমি'র মধ্যে হয়ে থাকি কেন্দ্রস্থ। আমার জীবনের এই মহা-সন্ধিক্ষণ উপনীত হওয়ার আগে নিজের সম্বন্ধে কোনরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞান আমার ছিলো না;—নিজের মধ্যে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবার মতও ছিলো না কোন মনোভাব। এই নবজাত স্বভাবটি অচিরেই প্রভাব বিস্তার করলো আমার জীবনের মাঝখানে।"

"পড়াশুনা বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনের প্রতি যেটুকু আকর্ষণ ছিলো, প্রথমেই গেল সে-সব শিথিল হয়ে। কলের পুতুলের মত চললো পড়াশুনা। লোক দেখানোর জন্য বইখানি থাকতো চোখের সামনে খোলা, আর মন চলে যেতো লৌকিক পাঠ্য বিষয়কে অতিক্রম ক'রে অনেক—অনেক দূরে। আত্মীয়-বন্ধুদের প্রতি আমার আচরণ হয়ে উঠলো বিনীত, নম্র এবং উদাসীন। ইতিপূর্বে অতিরিক্ত পড়ার চাপ পড়লে করেছি অনুযোগ। সহপাঠি বালকেরা উপদ্রব করলে ইতিপূর্বে তারা সমুচিত শিক্ষা পেয়েছে আমারই কাছে। এখন সে সবেরই হয়ে গেল পরিবর্তন। এখন বোঝা আসুক, উপদ্রব অত্যাচার যা আসুক সবিনয়ে নিয়েছি স্বীকার ক'রে। যে ব্যক্তিত্বটি প্রতিবাদের দ্বারা সবলে করেছে আত্মপ্রতিষ্ঠা সে গেছে নিশ্চিহ্ন হয়ে। হাসিখেলা গেল ঘুচে। একা একা থাকতেই লাগতো ভাল। প্রায়ই নিঃসঙ্গে ধ্যানের আসনে চোখ বুজে নিরালায় থাকতাম বসে এবং নিজের মধ্যে তলিয়ে হারিয়ে যেতাম। আবিষ্টের মত থাকতাম আত্মসমাহিত হয়ে। দাদা আমাকে 'জ্ঞানী', 'যোগীশ্বর' ইত্যাদি বলে ব্যঙ্গ করতেন;

বলতেন, বনে গিয়ে ঋষিদের মত তপস্যা করতে। খাদ্যাখাদ্যের বিচারও ক্রমে লুপ্ত হয়ে গেল। স্বাদু, অস্বাদু, ভালোমন্দ যে-কোন খাদ্যই স্বাদ, গন্ধ, গুণ নির্বিশেষে আমি নির্বিকার ভাবে গলাধঃ-করণ ক'রে ফেলতাম।"

"আমার মধ্যে যে পরিবর্তনের স্রোতটি এসেছিল, তার সঙ্গে বাইরের আবেষ্টনের কিছুমাত্র যোগাযোগ আমি রাখতে দিই নি। আমার কি হয়েছে সে কথা ভালো করে বুঝি বা না বুঝি, সে যে একান্তভাবে আমার নিজস্ব গোপন ধন যা কারুর কাছে প্রকাশ করা চলে না,— এমনি একটা বোধ গোড়া থেকেই আমার সমগ্র মন জুড়ে থাকতো। পারিবারিক জীবনযাত্রার কেন্দ্রস্থলে অবস্থান ক'রেও কেমন ক'রে যেন আমি বুঝে নিয়েছিলাম যে পারিপার্শ্বিক কোন কিছুর সঙ্গে আমার কিছুমাত্র সম্বন্ধ নেই। অধ্যাত্মজ্ঞানের কিছুমাত্র না জেনেও আমি নিজের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে গিয়ে এই নবাগত ভাবের অদৃশ্য ইঙ্গিতে অভ্রান্তভাবে পরিচালিত হয়েছি। বাইরের দিক থেকে কিছুই বোঝবার উপায় ছিল না যে আমি ভিতরে ভিতরে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে কোন্ পথে চলেছি। তথাপি মাঝে মাঝে তাল কেটে গেছে; চারিদিকের সপ্রশ্ন দৃষ্টি এসে পড়েছে আমার উপরে। আসলে যে ব্যাপারটি কি, তা অনুমান করবার প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থ হয়েছে তখন যার যা খুশি সমালোচনা করেছে আমার এই আপাত-পরি-বর্তনের। কিন্তু স্বভাবসিদ্ধ ঔদাসীন্যে আমি সে সমস্তই উপেক্ষা করেছি।"

"নবজীবনের প্রারম্ভে মীনাক্ষীসুন্দরমের মন্দিরকে উপলক্ষ ক'রে ঘটলো আর একটি ঘটনার সূত্রপাত। বন্ধুদের সঙ্গে আগে সেখানে কখনো কখনো যাতায়াত করেছি। কপালে সিঁদুরের ফোঁটা কিংবা যজ্ঞ-ভস্ম ধারন ক'রে ঘরে ফিরে এসেছি। তাতে যে কোনরূপ ভাবান্তর বোধ করেছি এমন নয়। এখন যেন মন্দিরে যাওয়াটা প্রাত্যহিক নেশায়

পরিণত হ'ল। একা একা গিয়ে কতক্ষণ ধরে নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে থাকতাম শিব, মীনাক্ষী, নটরাজ অথবা অবতার পুরুষদের মূর্তির সামনে। সারাদেহে বয়ে যেত ভাবের তরঙ্গ। চোখের জলে বুক যেতো ভেসে। এমনি ক'রেই বুঝি জীবকে নিয়ে ঈশ্বরের খেলাটি ওঠে জমে। কখনো বা স্বতঃস্ফূর্ত প্রার্থনায় চিত্ত হয়ে উঠতো উচ্ছ্বসিত। বিশ্বনিয়ন্তা সৃষ্টিকর্তার কাছে ভিক্ষা করতাম ভক্তি। কিন্তু অধিকাংশ সময়েই প্রার্থনায় থাকতো না ভাষা। ভিতরে-বাহিরে গোপনে-গভীরে চলতো মৌনতার খেলা। বিনা আনন্দে, বিনা দুঃখে ধারা বেয়ে ঝরতো চোখের জল। জীবনের দুঃখ বলতে কিই বা আমি তখন জানি যে দুঃখবাদী হব! নির্বাণমুক্তি, পুনর্জন্মরোধ, বৈরাগ্যলাভ—এসবের অর্থও তখন আমার জানা নেই। সর্ব-বস্তুর অভ্যন্তরে যে অনুপম সত্তা সন্নিবিষ্ট হ'য়ে আছে তার সম্বন্ধে কোন ধারণাই আমার ছিল না। জানতাম না যে, এই সর্বগ্রাসী সত্তায় ঈশ্বর ও আমি উভয়েই হয়ে আছি ওতপ্রোত।..."

এই হ'ল শেষের ভাষায় বলা শুরুর ইতিকথা। প্রথম অধ্যায়েই আছে শেষের পরিচয়। আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে তাঁর জীবনে একটি মাত্র ছেদহীন, বিরতিহীন ধারার বহুবিস্তৃত প্রবাহিনী। তপস্যা ক'রে যাঁকে পেতে হয় বলে আমরা ধারণা করি, তিনি যেন এককালেই এসে জুড়ে বসলেন এই কিশোর বালকের চৈতন্যসত্তার মর্মস্থলে। ইচ্ছা অনিচ্ছা, গ্রহণ বর্জন, চাওয়া না চাওয়ার প্রশ্নটিই রইলো হয়ে আগাগোড়া অবান্তর। প্রার্থনার অন্তিম ফলটিই যখন অনায়াসে আপনি এসে নিজের গরজে হাজির হয়, তখনই বুঝি কৃতকৃতার্থ সাধক মহর্ষির মত ক'রে বলতে পারেন—"তপস্যায় নতুন ক'রে হবার তো কিছু আমি দেখি না। কিছু হওয়াটাই তো একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার। যা ছিলাম, তাই আমি আছি—থাকবোও তাই। এই যেমন, একবার তোয়ালেটা গেল

হারিয়ে। এঘর ওঘর খুঁজে বেড়ালাম; চৌকির পিছনে, টেবিলের তলায়, কলঘরের আনলায়, বিছানার পাশে—সম্ভব অসম্ভব নানাস্থানে তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে কোথাও আর সেটাকে দেখতে পেলাম না। সবাইকে ডেকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম, কেউ কিছু বলতে পারলো না। ভাবলাম সেটা হারিয়ে গেল; বানরেই নিয়ে গেল, না চোরেই চুরি করলো। মন থেকে তোয়ালের ভাবনাটা আর কিছুতেই যেতে চায় না। থেকে থেকে সেই কথাই মনে পড়ে। আশ্রমে থাকি; এখানকার কোন কিছুই তো আমার নিজস্ব নয়। হারাবার অধিকার আমার নেই। অথচ এমনি ক'রে তোয়ালেটা লোপাট হয়ে যাবে! হঠাৎ আবিষ্কার করলাম—সেই তোয়ালে, যাকে আমি খুঁজে খুঁজে হয়রান হচ্ছি, সেটা রয়েছে আমার নিজেরই কাঁধে। তপস্যার ব্যাপারটাও ঠিক তেমনি। যা ছিল তাই আছে। হয়েই যে আছি, তা জানি না বলেই এত রকমের হওয়ার প্রচেষ্টা। হয়ে যখন যায়, তখন দেখা যায় যে আগাগোড়া নতুন ক'রে হবার কিছু ছিল না।

মহর্ষির জীবনে যে অর্থপূর্ণ অধ্যায়টির কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে, এটি ঘটে তাঁর গৃহত্যাগের প্রায় ছয় সপ্তাহ আগে। এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন তাঁর জীবনের মর্মস্থল পর্যন্ত আলোড়িত ক'রে সমুদিত হ'ল এক অপূর্ব সত্ত্বা, অন্যদিকে তেমনি আবার শুরু হয়ে গেল পারিপার্শ্বিক জগতের সংঘর্ষময় প্রতিক্রিয়া। যে জীবনের অবসান ঘটেছে—স্বভাবতই দুঃসহ হয়ে উঠলো তার দাবী। পুরানো পাঠ্যপুস্তকগুলির মত অসহ্য হয়ে উঠেছে পুরানো জীবনযাত্রার পুনরাবৃত্তি। কর্তব্য বুদ্ধির অনুশাসন মেনে চলতো যে পুরানো মনটি তারও হয়েছে মৃত্যু। লৌকিকতার দোহাই দিয়ে কতদিন এ সংঘাতকে এড়িয়ে চলা যায়? বালকের মতিগতির পরিচয় পেয়ে কাকা, দাদা —সবাই প্রমাদ গণলেন। বুদ্ধিমন্ত ছেলেটা এমন ক'রে নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করবে! শিক্ষক অতিষ্ঠ হয়ে বেশি ক'রে পড়ার চাপ

দিতে শুরু করলেন। গার্হস্থ্য জীবনের স্বস্তি যখন ইপ্সিত পথের অন্তরায় রূপে দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে, তখন আর এই সব ছোটবড় অশান্তি-গুলির সঙ্গে আপোষ মীমাংসা সম্ভব নয়। কাজেই ধৈর্যের বাঁধ এবার ভাঙলো।

১৮৯৬ সালের ২৯শে আগস্ট, শনিবার। ছাত্রজীবনের লৌকিক খোলসটা অকস্মাৎ পড়লো খসে। ঘটনাটি সামান্যই। স্কুলের নির্দিষ্ট সংখ্যক লেখার শেষ হ'তে তখনো বাকি আছে। রমণের মনে হ'ল কেন এ অর্থহীন কর্মভোগ? বই-খাতাপত্র একপাশে ঠেলে রেখে ধ্যানের আসনে তিনি স্থির হয়ে রইলেন বসে। প্রহরায় ছিলো দাদার সজাগ দৃষ্টি। নেপথ্য ছেড়ে এবার দাদা সামনে এলেন; বললেন, 'মিথ্যে কেন যে এ পড়াশুনার বিড়ম্বনা!' ব্যঙ্গোক্তি হলেও কথাটি মূলতঃ সত্য। রমণের মনও সাড়া দিয়ে বললে, 'সত্যিই তো! এ অপকর্মের দায়ী আমি কেন হ'ব? যে কাজ আমার নয়, তার জন্য কেন এই প্রাণপাত আয়াস? এখানে আমার সত্যিই তো আর করণীয় কিছু নেই!' সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে চমক মেরে উঠলো কিছুদিন আগে শোনা অরুণাচল নামটি। রমণের ভবিষ্যৎ হয়ে গেল নির্ধারিত।

অরুণাচল! কি সে, কোথায় সে? বালক রমণের সঙ্গে তার যোগ কোথায়? অরুণাচল নামটির মধ্যে কি ইঙ্গিত ছিলো লুকানো? মাদুরা ছেড়ে যাবার বছর খানেক আগে এক আত্মীয়ের মুখে 'অরুণাচল' নামটির উল্লেখ শুনেই বালক রমণ উৎকর্ণ হ'য়ে উঠেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিলো নামটি যেন বড় প্রিয়, বড় পবিত্র, বড় পরিচিত। অধীর বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে তিনি তাকিয়েছিলেন অরুণাচল প্রত্যাগত আত্মীয়টির মুখের পানে। দুর্লভ অরুণাচল তীর্থের ফেরৎ এক ব্যক্তিকে সাক্ষাৎ চোখে দেখা—এ যেন এক অপ্রত্যাশিত, অসম্ভব সৌভাগ্য। প্রথম বিস্ময়ের চমক ভাঙলে তিনি

জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কোথায় এই অরুণাচল?' বালকের অজ্ঞতায় ভদ্রলোকটি কৌতুক বোধ করেছিলেন। বলেছিলেন 'তাও জানো না? তিরুভান্নামালাইয়ের নাম শুনেছ? সেইখানেই অরুণাচল পর্বত!' পটভূমিকা এইটুকু। কিন্তু তার পিছনে আরও কি ছিল, কে জানে?

গৃহত্যাগের সঙ্কল্প স্থির হয়ে গেছে। পথের নির্দেশও মিলেছে। কালবিলম্ব করা আর চলে না। অপ্রত্যাশিতভাবে জুটে গেল পাথেয়। পরের দিনই অর্থাৎ ১৮৯৬ সালের ৩০শে আগস্ট তারিখে সকলের অজ্ঞাতসারে গৃহত্যাগী বালকের ঈশ্বর সন্ধানে যাত্রা হ'ল শুরু। যে বিদায়লিপিখানি স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ তিনি গেলেন রেখে, তাতেই স্পষ্ট হয়ে আছে তাঁর সঙ্কল্প। ভ্রাতার উদ্দেশে লিখিত চিঠিখানি অবিকল এইরূপ:

'আমার পিতার সন্ধানে, তাঁরই আদেশক্রমে আমি যাত্রা করছি এই স্থান হ'তে। সাধু সঙ্কল্প আছে এই যাত্রার মূলে। অতএব এ কার্যের জন্য কারুর দুঃখ করবার প্রয়োজন নেই। একে খুঁজে বার করবার জন্য অর্থব্যয়েরও প্রয়োজন নেই।'

সংক্ষিপ্ত লিপি। ভাবাবেগের বাষ্পটুকুও এর কোনখানে নেই। অথচ প্রিয়জনের প্রতি কর্তব্যজ্ঞান ও মমতার নিদর্শন এর মধ্যে আছে। কিন্তু আসক্তির কোন চিহ্ন নেই। পরিচিত আত্মজনের সান্নিধ্যত্যাগ-জনিত মর্মপীড়া, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশঙ্কা, গৃহ-ত্যাগের আকুলতা ইত্যাদি যেসব ভাব আমরা সাধারণতঃ অনুরূপ অবস্থায় কল্পনা করতে পারি, সেসবের কোন কিছুই এখানে মেলে না। সবল সুস্থ নিস্পৃহ সহজ মনোভাবের নিদর্শন হিসাবে চিঠিখানির নিরুদ্বেগ সান্ত্বনা মনকে স্পর্শ করে। অথচ এ চিঠিখানির মধ্যে পুনর্মিলনের প্রতিশ্রুতি কোথাও নেই। পিতার সন্তান, পিতৃ পরিচয় জ্ঞাত হ'য়ে চলেছে আপন জন্মগত অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি নিয়ে।

পরগৃহে বাসের মেয়াদ হ'ল শেষ। অবশ্যম্ভাবী এই বিচ্ছেদের জন্য দুঃখ নিষ্প্রয়োজন, অসম্ভব প্রত্যাগমনের সংঘটন-কল্পে অর্থব্যয়ও নিষ্প্রয়োজন। এইটুকু মাত্র তাঁর বিদায়কালীন বক্তব্য।

দ্বিপ্রহরের খররৌদ্রকর শিয়রে নিয়ে ভেংকাটারমণের যাত্রা হ'ল শুরু। স্টেশন মাত্র মাইল খানেকের পথ। গন্তব্য পথের সঠিক বিবরণ জানলে টিকিট কিনে ট্রেনে চড়া নির্বিঘ্নেই হতে পারতো। কিন্তু তিরুভান্নামালাই আর অরুণাচলের অতিরিক্ত আর কিছুই তো জানা ছিল না। অতএব মোটামুটি যে ট্রেনটি ওই পথের বলে মনে হ'ল, তাতেই তিনি চড়ে বসলেন। রেলের টিকিটখানি ছাড়া পাথেয় বিশেষ কিছুই রইলো না। কিন্তু এসব চিন্তার স্থান বা অবসর ছিলো কোথায়? ততক্ষণে ক্ষুধাতৃষ্ণা সব কিছু হরণ করে স্ব-ভাবটিই উঠেছে প্রবল হয়ে। এই ভাবে কতক পথ ট্রেনে, কতক পথ হেঁটে, কখনো জাগ্রত, কখনো সমাধিস্থ অবস্থায় বহু পথ অতিক্রম ক'রে অরুণাচলেশ্বরের মন্দিরে এসে রমণ উপনীত হলেন। প্রবাসী ফিরে এলো পিতৃগৃহে।

কর্মসঙ্কুল সঙ্কীর্ণ লোকালয়ের সান্নিধ্য থেকে জনারণ্যের দ্বার ঠেলে রমণ আপন সত্তার জনবিরল নির্জনতায় তাঁর নিজের স্থানটি পেলেন খুঁজে। এবার যা কিছু বোঝাপড়া সব নিজের সাথে। দায়িত্ব নেই, কাজ নেই, কর্তব্য নেই, পড়াশুনার চাপ নেই, অভিভাবকের শাসন নেই। পথে ক্ষুৎপিপাসাতুর বালকের প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে স্বেচ্ছায় একজন বণিক দিয়েছিলেন কিছু মিষ্টান্ন। তার খানিকটা ছিল বস্ত্রের প্রান্তে বাঁধা। এ সঞ্চয়ের প্রয়োজন এখন ফুরিয়েছে। তাই মন্দিরে প্রবেশের প্রাক্কালে তাঁর মনে হ'ল—জড় দেহটাকে মিষ্টান্ন দিয়ে আর কি হবে? সঙ্গে সঙ্গে সেগুলিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হলেন ভারমুক্ত। উপবীত দিলেন বিসর্জন, মস্তক করলেন মুণ্ডিত, নিষ্প্রয়োজন আবরণ-ভার পরিত্যাগ ক'রে ধারন

করলেন কৌপিন। স্নানের কথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাবলেন, জড় দেহটার আবার স্নান কিসের? ফিরে চললেন মন্দিরের দিকে। কিন্তু অকস্মাৎ পথের মধ্যে নামলো বৃষ্টি। সরোবরের জলের পরিবর্তে দিব্যধারায় অভিষিক্ত হ'ল উপেক্ষিত জড়দেহ। তখনই, সেই অবস্থায়, বর্ষণ-সিক্ত দেহে রমণ মন্দিরের অভ্যন্তরে করলেন প্রবেশ এবং সঙ্গে সঙ্গে গভীর আত্মসমাধির অতল তলে গেলেন তলিয়ে।

স্বপ্নের অরুণাচল বাস্তবে হ'ল পরিণত। কিন্তু কার কাছে? রমণ নামে যে ব্যক্তিটি ছিল, তাঁর সমগ্র অস্তিত্ব ততক্ষণে গেছে আচ্ছাদিত হয়ে, লুপ্ত হয়ে। অরুণাচলেশ্বর তাঁকে আত্মসাৎ করে গ্রাস ক'রে নিয়েছেন। অরুণাচল ও রমণের মধ্যে কে কাকে অবলম্বন ক'রে নিজেকে লাভ করলেন, কে বলবে?

প্রথমেই ওঠে অরুণাচলের কথা। দেবতার লীলাভূমি অরুণাচল দাক্ষিণাত্যের সর্বজনবিদিত পুণ্যতীর্থ। বৎসরে বৎসরে, যুগ-যুগান্তর ধরে, দূর-দূরান্তরের পুণ্যকামীর দল হন সমবেত; নির্জন নিস্তব্ধ পার্বত্যভূমি বহু জনসমাগমে হয়ে ওঠে মুখরিত। দশদিন ধরে চলে এই কার্তিকী-উৎসব। শেষদিন পর্বত শিখরে 'কৃত্তিকাদীপম্' নামে বিরাট বহ্ন্যুৎসবের হয় উদ্‌যাপন। বহুদূর থেকে দেখা যায় এই বহ্নিশিখা, বহুদিন ধরে জ্বলে এই আগুন। ততদিনে সমবেত তীর্থ-যাত্রীর দল পশ্চাদ্‌গামী স্রোতের মত ফিরে চলে গেছে। চারিদিকের এলোমেলো পর্বতমালার মাঝখানে নিজস্ব অস্তিত্বের স্বতন্ত্রতায় একা পড়ে থেকেছে চিরদিনের একা অরুণগিরি—'তেজোলিঙ্গম্'। এতদিনে হ'ল তার একাকিত্বের অবসান, কারণ এবার যিনি এলেন তিনি পুণ্যকামী নন, পরিব্রাজক নন, নৈষ্ঠিক সাধু নন। চোখে দেখা, কানে শোনবার প্রয়োজন তাঁর ফুরিয়েছে। স্থান-কালের ব্যবধান তাঁর ঘুচেছে বলেই দেশ-দেশান্তরের আবেদন গেছে তাঁর কাছে মিথ্যা হয়ে। অরুণাচলের নিঃসঙ্গ বুকে তাঁর বিধি-নির্দিষ্ট নিজস্ব স্থানটি

তিনি গ্রহণ ক'রে অচল হয়ে বসেছেন। ফিরে যাবার প্রয়োজন তাঁর আর নেই।

যে অরুণাচলম পর্বতের পাদদেশে পৌঁছে কিশোর রমণ চিরদিনের জন্য রয়ে গেলেন, তার সামান্য একটু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। স্কন্দ পুরাণে অরুণাচলের মহিমার বর্ণনায় আছে যে এই পবিত্র শিবভূমির তুল্য পবিত্র স্থান আর নেই, কারণ এখানেই আছে পৃথিবীর প্রাণকেন্দ্র। দৃশ্যতঃ অরুণাচল মাঝারি আকারের একটি পর্বতমাত্র ঃ দিগন্তব্যাপী প্রান্তরের বুকে, অসমতল রাঙামাটির পাথর-ছড়ানো আবেষ্টনের মাঝখানে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। প্রদক্ষিণ করতে হলে দক্ষিণ দিক থেকে পশ্চিমে চলতে হয়, পর্বতকে ডান দিকে রেখে, দীর্ঘ চার ক্রোশ পথ। ক্ষণে ক্ষণে অরুণাচলের নব নব রূপ চোখের সামনে ফুটে ওঠে। প্রায় প্রত্যহই উষাকালে অভ্রাভ একখণ্ড মেঘ চোখে পড়ে অরুণগিরির শিখরদেশে ঃ মনে হয় যেন অপার্থিব একটি মুকুট শিরে ধারন ক'রে স্বমহিমায় এই দেবভূমি ভাস্বর হয়ে উঠেছে। দেহী, বিদেহী কত পূণ্যাত্মাই যে যুগ যুগ ধরে এই অতি-পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে অধিষ্ঠান করেছেন তার হিসাব নেই। চিরমৌন অরুণাচল অনন্তকাল ধরে তার নিঃশব্দ আবেদনের আকর্ষণ বিস্তার ক'রে এই একস্থানে স্থানুবৎ বিরাজ করছেন। কিন্তু তাঁর এই প্রভাব দিকদিগন্তে ছড়িয়ে পড়ছে অলৌকিক অদৃশ্য তরঙ্গে ঃ দেশ-কাল-পাত্র অতিক্রম ক'রে মুমুক্ষুর মর্মমূলে সাড়া দিয়ে বলছে—তত্ত্বমসি—তুমি সেই অনাদ্যান্ত পুরুষোত্তম—তুমি আত্মস্বরূপ।

মহর্ষি রমণ স্বয়ং রচনা করেছিলেন অরুণাচলের স্তোত্র। আক্ষরিক অনুবাদে কথাগুলি এইরূপ ঃ অরুণাচলকে সম্বোধন ক'রে তিনি বলেছেন ঃ

'কে এই দ্রষ্টা? নিজের মধ্যে অনুসন্ধান কালে দেখলাম দ্রষ্টা অন্তর্হিত হয়ে গেল এবং তার পরে যা রইলো। 'আমি দেখেছি'

এ চিন্তাও যখন রইলো না, 'আমি দেখিনি'—এ চিন্তাই বা আসবে কোথা থেকে ? কথায় এ ভাবটি প্রকাশ করার সাধ্য কার আছে, যখন স্মরণাতীতকালে তুমি পর্যন্ত কেবলমাত্র অখণ্ড মৌনতায় এ ভাবটি প্রকাশ করেছিলে দক্ষিণামূর্তি রূপে ? 'তত্ত্বমসি'র সেই ভাবটি মৌনতায় প্রকাশ করবার জন্যই কেবল তুমি এক পর্বতাকারে স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে জ্যোতিঃ স্তম্ভবৎ হয়ে আছো।'

অরুণাচল পর্বতের ঐতিহ্য ও অসামান্যতার কথা বাদ দিলেও এই সম্পর্কে আরও একটি বিরাট প্রশ্ন রয়ে যায় যার কোন উত্তর নেই। কেন যে এই অরুণাচল এমন ক'রে এই পরম পুরুষকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত গ্রাস ক'রে রইলেন, কি অন্তর্গূঢ় যে এই গভীর আকর্ষণ সে রহস্য চিরদিনের মৌনতায় আবৃত রয়ে গেছে। এক ছাড়া দুই যাঁর মনে কোনদিন স্থান পায় নি, তিনি যে এই পর্বতাকৃতি অখণ্ড মহাবস্তুকে কি চোখ দিয়ে দেখেছিলেন তা অনুমান করাও দুঃসাধ্য। অরুণাচল-বাসের প্রাথমিক স্তরেও শেষাদ্রিস্বামী কিশোর তপস্বীকে যাচাই করবার অভিপ্রায়ে নানাবিধ ভনিতা ক'রে বলেছিলেন—'অরুণাচলেশ্বর শিবকে পূজা করলে তিনি মুক্তিবর দান করেন।' উত্তরে রমণ বলেছিলেন : 'কিন্তু পূজা করে কে, এবং পূজা গ্রহণ করেই বা কে ?'

এই চরম প্রশ্নের কোন সদুত্তর দিতে না পেরে শেষাদ্রিস্বামী অপ্রতিভের হাসি হেসে বলেছিলেন, 'সেই কথাটাই তো ঠিক বুঝতে পারি না।' দৃশ্যমান জগৎরূপে যিনি, দৃশ্য বহির্ভূত সত্তাও তিনি, অথচ তিনি স্বয়ং রূপে রূপে প্রকাশিত হয়েও অবিকৃত, অব্যক্ত বলে তুমি যা কিছু বলো তা আমি ধারণা করতে পারি না। আমি পূজা করি এই মাত্র জানি।"

রমণের মনোভূমিতে অরুণাচলের কি তাৎপর্য ছিল সে-কথা কোনদিন জানা যায় নি। কিন্তু গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত মহর্ষি রমণ

এই পবিত্র ভূমির সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে রইলেন : কোন ছলে, কোন কারণে এখান ছেড়ে কোথাও গেলেন না—এই তথ্যটি যে বিশেষ অর্থপূর্ণ তাতে সন্দেহমাত্র নেই। দেশান্তরে যাত্রার প্রস্তাব আসা মাত্রই তিনি মাথা নেড়ে বলেছেন, 'কোথায় যাবো? যাবোই বা কেন? লোকে আমাকে দর্শন করবে বলে যদি যাই, তাহলে তো আমাকে বুকে পিঠে বিজ্ঞাপন ঝুলিয়ে, লোককে জানান দিতে দিতে চলতে হয় যে আমি এক আত্মজ্ঞানী মহর্ষি। এই অরুণাচলে আমি বাঁধা : এখান ছেড়ে কোথাও যেতে এই দেহ চায় না। আমি ছাড়া আর যে কিছু আছে—এই চিন্তাই তো ভ্রান্তি। এই ভ্রান্তির পায়ে গিয়ে আর আসা যাওয়ার কথা ওঠে কি ক'রে?

রমণের জীবনে যে নতুন অধ্যায়টি আরম্ভ হ'ল—আপাতদৃষ্টিতে সেটি খুব সুখকর বলে মনে হয় না। গৃহদুর্গের বাইরে এসে যে পথিক পথকে করে ঘর, পথের যত কাঁটাকেও তাকে নিতে হয় বরণ করে। মৌনব্রতধারী এই তরুণ উন্মাদও তাঁর প্রাপ্য থেকে হননি বঞ্চিত। তাঁর আকৃতি প্রকৃতি দেখে ছেলের দল পরম কৌতুক বোধ করলো। ছোট ছোট ইট্-পাট্কেলের রূপে তাদের সম্ভাষণ সমানে বর্ষিত হতে লাগলো। আত্মরক্ষার জন্য রমণ সহস্র-স্তম্ভ প্রকোষ্ঠের আরও ভিতরের দিকে সরে গেলেন এবং অভ্যন্তরের অন্ধকার গর্ভগৃহে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। আলো-বাতাসের সংস্রবহীন এই রুদ্ধ স্থানে অসংখ্য কীটপতঙ্গের উপদ্রব। কিন্তু এরই মধ্যে স্যাঁতসেঁতে ভিজে মাটিতে বসে পরমানন্দে তিনি নিজের মধ্যে রইলেন মগ্ন। সারা দেহ ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে গেল, মৌমাছি বোল্‌তা মশা মাছি পিপীলিকার দৌরাত্ম্যে; স্থানে স্থানে রক্তাক্ত ঘায়ে জমে উঠলো পুঁজ। কিন্তু রমণের সেসব কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। জড়দেহটার সঙ্গে তাঁর যোগ কোথায় যে এ সব তুচ্ছ ঘটনা তাঁকে স্পর্শ করবে?

স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে এই সময়ে এলেন রত্নাম্মল। অন্ধকার

গুহাবাসী বালক তপস্বীর জন্য বস্ত্র খাদ্য পানীয় এনে হাজির করলেন। ডাকাডাকি ক'রে কোন সাড়া না পেয়ে সমাধিস্থ মূর্তির সম্মুখে সমস্তই রেখে গেলেন সাজিয়ে। কিন্তু যেমনটি যা ছিলো সব যথাস্থানে রইলো পড়ে। পোকামাকড়ের উপস্থিতির মত এগুলিও রইলো অবজ্ঞাত হয়ে। নিশ্চেষ্ট রমণের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এই প্রথম যে ক্ষ্যাপা সাধুর হ'ল আবির্ভাব, তাঁর নাম শেষাদ্রি। কিন্তু এ অবস্থায় তাঁরও করবার মত কিছু ছিল না। কয়েকজন লোকে মিলে ধরাধরি ক'রে স্থানুর মত নিশ্চল দেহটিকে অন্ধকার গর্ভগৃহ থেকে স্থানান্তরিত ক'রে সুব্রহ্মণ্য মন্দিরে নিয়ে দিলেন তাঁরা বসিয়ে। রমণও নিশ্চল হ'য়ে সেখানে রয়ে গেলেন।

দিনের পরে দিন লোকমুখে 'ব্রহ্মণ স্বামী' রূপে রমণের বার্তা ছড়িয়ে গেল। ধীরে ধীরে লোকসমাগম হ'ল শুরু। স্তম্ভিতের মত লোকে দূর থেকে সসম্ভ্রমে চেয়ে চেয়ে দেখে অমানুষিক তপস্যার রূপ। কৌতূহল আসে ছায়ার মত ভিড় ক'রে, ছায়ার মত সরে যায়। বাহ্য-জ্ঞান রহিত মগ্নচৈতন্যে জাগে না কোন সাড়া, লাগে না কোন আলোড়ন। কোথা থেকে কে এনে মুখে তুলে ধরে কোন দেবপ্রতিমার অভিষেক-স্নানের হলুদ-কলা-জল-চিনি মেশানো অর্ধতরল দুগ্ধের পাত্র। অর্ধ-বাহ্যদশায় কিছুটা বা তাঁর পেটে যায়, কিছুটা যায় পড়ে। কোথা দিয়ে কাটে দিবারাত্রির নিঃশব্দ প্রহর। কখনো বা একটানা কয়েকদিন পর্যন্ত সামান্য এক খাদ্য গলাধঃকরণ করবার মত অবস্থাটিও আসে না।

স্বেচ্ছাসেবক রূপে যে কয়েকজন ভাগ্যবান এই সময়ে মহর্ষির পরিচর্যায় ছোটোখাটো অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য মৌন স্বামীর নাম। মহর্ষির দীর্ঘদিন ব্যাপী সমাধির অবস্থা যে একটানা অনশনে পর্যবসিত হ'তে পেতো না সে কেবল মৌন স্বামী আর তাঁর অনুচরবৃন্দের ঐকান্তিক একনিষ্ঠ সতর্কতায়। সুব্রহ্মণ্য মন্দিরে এই ভাবে কাটলো প্রায় ছুটি মাস। এর পরে মন্দির-সংলগ্ন

উদ্যানে সমাধিস্থ অবস্থাতেই বহুকাল তিনি অবস্থান করেন। দেহবোধ-রহিত অবস্থাতেও স্বয়ংক্রিয় ভাবে যন্ত্রচালিতের মত নির্বাহ হ'ত দৈহিক চলাফেরার কাজ। শীত-গ্রীষ্ম, রৌদ্র-বর্ষায় ছিল না দেহের বিকার। উন্মুক্ত আকাশের তলে কৌপীন মাত্র সম্বল ক'রে কেটেছে মাসের পর মাস। সেই কৌপীনও যখন জরাজীর্ণ হ'য়ে খসে গেল—কয়েক মাস পর্যন্ত তার অভাবও দেহ টের পায়নি।

মহর্ষির প্রথম ভক্ত-শিষ্য উদ্দণ্ডী নাইনার সমাগত হলেন এই সময়ে। লৌকিকভাবে দীক্ষা বলতে যা বোঝায়, মহর্ষি কোন অবস্থায় তা কোন ব্যক্তিকেই দেন নি। প্রথম দর্শনেই নাইনারের মন জড়িয়ে গেল মহর্ষির চরণে। পণ্ডিত মানুষ, অনেক পড়াশুনা ক'রে প্রচুর দার্শনিক তত্ত্ব আহরণ ক'রেও উপ-লব্ধির অভাবে ছিলেন তিনি ম্রিয়মান হয়ে। ছোট একটি মঠ স্থাপন ক'রে নির্জনে বাস করতে করতে তীর্থভ্রমণের নেশায় মন্দিরে মন্দিরে বেড়াচ্ছিলেন ঘুরে। এমন সময় ইলুপ্পাই গাছের তলায় সজীব বিগ্রহের দর্শন পেয়ে তাঁর মনে হ'ল—এতদিনে, অবশেষে যেন তাঁর ধ্যানের মূর্তি রূপ পরিগ্রহ ক'রে দেখা দিলেন। মনে হ'ল—তাঁর চাইবার বা পাবার যেন কোনখানে আর কিছু রইলো না বাকি। সেই থেকে ছায়ার মত র'য়ে গেলেন তিনি রমণের সমাধিস্থ মূর্তির আশেপাশে। তখন শীতকাল; সে বছর শীতও পড়েছিল দারুণ। উন্মুক্ত প্রান্তরে সারারাত্রি মহর্ষির দেহবোধমুক্ত নিশ্চল দীপ-শিখার মত উপবিষ্ট ঋজু দেহের সন্নিকটে উপবেশন ক'রে নাইনার অকাতরে নিঃশব্দ পরিচর্যায় করলেন আত্মনিয়োগ। দিন রাত্রে, কোন সময়েই নাইনারের ছিলো না ছুটি। দিনের আলোয় সন্নিকটে বসে পড়াশুনার ফাঁকে মনের আধখানা থাকতো তাঁর অকথিত প্রয়োজনের প্রতি সজাগ। গভীর রাত্রে নিদ্রাকর্ষণ হলে সন্তর্পণে ঘুমিয়ে থাকতেন প্রভুরই কাছাকাছি। অনেকগুলি সপ্তাহই এইভাবে এলো, গেলো,

কিন্তু প্রভু-ভৃত্যে পরিচয়ের লগ্নটি এলো না। অথচ এই একটি মাত্র প্রতীক্ষাই ছিলো নাইনারের চিত্তে যে একদিন না একদিন কোন এক শুভলগ্নে প্রীতি-প্রসন্ন দৃষ্টি মেলে তার ধ্যানের দেবতা তাকাবেন তার দিকে।

আরও একটি যোগাযোগের সূত্রপাত হ'ল এই সময়ে। আন্নামালাই তম্বারণ নামে এক বাউল সন্ন্যাসী এসে জুটলো। গুরুমূর্তম্ বলে একটি জনবিরল স্থান ছিলো কাছাকাছি, তম্বীরণের আবাস ছিলো সেখানেই। গ্রামে গ্রামে কীর্তন, ভজন গেয়ে, ভিক্ষা ক'রে চলতো তম্বীরণের দিন। প্রথম দর্শনেই আকর্ষণের জালটি গেল তার পায়ে জড়িয়ে। নিত্যদিনের চলার পথটি তার সেই থেকে মহর্ষিকে প্রদক্ষিণ ক'রে চলতে লাগলো। কয়েকদিন আসা যাওয়ার পরেই একদিন মহর্ষির অর্ধবাহ্যদশার সুযোগ নিয়ে, সে জানালো তার অন্তরের নিবেদন। ফলে, মন্দির-প্রাঙ্গন পরিত্যাগ ক'রে, তম্বীরণের তত্ত্বাবধানে কয়েক মাসের জন্য রমণ এসে রইলেন গুরুমূর্তমে। দেহে সাতপুরু ময়লা পড়েছে, চুলে ধরেছে জট। হাতের নখগুলি হ'য়ে উঠেছে দীর্ঘ। সারাদেহে পিপীলিকার আবাস। যারা দেখতে আসতো ব্যথা বোধ করতো এই দৃশ্য দেখে। কিন্তু রমণের কিছুমাত্র ভাবান্তর নেই। তম্বারণের সংগৃহিত ভিক্ষান্নের সামান্যতম অংশ কোনদিন-বা এক-আধটুকু পেটে যেতো, কোনদিন-বা তাও যেতো না। মাস দুয়েক এইভাবেই কাটলো। যে কারণেই হোক এই সময়ে তম্বারণকে যেতে হ'ল দূরে। সেবার ভার রইলো নাইনারের উপরে। দৈবক্রমে কিছুদিনের মধ্যে নাইনারকেও যেতে হ'ল অন্যত্র। আবার একাকিত্ব ফিরে এলো মহর্ষির চিরদিনের একা জীবন-যাত্রায়।

কিন্তু সংযোগ বিয়োগ যাঁর খেলা, তিনি বোধ করি নিশ্চিন্ত থাকতে পারলেন না। অনতিবিলম্বেই সেবকের শূন্য স্থানটি গ্রহণ করলেন পলনীস্বামী নামে এক মলয়ালী। বিনায়ক মন্দিরে নিত্য

পূজার ব্রত তিনি বহুকাল যাবৎ একনিষ্ঠভাবে আসছিলেন পালন ক'রে। আহার্য হিসাবে দিনান্তে একটিবার মাত্র পূজার নৈবেদ্য তিনি গ্রহণ করতেন, আর একান্ত পূজায় ইষ্টদেবতার চরণে নিজেকে দিতেন উৎসর্গ ক'রে। তাঁর ঐকান্তিক নিষ্ঠা বুঝি এতদিনে হ'ল সফল। কে একজন উপলক্ষ হ'য়ে, তাঁকে এসে বললেন, 'পাথর নিয়েই সারা জীবন কাটাবে, ঠাকুর? গুরুমূর্তমে তরুণ তপস্বীর রূপে দেবতা রয়েছেন মূর্ত হয়ে। পাথর ছেড়ে সেখানে গিয়ে শরণ নাও। ধন্য হবার পথটি পাবে তাঁরই কাছে খুঁজে।'

কথাটি পলনীস্বামীর মনে লাগলো। কিন্তু ইষ্টদেব বিনায়ককে যাঁর বিনিময়ে ছাড়া যায়, তাঁকে একবার প্রথমেই না যাচাই ক'রে নিলে চলে কি ক'রে? মহর্ষি সন্দর্শনে অচিরেই তিনি যাত্রা করলেন। প্রথম দর্শনের পরে মাত্র কয়েকটি দিনই ছিলো তাঁর পূর্ব সংস্কারের দ্বিধা। শেষ পর্যন্ত মহর্ষি'র অনতিক্রমনীয় প্রভাবটিই হ'ল জয়ী। পলনীস্বামী জীবন্ত দেবতার সেবকত্ব নিলেন পরিপূর্ণভাবে বরণ ক'রে। শুধু সেবক নয়, শেষ পর্যন্ত ভাবোন্মাদ মহর্ষি'র অভিভাবকত্বের দায়িত্বও তাঁকে গ্রহণ করতে হ'ল।

এতদিন পর্যন্ত ব্রহ্মণস্বামী রূপেই রমণ পরিচিত ছিলেন। তাঁর পূর্ব-পরিচয় ছিল অজ্ঞাত। গুরুমূর্তমে অবস্থানকালে অভাবনীয় ভাবে তাঁর পরিচয় গেল প্রকাশ হ'য়ে। উপলক্ষ হলেন তম্বীরণ। গোড়া থেকেই তম্বারণের শ্রদ্ধা-ভক্তির অভাব ছিলো না। কিন্তু ক্রমেই যেন আড়ম্বরের আতিশয্যটা মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছিলো। ফুল বিল্ব-পত্র থেকে আরম্ভ ক'রে, অগুরু-চন্দন পর্যন্ত, ধাপে ধাপে উঠে যখন ক্রমে শঙ্খ-ঘণ্টা, চামর, দীপাধার পর্যন্ত এসে হাজির হ'ল, তখন ভক্তির অত্যাচারে স্বয়ং মহর্ষি পর্যন্ত অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠলেন। ইসারায় ইঙ্গিতে যতটুকু বারণ করা যায়, তাতেও যখন অবস্থার বিশেষ কোন উন্নতি হ'ল না, তখন বাধ্য হ'য়েই মহর্ষিকে আরও স্পষ্টতর

উপায়ে মনোভাব জ্ঞাপন করতে হ'ল। তস্বীরণের অনুপস্থিতিকালে একখণ্ড কয়লার সাহায্যে দেয়ালের গায়ে তামিল ভাষায় যা লিখে রাখলেন, তার ভাবার্থ হ'ল : 'আমার এ দেহের সেবার জন্য খাদ্যের অতিরিক্ত আর কিছুরই প্রয়োজন নেই।' তস্বীরণ ফিরে এসে মহর্ষি'র বিজ্ঞপ্তি পাঠ করলেন। ইতিপূর্বে তাঁর—নাম, ধাম, শিক্ষা, দীক্ষার কোন পরিচয়ই ছিলো না জানা। এই ঘটনায় জানা গেল যে, তিনি তামিল ভাষায় অভিজ্ঞ। কৌতূহল হ'য়ে উঠলো উদগ্র জনৈক বৃদ্ধ রাজ-কর্মচারির মনে। বালক সন্ন্যাসীর পূর্ব-পরিচয় জানবার জন্য তিনি হলেন বদ্ধপরিকর। মহর্ষি'র সামনে কাগজ কলম এগিয়ে দিয়ে বৃদ্ধ নানাভাবে শুরু করলেন কাকুতি-মিনতি। শেষ পর্যন্ত প্রায়োপবেশনের সঙ্কল্প জানিয়ে প্রার্থিত তথ্য আদায় ক'রে নিলেন। সংবাদ গোপন রইলো না। লোকমুখে মহর্ষি'র পরিচয় দিকে দিকে গেল ছড়িয়ে।

গৃহত্যাগের পর থেকে একাদিক্রমে যে দুটি বৎসরের বিবরণ পাওয়া যায়, তাতে এই অত্যাশ্চর্য তাপসের অলৌকিক তাপশ্চর্যার একটি মাত্র চিত্রই মেলে। যেখানে যে যখন যেভাবে তাঁকে দিয়েছে বসিয়ে, সমস্ত পারিপার্শ্বিককে উপেক্ষা ক'রে সেই অবস্থাতেই তিনি নিশ্চল হ'য়ে করেছেন অধিষ্ঠান। শোয়া নেই, ঘুম নেই, কথা নেই, ক্ষুধা নেই, তৃষ্ণা নেই—দেহ যে আছে, সে বোধও নেই। নিত্য সমাহিত অবস্থায় না ছিল দুঃখ, না ছিল সুখ। অস্থিচর্মসার দেহ, প্রায় চলচ্ছক্তিরহিত বললেই হয়; অন্যের সাহায্য ছাড়া উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতাও নেই। অথচ সমাধির নেই মুহূর্তে'র জন্যও বিরতি। সেবকের পরে এসেছে সেবক, ছায়ার মত এসেছে নিঃশব্দে। আগমনের সংবাদ মহর্ষি'র গোচরে হয়তো এসেছে এই পর্যন্ত। ছায়ার মত নিঃশব্দে একের স্থানটি অপরে এসে পূর্ণ করেছে। কে এলো, কে গেলো সে বিষয়ে মহর্ষি' ছিলেন না অবহিত। আবাহনও

ছিলো না, বিসর্জ্জনও ছিলো না তাঁর। তাঁর নিস্পৃহ অনাসক্তির দৃষ্টিতে বাইরের আসা যাওয়া উভয়ই ছিল সমভাবে অর্থহীন।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে, পলনীস্বামীর একনিষ্ঠ আত্মসমর্পণের প্রত্যুত্তরেই হয়তো বা পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে মহর্ষি যেন একটু সচেতন হলেন। লোকের ভিড়ে গুরুমূর্তম্ পরিত্যাগ ক'রে, মহর্ষি জনৈক ভক্তের আমন্ত্রণে নিকটবর্তী আম্রকুঞ্জে অবস্থান করছিলেন। সঙ্গে ভক্ত বলতে, সেবক বলতে, অনুচর বলতে ছিলেন একমাত্র পলনীস্বামী। উদ্যানে তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশাধিকার ছিলো না। পাশাপাশি দুটি পর্ণ-কুটিরে প্রভু ও ভৃত্যের স্থান ছিলো নির্দিষ্ট। মহর্ষি থাকতেন নিজের ভাবে বিভোর। পলনীস্বামীর দৃষ্টি থাকতো, প্রভুর ক্ষুদ্রতম অকথিত প্রয়োজন সম্বন্ধে সর্বদাই সজাগ। বেচারার সময় কাটতে চাইতো না। বই পড়ে সময় কাটাবার প্রধান অসুবিধা ছিল তার বিদ্যার অভাব। কিন্তু হাতের কাছে যে কয়খানি উচ্চতম দর্শনের গ্রন্থ ছিল, সেইগুলিকেই সাধ্যমত আয়ত্ত করবার অধ্যবসায়েরও তাঁর অন্ত ছিল না। পদে পদে পাঠ হ'ত ভুল, উচ্চারণ হ'ত অশুদ্ধ, পঠিত বিষয়ের অর্থবোধে হ'ত বাধা। একটি কথাই বারংবার আবৃত্তি ক'রে, পুনঃ পুনঃ পাঠের দ্বারা সচেষ্ট হতেন তিনি, দুর্বোধ্যকে আয়ত্তে আনতে। অর্ধবাহ্য-দশায় মহর্ষির কানে আসতো অশুদ্ধ উচ্চারণ সম্বলিত শাস্ত্রপাঠের মৃদু গুঞ্জন। মহর্ষি নিজেও মাঝে মাঝে সচকিত হ'য়ে উঠতেন। মনে হ'ত শাস্ত্রবাণীর মধ্যে প্রচ্ছন্ন হ'য়ে আছে তাঁর নিজেরই কথা; যা তিনি জেনেছেন, যা তিনি হয়েছেন, যা তিনি পেয়েছেন, সমস্তই যেন হ'য়ে উঠতো মূর্ত, প্রাণবন্ত। তাঁর উপলব্ধির সত্যগুলি, অনুভূতির অর্থগুলি সুস্পষ্ট হ'য়ে ফুটে উঠতো অসংবদ্ধ কদুচ্চারিত ছত্রগুলির ফাঁকে ফাঁকে। ঋষিবাক্যের পরমতম সত্যস্বরূপটি যেমন ক'রে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে তাঁর নিজের জ্ঞানময় উপলব্ধি-লোকে, ঠিক তেমনি ক'রে আনন্দে সৌন্দর্যে হ'য়ে উঠেছে বিকশিত

আর এক সত্য-দ্রষ্টার অমৃতময় চিত্তলোকে—এই তথ্যটি হ'য়ে উঠলো মহর্ষির বিশেষভাবে উপভোগ্য। সংস্কৃত মন্ত্রমালার ভাষাগত দুর্বোধ্যতাকে অতিক্রম ক'রে ধ্বনিত হ'ত যে মহাসত্যের ঝঙ্কার—তাতেই তিনি শেষ পর্যন্ত পড়লেন ধরা ; মৌনতার বর্ম পরিত্যাগ ক'রে সাড়া দিয়ে বললেন, 'যে অর্থ তোমার ভাষার দৈন্যে তুমি অনুধাবন করতে পারছো না—সে অর্থ আমি জানি। তুমি পাঠ ক'রে যাও। অর্থ শুনে নাও আমার কাছে।' এতদিনে, অবশেষে মৌনতার বাঁধ ভেঙে নামলো বাণীর ঝর্ণাধারা।

এই ভাবে দিনের পর দিন চলতে লাগলো শাস্ত্র-চর্চা। আম্র-কুঞ্জের নির্জনবাস ধীরে ধীরে পলনীস্বামীর কাছেও হ'য়ে উঠলো রমণীয়। কিন্তু বেশিদিন এভাবে চললো না। যে কারণেই হোক আম্রকুঞ্জের বাস এই সময়ে এলো সমাপ্ত হ'য়ে। মহর্ষি আশ্রয় নিলেন, অরুণগিরিনাথারের মন্দিরে। যাবার সময় পলনীস্বামীকে বললেন, 'আমার সঙ্গে কারুর যাবার প্রয়োজন নেই। এখন থেকে তোমার নিজের গন্তব্যস্থান নিজেই ঠিক ক'রে নাও। একসঙ্গে থাকা আর আমাদের চলবে না।' বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মতই আকস্মিক এই আঘাতে স্তব্ধ হয়ে পলনীস্বামী রইলেন নিরুত্তর। কথাটি না বলে পলনীস্বামী ভিক্ষায় গেলেন বেরিয়ে ; কিন্তু সারা অন্তরটি তাঁর মহর্ষির আশেপাশে আর্তনাদ ক'রে ফিরতে লাগলো। সমস্ত দিন ধরে একরকম জোর ক'রেই নিজেকে রাখলেন বিচ্ছিন্ন ক'রে। সন্ধ্যা হ'ল। পলনীস্বামী ভীত কুণ্ঠিত পদে ফিরে এলেন প্রভুর দ্বারে। বললেন, 'কোথায়, কার কাছে আমি যাবো ? জীবনের মন্ত্রটি রইলো তোমার কাছে। সে ছেড়ে আমি দূরে যাবো কোন প্রাণে ?' অগত্যা পলনীস্বামী রয়েই গেলেন।

ইতিমধ্যে মহর্ষির পরিচয়-সম্বলিত বার্তা দিকে দিকে রাষ্ট্র হয়ে লোকমুখে তাঁর স্বগ্রামেও গেছে পৌঁছে। পলাতক পুত্রের অনুসন্ধান

প্রচেষ্টায় কয়েকবার ব্যর্থমনোরথ হয়েও আশার শেষ সূত্রটুকু সম্বল ক'রে জননী ছিলেন পথের পানে চেয়ে। সংবাদ পেয়েই জনৈক আত্মীয়কে তিনি অনুসন্ধানে দিলেন পাঠিয়ে। আত্মীয়টি এলেন, দেখলেন, যথাসম্ভব সাধ্যসাধনাও করলেন এবং শেষপর্যন্ত নির্বাক মহর্ষির উদ্দেশে বর্ষিত উপরোধ অনুরোধ তাঁর শ্রবণে পৌঁছালো কিনা সঠিক বুঝতে না পেরে জননী অলগাম্মল-সন্নিধানে ফিরে গিয়ে ফলাফল জ্ঞাপন করলেন। বলাবাহুল্য এই ধরনের পরিণতির জন্য জননী প্রস্তুত ছিলেন না। আত্মীয়টির অকৃতকার্যতার জন্য সর্বাংশে তাকেই দায়ী সাব্যস্ত ক'রে, হারানিধিকে ফিরিয়ে আনবার অভিযানে নিজেই করলেন যাত্রা। মনে ছিল আশা, অন্যে না পারুক তিনি মায়ের দাবি নিয়ে নিজে গিয়ে উপস্থিত হ'লে গৃহত্যাগী তাপসকে ঘরে ফিরিয়ে আনতে নিশ্চয়ই পারবেন। কিন্তু সংসারের সমস্ত হিসাব-নিকাশ সম্পূর্ণভাবে পরিশোধ ক'রে দিয়ে, যিনি সংসার-বহির্ভূত নিজের চিরদিনের স্থানটিকে পেয়েছেন খুঁজে, মিথ্যা হ'য়ে গেছে তাঁর কাছে এককালে সবাইকার দাবি। এই পরম সত্যটি জননী অলগাম্মলের তখনো জানতে বাকি ছিল।

বড় ছেলে নাগস্বামীকে সঙ্গে নিয়ে, মা তিরুভান্নামালাইয়ে এসে হাজির হলেন। জটাজুটধারী উলঙ্গপ্রায় তপস্বীর মাঝখানে মায়ের দৃষ্টি অনায়াসেই তাঁর স্নেহ-মমতার ধনটিকে নিলো চিনে। কিন্তু অপরপক্ষ থেকে পরিচয়ের কোনরকম সাড়াশব্দই পাওয়া গেল না—না চেনার, না খুশির, না বিরক্তির। তর্ক যুক্তি, আবেদন নিবেদন, অভিযোগ অনুযোগ—সবই যখন নিঃশেষে হ'ল ব্যর্থ, ততক্ষণে চারিদিকে কৌতূহলী দর্শকের ভিড় জমে গেছে। মায়ের চোখের জলে আশেপাশে অনেকেরই মন উঠেছে ভিজে। কেবল যাঁকে উপলক্ষ ক'রে এত ভাবাবেগের স্রোত ছুটেছে, তাঁর তরফেই নেই কোন সাড়া। মৌনতার প্রাচীর দিয়ে বেষ্টিত তাঁর নিজস্ব জগতের

কোন রন্ধ্রপথে পারিপার্শ্বিক উচ্ছ্বাসের এতটুকু প্রতিধ্বনিও পৌঁছালো বলে মনে হ'ল না। এ যেন এক পাথরের দেবতা, যার মন বলে কোন বস্তু নেই।

মায়ের অশ্রুধারায় যাঁদের মন ভিজেছিলো, তাঁদেরই কয়েকজনের সনির্বন্ধ মধ্যস্থতায় শেষ পর্যন্ত মায়ের সাধ্যসাধনার লিখিত প্রত্যুত্তর এলো। কিন্তু মায়ের মনে হ'ল এর চেয়ে নিরুত্তর স্তব্ধতাও যেন ছিলো ভাল। উত্তরটির যথাযথ অনুবাদ পড়লে সবাইকারই মনে হবে যে এতে আর যাই থাক, স্নেহবুভুক্ষু অন্তরের তৃপ্তির খোরাক এর মধ্যে নেই। কথাগুলি এইরূপ ঃ

'ভাগ্যবিধাতা অতীত কর্ম বা প্রারব্ধ কর্ম অনুসারে আত্মার গতিবিধান করেন। হাজার চেষ্টাতেও যা ঘটবার নয়, তা ঘটবে না। যা ঘটবার, শত চেষ্টাতেও তার গতি রোধ করা যাবে না। এই সত্যটি ধ্রুব জেনে নিশ্চেষ্ট হ'য়ে থাকাই সর্বোত্তম পন্থা !'

কে লিখছেন, কাকে লিখছেন, কোন্ পরিস্থিতির মধ্যে কেন লিখছেন, তার কোন হদিসই পাওয়া যাবে না এই নৈর্ব্যক্তিক লিপির মধ্যে। জননীর কাছে পুত্র-বিরহের সান্ত্বনা হিসাবে এর মূল্য যতোটুকুই থাক, ব্যক্তিগত জীবনের ঊর্ধ্বলোকে আছে যে মহা-সমর্পণের সত্যলোক, তারই ইঙ্গিত ফুটে উঠেছে এর প্রত্যেকটি কথায়। মহর্ষির মুখে এই কথাটি নূতন নয়। বরং এই তাঁর চিরদিনের কথা। আত্মবস্তুর সন্ধান যখন থেকে তিনি লাভ করেছেন, তখন থেকেই তিনি সবলে প্রত্যাখ্যান করেছেন যাবতীয় অনাত্মবস্তুর সংস্রব। সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নার যতকিছু অনুভূতি হ'য়ে গেছে তাঁর কাছে স্বপ্নের মতই অর্থহীন। এদের ভিত্তি ক'রে যত কিছু সমস্যা, চিন্তা, প্রশ্ন বা পরিস্থিতি—তাদের অস্তিত্ব পর্যন্ত হ'য়ে গেছে সঙ্গে সঙ্গে মিথ্যা। চিঠিখানিতেই এই ভাবটি স্পষ্ট হ'য়ে ফুটে উঠেছে।

এর পরে আশা এবং আবেদন—এ দুয়েরই নিষ্ফলতা উপলব্ধি ক'রে

মা ফিরে গেলেন দেশে। মহর্ষিও নিম্নভূমির অধ্যায় সমাপ্ত ক'রে, এর সামান্য কিছুদিন পরেই অরুণাচলের গুহায় নিলেন আশ্রয়। নিম্নভূমির অবস্থান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মহর্ষির জীবনের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতারও ঘটলো পরিসমাপ্তি। পিতৃগৃহের দ্বারপ্রান্তে এসে এতদিনের চলা পথটি গেল এককালে সাঙ্গ হ'য়ে। শেষের ইঙ্গিত ছিলো যাঁর শুরুতেই, এবার যেন তাঁর জীবনে স্থানকালের সমস্ত পরিবর্তনশীলতাই গেল একেবারে বিলুপ্ত হ'য়ে। তাঁর পরিত্যক্ত পথে আসবে নবাগতের দল, আর তাঁরই পদচিহ্নগুলি গুণে গুণে চলবে তাদের জীবনযাত্রার অনুপম সুন্দর প্রবাহ।

অরুণাচল পর্বতের বিরূপাক্ষ গুহায় অবস্থান কালে একটির পরে একটি ক'রে অজানা মানুষ ফুলের গন্ধে লুব্ধ মধুমক্ষিকার মত এসে জুটছিলো। প্রথম থেকেই শুরু হয়েছিলো এই আনাগোনার পর্ব। তখন মহর্ষি ছিলেন মৌনতার আবরণে আবিষ্ট হয়ে—নিজেকে নিয়ে একান্তভাবে ব্যাপৃত। সমবেত মানুষগুলির পানে অনুকম্পার দৃষ্টি নত ক'রে চাইবার মত অবসর তখনো তাঁর ছিল না। এখন থেকে আরম্ভ হ'ল যে অধ্যায়টি, তাতে অনুকম্পার লীলাটিই বিশেষভাবে প্রকট হয়ে ওঠে। পলনীস্বামী এই নব-জাগ্রত দাক্ষিণ্যের ভগীরথ। এর পরেই এলেন শেষিয়ার। উচ্চপদস্থ শিক্ষিত ব্যক্তি হিসাবে জ্ঞানানুরাগ ছিল তাঁর অসামান্য। দার্শনিক আলোচনাতেও তাঁর আগ্রহ বড় কম ছিল না। পদে পদে দুরূহ তত্ত্বের গোলকধাঁধায় পড়ে যখনি তিনি উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়তেন, তখনি এসে শরণ নিতেন মহর্ষির কাছে। বিনীত দৈন্যের একান্ত প্রসন্নতায় নিজের হাতে ঝাঁট দিতেন মহর্ষির বাস-গুহা। যতক্ষণ একা থাকতেন একমনে করতেন রামনাম। সুযোগ পেলেই ভিক্ষুকের মত এসে হাজির হতেন মহর্ষির কাছে, নিবেদন করতেন দ্বিধাগ্রস্ত সমস্যাগুলির বিবরণ। অধীত বিষয়গুলি গ্রন্থ সাহায্যে বুঝতে না পেরে, কাগজ

কলম নিয়ে আসতেন মহর্ষি-সন্নিধানে। মীমাংসাগুলি মহর্ষি নিজ হস্তে লিখে দিয়ে সমস্ত সমস্যার ক'রে দিতেন সমাধান। এইভাবে ধীরে ধীরে মহর্ষির বাণী অনুচর-মণ্ডলির মাঝে হয়ে উঠলো সংগৃহিত।

এই প্রসঙ্গে শিবপ্রকাশম্ পিল্লাইয়ের নামটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পিল্লাই মহর্ষিকে প্রথম দেখেন ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে এবং প্রথম দর্শনেই আকৃষ্ট হন। স্বভাবতঃ গম্ভীর চিন্তাশীল এই মানুষটিকে মহর্ষিরও বোধ করি গোড়া থেকেই ভালো লেগেছিল। আধ্যাত্মিক প্রস্তুতির একটা প্রচ্ছন্ন ফল্গুস্রোত যে তাঁর মধ্যে ছিলো, তার পরিচয় তাঁর জীবনে প্রচুর ভাবেই পাওয়া যায়, অথচ তাঁর সারা জীবনের জিজ্ঞাসার ফাঁকে সত্যিকারের আধ্যাত্মিক পরিণতি যে দানা বেঁধে উঠবার সুযোগ পায়নি এ কথাও ঠিক। বহুদিন পর্যন্ত মহর্ষির সঙ্গলাভ ক'রেও এই স্বল্পভাষী ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিটির জীবনে দৃশ্যত এমন কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় নি, যেটাকে বিশেষভাবে মহর্ষির প্রভাব বলে বর্ণনা করা যায়।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে পিল্লাই সরকারী চাকরিতে দিলেন ইস্তফা। ইতিপূর্বে স্ত্রী-বিয়োগ ঘটে জীবনযাত্রার ধারাটায় একটা মোড় ফিরেছিলো। কিন্তু এ সম্বন্ধে তিনি যে অবহিত ছিলেন না, তারও প্রমাণ আছে। এখন নূতন ক'রে প্রশ্ন জাগলো—'অতঃ কিম্?' পুনরায় দারপরিগ্রহ করার প্রশ্নটা মনের মধ্যে ছিলো, কিন্তু তার প্রতিবন্ধকও ছিল পাশাপাশি। উচিত অনুচিতের দ্বন্দ্বের মাঝে নিজের বুদ্ধিতে কোন একটা মীমাংসায় পৌঁছাতে না পেরে, পিল্লাই সমস্যাগুলি কাগজে লিখে নিয়ে গেলেন বিঘ্নেশ্বরের মন্দিরে। সারারাত্রি সমস্যা পূরণের প্রার্থনা ক'রে, দিলেন ধর্ণা। আশা ছিল ভোরের আলোয় লিখিত প্রশ্নের দৈব উত্তর লিখিতভাবে পেয়ে, সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। সকাল হ'ল, কিন্তু উত্তর পাওয়া গেল না। আশাহত

বিমর্ষ প্রাণে পিল্লাই নিরুত্তর দেবমন্দির পরিত্যাগ ক'রে এলেন মহর্ষি সন্নিধানে।

যে কয়দিন পিল্লাই মহর্ষি'র কাছে রইলেন, তার মধ্যে একবারও পেলেন না ব্যক্তিগত প্রশ্নগুলি উত্থাপন করবার সুযোগ। মহর্ষি'র কাছে সদাসর্বদাই লোকের ভিড়, তার মাঝখানে এসব কথা তোলাও যায় না। অথচ মীমাংসা একটা না পেয়ে ফিরে যাওয়াই বা যায় কি ক'রে? পিল্লাই মহা সমস্যায় পড়ে গেলেন। কত রকমের সমস্যার কথাই তো লোকে মহর্ষি'র কাছে এনে হাজির করে। অতএব প্রথম প্রশ্নটি—'সংসারে দুঃখের হাত এড়াবার জন্য কি আমার করণীয়' জিজ্ঞাসা করায় বাধা নেই। কিন্তু এর পরের প্রশ্নগুলি, যথাক্রমে 'যে মেয়েটির কথা ভাবছি তার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে কিনা?' 'যদি না হয়, কেন হবে না?' 'যদি বিয়ে হয় খরচের টাকাপয়সা জুটবে কোথা থেকে?' মুস্কিল হ'ল, এইগুলি নিয়ে। এই ধরনের প্রশ্ন মহর্ষি'কে কেউ করে না। সরলপ্রাণ নিষ্পাপ মানুষটি কয়েকদিন ধরে মনের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি ক'রে শেষ পর্যন্ত হার মানলেন। নাঃ, হয় না। মহর্ষি'র কাছে এসব ছোট কথা বলাই যায় না। অপেক্ষা ক'রে আর লাভ নেই। দেশে ফিরে যাওয়াই ভালো।

সিদ্ধান্ত স্থির ক'রে তিনি বসে আছেন। অন্যদিনের মত সেদিনও হয়েছে বহু ভক্তের সমাগম। পিল্লাইয়ের দৃষ্টি ছিল মহর্ষি'র মুখে নিবদ্ধ। সহসা তিনি দেখলেন, মহর্ষি'কে বেষ্টন ক'রে আছে অপূর্ব এক জ্যোতির্মণ্ডল। তার মধ্যে আবির্ভূত হলেন আবার মিলিয়ে গেলেন অনুপম এক শিশুমূর্তি। পিল্লাই বিহ্বল হ'য়ে কেঁদে উঠলেন। উপস্থিত আর সকলে এ দৃশ্য দেখেননি। তাঁরা পিল্লাইয়ের ভাবান্তর দেখে কেউ-বা হাসলেন, কেউ-বা বিদ্রূপ করলেন। পরের দিনও ঘটলো অনুরূপ আর একটি ঘটনা। সেদিন পিল্লাই দেখলেন বাল-সূর্যের মত অরুণাভ হয়ে উঠলো মহর্ষি'র সারা দেহ—

চারিদিকে বহু পূর্ণিমার উদ্ভাসিত জ্যোতির্মণ্ডল। আরও একদিন মহর্ষিকে তিনি প্রত্যক্ষ করলেন, স্ফটিকের মত স্বচ্ছরূপে। এইগুলি দেখার মধ্য দিয়ে কেমন ক'রে কি ঘটে গেল, কে বলবে। পিল্লাইয়ের মনের ধারাটি গেল বদলে। তার মনে হ'ল দৈবানুগ্রহ তিনি লাভ করেছেন। যেখানে যত সমস্যা ছিল সব গেছে একসঙ্গে মিটে।

প্রসঙ্গান্তরে যাবার আগে পিল্লাইয়ের কতকগুলি প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষির কয়েকটি উক্তি থেকে মহর্ষির ভাবধারা এবং বিশিষ্ট ভঙ্গির আভাস পাওয়া যাবে ঃ

পিল্লাই ঃ আমি কে ?

মহর্ষি ঃ আত্মসত্তা দেহ নয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় নয়, কর্মেন্দ্রিয় নয়, নিশ্বাস নয়, প্রাণ নয়, মন নয়, এমন কি যে সুষুপ্তির অবস্থায় এই সমস্ত বস্তুর কোন অস্তিত্বই থাকে না—তাও নয়।

পিল্লাই ঃ এদের কোনটাই যদি 'আমি' নয়—তবে আমি কি ?

মহর্ষি ঃ এদের সব ক'টিকে একে একে বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে—আত্মসত্তা তাই। চৈতন্যসত্তাও তাই।

পিল্লাই ঃ কেমন এই চৈতন্যসত্তা ?

মহর্ষি ঃ আমিত্ব চিন্তা নিঃশেষে অবলুপ্ত হলে যে সৎ-চিৎ-আনন্দময় অবস্থাটি আসে, তাকেই বলে মৌন বা চৈতন্যসত্তা।

পিল্লাই ঃ ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা যায় কি ক'রে ?

মহর্ষি ঃ দৃশ্যময় জগতের বিলোপ ঘটলে তবেই উপলব্ধি হয় স্রষ্টার স্বরূপ।

পিল্লাই ঃ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুজগতকে দেখার অবস্থায় ব্রহ্মোপলব্ধি কি সম্ভব ?

মহর্ষি ঃ কখনোই না। দ্রষ্টাকে যদি রজ্জুর সঙ্গে তুলনা করি, তাহলে দৃশ্যকে তুলনা করতে হয় রজ্জুতে সর্পভ্রমের সঙ্গে। যতক্ষণ

পর্যন্ত এই মিথ্যা সর্পভ্রমটি বিনষ্ট না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত রজ্জুর প্রকৃত স্বরূপটি বোঝা যায় না।

পিল্লাই : দৃশ্যজগত কখন লোপ পায় ?

মহর্ষি : যাবতীয় চিন্তার উৎস যে মন—সে তার সর্ববিধ বিকার নিয়ে যখন বিনষ্ট হয়, তখনই ঘটে দৃশ্যজগতের বিলোপ।

পিল্লাই : মন বস্তুটি কি ?

মহর্ষি : সমস্ত চিন্তার সমষ্টি নিয়ে মন। মন এক ধরনের শক্তিরই বিকাশ; দৃশ্য-জগতরূপে মনই হয় প্রতিভাত। যেখানে এর উৎস, সেই উৎস মুখেই যদি এর বিনাশ ঘটে—তাহলেই হয় আত্মোপলব্ধি সম্ভব। মনের বহির্গমনের সঙ্গে সঙ্গে জগতের হয় উদ্ভব। তখন আর আত্মসত্ত্বাকে জানা যায় না।

পিল্লাই : মনকে ধংস করা যায় কি ক'রে ?

মহর্ষি : মনকে বিনষ্ট করবার একমাত্র পন্থা হ'ল 'কে আমি ?' —এই জিজ্ঞাসায় লেগে থাকা। এই জিজ্ঞাসাটি উদ্ভূত হয় মানসিক ক্রিয়া রূপে—তা ঠিক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত, মনের ক্রমিক বিলয়ের সঙ্গে সঙ্গে এরও হয় অবসান। যে বংশদণ্ড দ্বারা চিতাগ্নির উজ্জীবন ঘটানো হয়—সেও শেষ পর্যন্ত হয় ভস্মসাৎ। তখন জাগে আত্মজ্ঞান। অহং যায় মুছে। প্রাণবায়ু ও জীবনীশক্তির ঘটে অবসান—কারণ একই উৎস পথে অহংসত্ত্বা, প্রাণবায়ু ও জীবনীশক্তির উদ্ভব। এর পরে 'আমি করছি' এই বোধ আর থাকে না। আত্মতত্ত্বের কাছে আমিত্বের সমর্পণই হ'ল সত্যিকারের ভক্তি। আত্মসমর্পণের প্রকৃত স্বরূপ এই।

প্রশ্নোত্তরের সবগুলি এখানে দেওয়া যাবে না। যেটুকু দেওয়া হ'ল তাতেই মহর্ষির বক্তব্যের আভাস পাওয়া যাবে। কথাগুলি হয়তো নূতন নয়। প্রত্যক্ষ উপলব্ধির আলোকে, নূতন হ'য়েই ফুটে ওঠে সত্যের চিরন্তন স্বরূপটি। সত্যদ্রষ্টার সমক্ষে বসে যে শোনে সে কেবল কথাগুলিই শোনে না, তার পিছনের জ্ঞানময় ব্যক্তিত্বটিরও

পায় আভাস। সমস্ত আবেষ্টনটি একযোগে শ্রোতার সমগ্র সত্ত্বার মূলে দেয় দোলা। যে যতটুকু আন্তরিকতার সঙ্গে এসে হাজির হয়, সেই পরিমাণেই লাভের কড়ি অঞ্জলি ভরে নিয়ে ফিরে যায়।

প্রায় এই সময়েই, অরুণগিরির সঙ্কীর্ণ পার্বত্যপথ ধরে, দ্বিপ্রহরের খর রৌদ্রকর উপেক্ষা ক'রে, মহর্ষি সন্নিধানে এসে হাজির হলেন তৃষিত একটি মানুষ। মানুষটি যে অসাধারণ তা অনুভব করবার জন্য ফিরে দেখবার প্রয়োজন হয় না। মহত্ত্বের ও মনীষার রাজটিকা তার প্রশস্ত ললাটে আঁকা। চোখের দীপ্তি অনন্যসাধারণ। মহর্ষি তখন গুহার বহিঃপ্রকোষ্ঠে ছিলেন উপবিষ্ট। আগন্তুক সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত ক'রে উচ্ছ্বসিত কম্পিত কণ্ঠে বললেন, 'প্রভু, আমি ভিক্ষুক। তপস্যার স্বরূপ, বহু অনুসন্ধানেও আমি জানতে পারিনি। বেদান্তশাস্ত্র থেকে আরম্ভ ক'রে যেখানে যা কিছু পড়ার আছে, সবই আমি পড়েছি। হৃদয় ভরে করেছি জপ। কিন্তু তপস্যা কাকে বলে তা আমি পারিনি নির্ণয় করতে। শরণ নিলাম তোমার চরণে। তুমি আমাকে তপস্যার উপদেশ দাও।'

ভাগ্যক্রমে এই সময়ে তৃতীয় ব্যক্তি কেউ ছিল না। প্রায় পনেরো মিনিটকাল ধরে অপলক দৃষ্টিতে মহর্ষি রইলেন আগন্তুকের পানে চেয়ে। তারপর ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন: 'অহং-চিন্তার উৎসপথে, যদি কেউ একাগ্রভাবে রাখে দৃষ্টি—মন যায় সেইখানেই মগ্ন হ'য়ে। তাকেই বলে তপস্যা। মন্ত্র জপ কালে, মন্ত্রধ্বনির উৎস-পথে যদি কেউ লক্ষ্য রাখে—মন যায় সেইখানেই আবিষ্ট হ'য়ে। তপস্যা বলে তাকেই।'

আগন্তুকের মনে হ'ল, এমন কথা যেন আর জীবনে কখনো শোনেন নি। মনে হ'ল, এতদিনের অপেক্ষা তাঁর ছিলো যেন এরই পথ চেয়ে। দূর-দুর্গম বিচিত্র পথে যে তপস্যার স্বরূপকে তিনি অনুসন্ধান ক'রে হয়েছেন ব্যর্থ—এত সহজে যে তারই মর্মকথাটি

প্রকাশ করা যায়, এ যেন বিশ্বাস করা যায় না। অথচ কথাটির সারবত্তা প্রাণকে করে স্পর্শ। মনে হ'ল এক নিমেষে যেন তাঁর দিব্যদৃষ্টি গেছে খুলে। এই তো তপস্যা ;—অত্যন্ত কাছের জিনিস বলেই যেন, এতদিন দিয়েছে এমন ক'রে ফাঁকি। হাত বাড়ালেই তাকে ছোঁয়া যায়। ইচ্ছাটুকু হ'লেই তাকে ধরা যায়। মনে হয় যেন ধরা দিয়েই আছে। আগন্তুক বিহ্বল হ'য়ে চেয়ে রইলেন। আগন্তুকের নাম কাব্যকান্ত গণপতি শাস্ত্রী। বেদবেদান্ত, কাব্য, উপনিষদ, দর্শন, ইতিহাস ইত্যাদি সর্ব্বশাস্ত্র পারংগত মহাপণ্ডিত, মহাকবি, মহাতপস্বী তিনি। দ্বাদশ বর্ষকাল তীর্থে তীর্থে অবস্থান ক'রে কঠিন তপস্যায়, মন্ত্রযজ্ঞে জীবনের অনেকখানি কাল করেছেন অতিবাহিত। জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল সাধনার পথে চরম পরিণতিতে গিয়ে পৌঁছানো। যত্ন চেষ্টা অধ্যবসায়ের ছিল না কোথাও ফাঁক, ছিল না কোন ত্রুটি। আশৈশব ছিল এই একটি মাত্র ধ্যান-জ্ঞান। এই ভাবে জীবনের ত্রিশটি বৎসর কেটে যাওয়ার পরে, মনে হ'ল যেন সারা জীবনের সমস্ত আয়োজনই হয়েছে ব্যর্থ। তপস্যার মূলসূত্রটিই হয়নি ধরা, এবং তারই ফলে সমস্ত কিছুই হতে চলেছে ব্যর্থ। লোকপরম্পরায় মহর্ষির নামটি যেন কোথাও শুনেছিলেন। শুনেই মনে হ'ল তপস্যার চরম সমাধান আছে তাঁরই কাছে। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকুল হয়ে তিনি ছুটলেন মহর্ষির সন্ধানে।

মহর্ষির সংস্রবে এসে, এই তপস্বীর জীবনে বহুবাঞ্ছিত পরিণতির রুদ্ধ দ্বার কিভাবে খুলে গেল—বাইরের দৃষ্টি দিয়ে তার বিচার সম্ভব নয়। হয়তো বা তাঁর জীবন-তপস্যায় কেবল এই যোগাযোগটুকুরই অপেক্ষা ছিল। কেমন ক'রে কিসের উপলক্ষে কোথাকার অভাবটি কেমন ক'রে যায় মিটে, তা সাধারণের চোখে পড়ার বিষয় নয়। গণপতি শাস্ত্রীর শেষ জীবনের রূপটি যারা দেখেছে, তারাই একবাক্যে স্বীকার করেছে যে বিশ্বাসে, ভক্তিতে, জ্ঞানে, আনন্দে পরিপূর্ণ

জীবন হিসাবে এমনতর আর একটি সচরাচর দেখা যায় না।

একথা মনে করা ভুল হবে যে, মহর্ষি রমণের কাছে দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর ধরে যত লোক এসেছে এবং আহরণ ক'রে নিয়ে গেছে তাঁর অফুরন্ত ভাণ্ডারের ধন, তারা সবাই এসেছে অনুরূপ মহাতৃষ্ণায় তৃষিত হ'য়ে। সাধারণতঃ দেখা যায় শোকে, দুঃখে, কামনায়, বাসনায় জর্জরিত হ'য়ে অথবা নিছক কৌতূহলের বশে, যে মানুষগুলি দিনের পর দিন এসে হাজির হয়েছে মহর্ষির সান্নিধ্যে, মানবমনের গভীরতম এই তৃষ্ণার কোন পরিচয়ই তাদের জানা ছিল না। তথাপি, মহর্ষি তাদের উপেক্ষা ক'রে ফিরিয়ে দেন নি। যেখানে যেটুকু অভাববোধের ছিদ্র-পথ তিনি পেয়েছেন—সেই পথেই তিনি প্রয়োগ করেছেন তাঁর অভ্রান্ত শরসন্ধান। প্রচ্ছন্ন তৃষ্ণাটি তুলেছেন জাগিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে বেজেছে সত্যিকারের চাওয়ার সুরটি। এই প্রসঙ্গে রামস্বামী আয়ারের কথাটি প্রথমেই বলা যায়।

অতি সাধারণ এক সরকারী কর্মচারি—রাস্তাঘাট পরিদর্শন ক'রে বেড়ানো ছিল রামস্বামীর কাজ। আধ্যাত্মিকতার কোন ধারই তিনি ধারতেন বলে মনে হয় না। সহজ, সরল মানুষ; দোষে গুণে সাধারণ মানুষের মত দিনগত পাপক্ষয় ক'রে চলেছিলো তাঁর জীবন-যাত্রা। কি একটা খেয়াল হ'ল—সাধু দর্শনে এসে হাজির হলেন। দৈবক্রমে তখন মহর্ষি ছিলেন একা—তাঁকে দেখে রামস্বামী যে হঠাৎ কেন বিচলিত হ'য়ে পড়লেন তা বলা যায় না। ঝোঁকের মাথায় তিনি বলে বসলেন, 'অবতার পুরুষেরা আসেন পাপীদের উদ্ধারের জন্য। আমার কি কোন আশা নেই?' স্নিগ্ধ মধুর কণ্ঠে মহর্ষি দিলেন সাড়া: 'আছে আশা, নিশ্চয়ই আছে।' কথা মাত্র এই-টুকুই। কথার পিছনে আরও একটা কি ছিল। রামস্বামীর মন গেল মেতে; জড়িয়ে গেলেন তিনি মহর্ষি রমণের সম্মোহন-জালে।

এর পরে ঘন ঘন চলতে লাগল তাঁর আসা যাওয়া। স্বাস্থ্য ভালো ছিলো না। হজম-শক্তি হয়েছিলো বিকল। বহুদিন ধরে রাত্রে দিনে ভালো ঘুম হ'ত না। শরীরের গ্লানির ফলে মনেও ছিলো না সুখ শান্তি। মহর্ষির কাছে এ সবই তিনি বলেছিলেন। যেমন ক'রে বন্ধু বন্ধুর কাছে অকপটে মনের দ্বার খুলে দেয়, তেমনি ক'রেই বলেছিলেন সমস্ত কথা।

অভ্যাস মত সে রাত্রিতেও তিনি মহর্ষির কাছে ছিলেন। মহর্ষি ছিলেন নিস্তব্ধ। হঠাৎ এক সময়ে মহর্ষি করুণার দৃষ্টি মেলে রামস্বামীর দিকে তাকালেন। রামস্বামীর মনে হ'ল যেন সঙ্গে সঙ্গে একটি উত্তপ্ত স্রোত বয়ে গেল তাঁর দেহে। একটু পরেই তাঁর ঘুম এলো। গভীর নিদ্রা। সেইদিন সেই মুহূর্ত থেকে তাঁর লুপ্ত হজম-শক্তি এলো ফিরে। এই ঘটনাটির পর থেকে রামস্বামীর নির্ভরতা মহর্ষির মাঝে যেন একটা ঐকান্তিক অবলম্বনের পেল সন্ধান। ক্রমে ক্রমে উৎসমুখের আচ্ছাদনটি গেল খুলে। ধন্য হওয়ার পথটি রামস্বামীর চোখের সামনে উদ্‌ঘাটিত হ'ল। কেমন ক'রে কি হ'ল তিনি বুঝতেও পারলেন না। অহেতুক কৃপার স্রোতে পাল তুলে ভেসে গেলেন।

কতকটা অনুরূপ অবস্থায়, মাত্র পঁচিশ বৎসর বয়সে, স্বামী-পুত্র-কন্যা-হারা লক্ষ্মী অম্মল শোকার্তা হ'য়ে এসে মহর্ষির শরণ নিলেন। জীবনের কোন প্রান্তে ছিল না এতটুকু আলোকের রেখা। দুঃস্বপ্নের মত, পাষাণের ভার হ'য়ে বুকের উপর চেপে ছিল মর্মান্তিক স্মৃতির বোঝা। ভগ্নীড়ে ছিল না কোন আকর্ষণ। পারিপার্শ্বিক জগতের কোনখানে ছিল না শান্তি। যে শোক পোড়ায় সেই যে শেষপর্যন্ত বহ্নিসংস্পর্শে জীবনকে ক'রে তোলে পূত পবিত্র, এ ধারণা লক্ষ্মী অম্মলের ছিলো না; থাকবার কথাও নয়। কিন্তু এই শোকই তাঁকে মুক্তির সিংহদ্বারের প্রান্তে যেখানে এনে পৌঁছে দিয়ে গেল, সেখান থেকে আকাশ প্রায় হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়। অরুণগিরির

গুহামুখে মহর্ষি'র দেবদুর্লভ প্রশান্ত মূর্তির পানে চেয়ে, লক্ষ্মী অম্মলের মনে হ'ল যেন সেই নিমেষেই তাঁর জীবনব্যাপী সমস্ত দুঃখের হ'য়ে গেছে ক্ষতিপূরণ। প্রথম দর্শনেই প্রতীতি হ'ল, তাঁর জীবনের রিক্ত পাত্রে যতখানি ছিল বেদনা—তার সমস্তটাই যেন এই দৃষ্টিপ্রসাদের স্পর্শ পেয়ে অকস্মাৎ একদিন অমৃতে হয়ে যাবে রূপান্তরিত।

সম্মোহিতের মত অনেকক্ষণ একভাবে দাঁড়িয়ে থেকে লক্ষ্মী অম্মল যখন পাহাড়ের পথে আবার নেমে এলেন, তখনি তাঁর মনে হচ্ছিল যেন অনেকখানি হাল্কা হ'য়ে গেছে মনের মেঘ। কেমন ক'রে কি হ'ল কে বলবে? সৌর করের ছোঁয়া লেগে যেমন ক'রে যুগ-সঞ্চিত তুষারের স্তূপ যায় গলে, তেমনি ক'রেই বুঝি পলকের দৃষ্টিপাতে মুক্তি পেয়ে গেল প্রবাহের রূপে তাঁর অসহ্য শোকের সঞ্চয়। নূতন ক'রে শুরু হ'ল তাঁর জীবন, মহর্ষিকে কেন্দ্র ক'রে। দিকে দিকে বিস্তৃত হ'য়ে গেল রমণাশ্রমকে ঘিরে তাঁর অনলস সেবার বাহু। সহজ মানুষের মত দানে, কর্মে, স্নেহে, পুণ্যে জীবন হ'য়ে উঠলো ভরপূর। নিরাশ্রয়া একটি মেয়েকে পালিতা কন্যা রূপে গ্রহণ ক'রে, নূতন ক'রে শুরু করলেন ঘর-সংসারের খেলা। কিন্তু তাসের ঘরটি দমকা-হাওয়ায় আবার পড়লো ভেঙে। নবজাত শিশুসন্তান রেখে লক্ষ্মী অম্মলের পালিতা কন্যাটি অকস্মাৎ একদিন মহাপ্রস্থানের পথে চলে গেল। মৃতু-সংবাদ-বাহী তার বার্তাটি হাতে নিয়ে লক্ষ্মী অম্মল ছুটে গেলেন মহর্ষি'র কাছে।

টেলিগ্রাম পড়ে মহর্ষি বালকের মত অশ্রুপাত করতে লাগলেন। একসঙ্গে ঝরতে লাগলো গুরু-শিষ্যার চোখের জল। কে যে কাকে প্রবোধ দেবে, সেইটাই হ'য়ে উঠলো সমস্যা। কিন্তু আশ্চর্য, এবার আর লক্ষ্মী অম্মল আগের মত ক'রে ভেঙে পড়লেন না। মানুষের জন্ম-মৃত্যু দুঃখ-সুখগুলি যে মহর্ষির কাছে চিরদিনই ছিল উপেক্ষার বস্তু, তিনিও কিন্তু সর্বহারা স্নেহ-বঞ্চিতার মর্মপীড়াটিকে মনের মোহ বলে

অগ্রাহ্য করতে পারলেন না। সমদুঃখ-ভাগী রূপে মহর্ষিকে পেয়ে এবার অতি সহজেই লক্ষ্মী অম্মল বীত-শোকা হ'য়ে সহজ অবস্থায় এলেন ফিরে। পৃথক সত্ত্বা বলতে তাঁর আর কিছুই রইলো না।

এ পর্যন্ত মহর্ষি রমণের অলৌকিক আবেষ্টনে যতগুলি আগন্তুক নরনারীকে আমরা দেখেছি, তারা সবাই অল্পবিস্তর আমাদের ঘরের মানুষ। সংস্কারের সাম্যে এদের মনোভাবের সঙ্গে আমরা পরিচিত বলেই নিজেদের মনে এদের প্রত্যেকটি দুঃখ-সুখের প্রতিধ্বনি খুঁজে পাই। হাম্‌ফ্রিস্ এ দলের নন। খাস বিলাতের নবাগত মানুষ—তার উপরে উঁচুদরের পুলিশের লোক। —১৯১১ সালে চাকরি নিয়ে প্রথম এলেন এদেশে। জাহাজ থেকে বোম্বাইয়ে নামলেন—অসুস্থ অবস্থায়। হাসপাতালে রোগশয্যায় পড়ে থাকা অবস্থায়, স্বপ্নের মাধ্যমে পেলেন কতকগুলি ভবিষ্যতের আভাস। নিছক স্বপ্ন বলেই যেগুলি মনে হ'তে পারতো, ভেলোরে পৌঁছে সেইগুলি যখন একে একে বাস্তব রূপে ঘটতে আরম্ভ করলো, তখন এলো তাঁর বিস্ময়ের পালা। অর্ধ-জাগ্রত অবস্থায় যেসব দৃশ্যগুলি তাঁর চোখের সামনে এসে হাজির হ'ত—সেগুলি যে রোগতপ্ত মস্তিষ্কের বিকার নয় বা নিজেরই চিন্তার প্রতিচ্ছবি নয়, এর প্রমাণ তিনি পেলেন ভেলোরের কর্মস্থলে এসে। তেলেগু ভাষার শিক্ষকরূপে যে মুন্সিকে তিনি এখানে পেলেন, স্বপ্নদৃষ্ট ব্যক্তিগুলির অন্যতম রূপে তাকে চিনতে পেরে হাম্‌ফ্রিস্ হলেন বিস্মিত। মুন্সির কাছেও সমগ্র বিবরণটি হ'য়ে উঠলো রহস্যময়। পড়াশুনা গেল ঘুচে। মুখ্য হয়ে উঠলো এমন সব আলোচনা, যেগুলি ঠিক আধ্যাত্মিক না হ'লেও, অনেকটা তার কাছ ঘেঁসেই যায়। বিরূপাক্ষ গুহাবাসী মহর্ষি রমণের নিখুঁত খুঁটিনাটি বিবরণ হাম্‌ফ্রিসের জানবার কথা নয়। কাব্যকান্ত গণপতি শাস্ত্রীর প্রতিকৃতির সঙ্গেও হাম্‌ফ্রিসের পরিচয় থাকবার কথা নয়। সমস্ত বিবরণ শুনে সরলপ্রাণ মুন্সি মহা সমস্যায় পড়ে গেলেন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ বিশ্বাসও তাঁর

হ'ল যে, গভীরতর পরিণতির পূর্বাভাস হিসাবে এই সঙ্কেতময় স্বপ্নগুলির মূল্য আছে। কোথা দিয়ে, কোন পথে যে কোথাকার যোগ-সূত্রের সন্ধানটি কোথায় এসে পৌঁছায় তা মানুষের বুদ্ধির অগম্য। এই সত্যটি মুন্সি অস্বীকার করতে পারলেন না বলেই এর পরে তাঁরই মধ্যস্থতায় হাম্‌ফ্রিস্ গণপতি শাস্ত্রীর সঙ্গে হলেন পরিচিত এবং পরের দিনই হাম্‌ফ্রিস্ গিয়ে হাজির হলেন মহর্ষির কাছে। তাঁর উপরে মহর্ষি-সান্নিধ্যের প্রতিক্রিয়ার বিবরণ যেভাবে তিনি নিজেই লিখেছেন, তার খানিকটা এখানে তুলে দেওয়া হ'ল।

'গুহায় পৌঁছে মহর্ষির পদপ্রান্তে আমরা নির্বাক হ'য়ে রইলাম বসে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মনে হ'ল যেন আমি নিজের মধ্যে আর নেই। মহর্ষির চোখের দিকে আধঘণ্টা ধরে চেয়ে রইলাম। নিষ্পলক গভীর দৃষ্টিতে দেখলাম না কোন পরিবর্তন। বোধ হ'তে লাগলো যেন দেহটি পরমাত্মার মন্দির। এ যেন মানুষের দেহ নয়; আসনে উপবিষ্ট নিথর একটা অতিমানবীয় শবদেহ—ঈশ্বর যাকে নিজের হাতে নিয়েছেন তুলে; ভিতরটি জুড়ে বসেছেন তিনি নিজে—বাইরে ছড়িয়ে পড়ছে তারই অভ্রান্ত প্রকাশ। ভাষায় কতটুকুই বা বলতে পারি আমার মনোভাব!

'বসে থাকতে থাকতে দেখলাম এত-টুকু-টুকু ছেলেমেয়েরা দলে দলে এসে হাজির হ'ল। মহর্ষির চারিপাশে তারা ঘিরে বসে রইলো নির্বাক হ'য়ে। কথা নেই, চঞ্চলতা নেই। দিনের পর দিন মহর্ষির সঙ্গে তাদের একটি কথাও হয় না। তবু তারা এমনি ভাবে নিজেরাই আসে; পাহাড়ে উঠে, চুপচাপ এসে বসে থাকে অনেকক্ষণ ধরে তাঁর কাছটিতে। দৃশ্যটি আমার মনকে করলো গভীর ভাবে অভিভূত।'

মহর্ষির সঙ্গে হাম্‌ফ্রিসের প্রথম দিনের ও পরবর্তী কথাবার্তার কিছু কিছু এখানে দেওয়া হ'ল। হাম্‌ফ্রিস্ জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্রভু, আমার দ্বারা কি জগতের উপকার হতে পারে?' মহর্ষি বললেন,

'নিজের উপকার করো। জগতের মধ্যে তুমি, তোমার মধ্যেই জগৎ। বিশ্বের স্রষ্টা যিনি—জগতের উপকারের দায়িত্ব তাঁরই—তোমার নয়।' কথাগুলি হয়তো বা হাম্‌ফ্রিসের ঠিক মনঃপুত হ'ল না। যে ভাবের পরিপার্শ্বিকতায় তিনি মানুষ হয়েছেন, তার মধ্যে ব্যক্তিত্বলোপ অথবা দায়িত্বজ্ঞান বর্জন স্বপক্ষে কোন যুক্তিই সহজে গ্রহণযোগ্য হওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু হাম্‌ফ্রিসের মনোজগতে তীব্র তীক্ষ্ণ যুক্তি-যুগের স্পর্ধিত বৈজ্ঞানিকতা ছাড়াও হয়তো বা একটা নিভৃত বিশ্বাসের অনুভূতিময় সত্তার প্রাধান্য ছিল। মহর্ষির উক্তির সত্যটি, নির্বিচারে না হলেও, তিনি নিঃশব্দে মেনে নিলেন। প্রথম দিনের ঘটনা মোটামুটি এইটুকুই।

পরের দিন আবার ষাট মাইল পথ দ্বিচক্রযানে অতিক্রম ক'রে, অধীর আগ্রহে হামফ্রিস মহর্ষি-সন্নিধানে এসে উপস্থিত হলেন। যে সামান্য কটি কথা মহর্ষি তাঁকে উদ্দেশ ক'রে বললেন, তাতেই তাঁর এই প্রতীতি জন্মালো যে মহর্ষির অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সম্মুখে তাঁর জীবনের সবকিছুই যেন একসঙ্গে গেছে উদ্ঘাটিত হ'য়ে। পাতার পরে পাতা, অধ্যায়ের পরে সাজানো অধ্যায়গুলি—ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানের সমস্তটুকু যেন তিনি নিঃশেষে নিয়েছেন পড়ে। তার মনে হ'ল সোনার কাঠির যাদুস্পর্শে তাঁর জীবনের যতো লোহা, সবই যেন এককালে সোনায় গেছে রূপান্তরিত হ'য়ে।

আশ্চর্য লাগে ভাবতে যে, সামান্য কয়েকটি দিনের প্রশ্নোত্তর আলোচনার ফলেই, এই বিদেশী মানুষটি মহর্ষি রমণের বিশিষ্ট ভাবধারা এমন পরিপূর্ণভাবে নিজস্ব ক'রে নিতে পেরেছিলেন। মহর্ষির বাণীর সংক্ষিপ্তসার তিনি লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন নিজের ভাষায়। যতটুকু এখানে দেওয়া সম্ভব হ'ল তা থেকেই অনুভূত হবে যে এগুলি কেবলমাত্র কতকগুলি শোনা কথার সমষ্টি মাত্র নয়। সার্থক মননক্রিয়ার ফলে, বহুভাগ্যে, যে সত্যোপলব্ধি জিজ্ঞাসুর অন্তরে প্রতি-

ফলিত হয়, এর মধ্যে পাওয়া যায় তারই অভ্রান্ত ইঙ্গিত। এর পরে হাম্‌ফ্রিসের পরিণতি কি হ'ল, তা জানা যায় না, কিন্তু অনুমান করা যায়। সামান্য কিছুদিনের মধ্যেই চাকরি ছেড়ে দিয়ে দেশে চলে গেলেন—ধর্মযাজকের দীনবেশে। বাইরের দিক দিয়ে এই পর্যন্তই; অন্তরের দিক দিয়ে—পূর্ণচ্ছেদ কোথায়, তার হিসাব কে রাখবে।

হাম্‌ফ্রিস্ লিখেছেন: 'দৃশ্যজগত বহুবিচিত্র, বিস্ময়কর। এক, অদ্বিতীয়, এবং পরমতম বিস্ময়ের যে বস্তুটি আমরা ধারণা করতে পারি না সেটি হ'ল সেই অমিত শক্তি, যার জন্য সম্ভব হচ্ছে সমগ্র দৃশ্যজগৎ এবং তাকে প্রত্যক্ষ করার কাজটি। জীবন, মৃত্যু, দৃশ্য-জগতের নিয়ত পরিবর্তনশীল ঘটনাবলীর উপরে দৃষ্টি রেখো না। দেখা বা প্রত্যক্ষ করার ক্রিয়াটির কথাও ভেবো না। কে দেখছে—কার জন্য সমস্ত কিছু সম্ভব হচ্ছে—সেইটিই হ'য়ে উঠুক তোমার চিন্তার বিষয়। এই দ্রষ্টার প্রতি তোমার দৃষ্টি যেন স্থির হ'য়ে থাকে।'

'উপলব্ধি হ'ল, বাস্তবরূপে ঈশ্বরকে দেখা। প্রকৃত ঈশ্বরকে যখনই দেখি রূপক কিংবা আলঙ্কারিক হিসাবে, তখনই করি ভুল। একটুকরো কাঁচের গায়ে রঙিন ছবি এঁকে আলোর সামনে ধরলে সেই রঙে, সেই ছবির প্রতিফলিত মূর্তি দেখা যাবে। পিছনে আলো না থাকলে কিন্তু পর্দার গায়ে রং বা ছবি কিছুই যাবে না দেখা। সাদা আলো, রং করা ছবির মধ্য দিয়ে গিয়ে, যেমন ক'রে ঘটায় তার প্রতিফলন—ঠিক তেমনি ক'রে মহাচৈতন্য বা ঈশ্বরের আলোর প্রতিফলনে কর্মধারা রূপে বিকশিত হয় মানব চরিত্রের রূপ। ঘুমন্ত বা মৃত মানুষের মধ্যে চরিত্র বলতে কিছু দেখা যায় না। জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতির সংস্পর্শে এসে বিভিন্নভাবে ক্রিয়ারত যে গতিশক্তি চৈতন্যের দ্বারা হয় নিয়ন্ত্রিত, তাতেই প্রকাশিত হয় চরিত্র। রঙিন কাঁচের আড়ালটি ভেদ ক'রে যেতে যেতে আলোক-রশ্মি যদি বাধা না পেতো, তাহলে কাঁচের অস্তিত্বটাই আমাদের মনে পড়তো না।

এক হিসাবে, আলোক-রশ্মির শুভ্র-স্বচ্ছতার খানিকটা হানি না হ'য়ে রঙিন কাঁচের মধ্য দিয়ে এর বিচ্ছুরণ সম্ভব হয় নি।'

'সাধারণ মানুষের মন এমনি একটা পর্দা। জাগতিক বিষয়ের বহু পুঞ্জিত ভিড় ঠেলে মলিন হ'য়ে এসে পড়ে এরই বুকে চৈতন্যের আলো। এই ম্লান আলোকটুকুই পড়ে তার চোখে। জ্যোতিঃস্বরূপ রয়ে যান দৃষ্টির আড়ালে। তার মন, তার সত্তা, পর্দায় প্রতিফলিত রঙিন ছবিটির মতই এই স্বপ্নালোকে হয় প্রতিফলিত। কাঁচের গায়ে রঙগুলির মত ক'রে যদি দৃশ্যমান জগতটাকে মানুষের মন থেকে মুছে দেওয়া যেত, তাহলেই স্ব-স্বরূপে মহিমান্বিত হ'য়ে প্রকাশিত হতেন জ্যোতির্ময়।'

'সমাধিস্থ ঋষি, মূল দ্রষ্টার হ'য়ে থাকেন তন্ময়। দৃষ্টিপথে দেখেন না তিনি দৃশ্য; শ্রবণে শোনেন না তিনি শব্দ; বস্তুজগৎ মনোজগৎ তাঁর চেতনাকে করে না স্পর্শ। বিশুদ্ধ চৈতন্যময় আধ্যাত্মিক জগতে হ'য়ে থাকেন তিনি আত্মহারা।'

'দ্বিধাদ্বন্দ্ব, মনের যত মেঘ, জাগতিক চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দিতে হবে সরিয়ে। তবেই হবে চৈতন্য-স্বরূপ জ্যোতির্ময়ের প্রকাশ। এ অপসরণ সম্ভব হবে কি ক'রে? মানুষকে মানুষ বলে না দেখে, দেখতে হবে ঈশ্বর সত্তায় অনুপ্রাণিত রূপে। বুঝতে হবে—নৌকা যেমন হালের পরিচালনায় চলে, তেমনিভাবে ঈশ্বরের ইঙ্গিতে দেহটিও হচ্ছে নিয়ন্ত্রিত।'

'সত্যিকারের জ্ঞান আসে ভিতর থেকে, বাইরে থেকে নয়। বুদ্ধি দিয়ে বোঝার সমষ্টি জ্ঞান নয়। ঈশ্বরত্বে নিজের রূপান্তর প্রকৃত এবং বাস্তবিকভাবে ঘটা চাই। এই উপলব্ধিতে পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই যে ঈশ্বরই সব এবং সবই ঈশ্বর।'

'বদ্ধ আমি, কারণ ইন্দ্রিয় সীমার বাইরে কিছুই আমি জানি না। অথচ অতীন্দ্রিয় আমার স্বরূপ;—তার বিস্তার সর্ব দেহে, সর্ব

মনে। আমার প্রকৃত যে সত্ত্বা সীমাহীন, তারই দ্বারা যন্ত্রের মত নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে সমস্ত দেহগুলি, সমস্ত মনগুলি। নিষ্কলঙ্ক শ্বেত জ্যোতিঃস্বরূপের মত আমার যে সর্ববিস্তারী আত্মবস্তু, সে কেন একটি দেহযন্ত্রের সঙ্কীর্ণ সীমানায় সন্তুষ্ট হ'য়ে আবদ্ধ হ'য়ে থাকবে?

মহর্ষির নিঃসংশয় বাণীর বাহকরূপে হাম্‌ফ্রিসের কথাগুলির মূল্য নিরূপিত হলেও আরও একটি বিশিষ্ট মর্যাদা এদের না দিয়ে পারা যায় না। উপলব্ধির আলোয় ঝলমল এই কথাগুলির মধ্যে তাঁর আত্মপরিচয় হ'য়ে আছে ওতপ্রোত। কিন্তু সে পরিচয় রহস্যময় হলেও পরিপূর্ণ নয়। অতএব সে প্রসঙ্গ বাদ দিলে—তাঁর লিখিত বিবৃতির উল্লিখিত অংশটুকু উদ্ধৃত করার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা প্রসঙ্গান্তরে চলে যাব।

মহর্ষি জননী অলগাম্মলকে ইতিপূর্বে আমরা বিচ্ছেদ-বিধুরা জননীর রূপেই দেখেছি। ইতিমধ্যে একের পরে একটি ক'রে কয়েক বৎসর কেটেছে। পুরাতন প্রতিকারহীন দুঃখটিও হয়তো বা সহনীয় হ'য়ে উঠেছে। মাঝখানে জ্যেষ্ঠ পুত্র নাগস্বামীর ঘটেছে মৃত্যু, কনিষ্ঠ পুত্র নাগসুন্দরমের স্ত্রী, শিশু পুত্রটিকে রেখে লোকান্তরে করেছে প্রয়াণ, ক্ষয়িষ্ণু হ'য়ে এসেছে সংসারের আকর্ষণ। মহর্ষির গৃহত্যাগের পর ধীরে ধীরে দীর্ঘ ষোল সতেরো বৎসর গেছে কেটে। এর মধ্যে কয়েকবারই মা মহর্ষি-সকাশে এসে এসে কয়েকদিন ক'রে থেকে গেছেন; কিন্তু স্থিতিলাভ করতে পারেননি। কারণ, পিছনের টানটি ছিল তখনো জোরালো হ'য়ে। তা ছাড়া পুত্রের স্বাভাবিক বৈরাগ্যকে বিরূপতা বলে ধারণা করবার কতকটা হেতুও তাঁর ছিলো না এমন নয়। প্রত্যাখ্যানের ব্যথাটিকে অভিমান পারেনি ভুলতে। এই আসা যাওয়ার দোটানার মাঝখানে গুহাবাসী পুত্রকে দেখতে এসে জননী পড়লেন অসুখে। বাধ্য হ'য়ে বেশ কিছুদিনের মত বিরূপাক্ষ গুহার সহস্র অস্বাচ্ছন্দের মাঝখানে শয্যাগত হ'য়ে মাকে পড়ে থাকতে হ'ল।

দুর্দৈব সন্দেহ নেই; কিন্তু মাতৃ-হৃদয়ের স্নেহ-পিপাসু সত্তার দিক থেকে বিধানটি হ'ল মঙ্গলের। বহুদিনের হারানিধিকে তিনি যেন এই উপলক্ষে নূতন ক'রে ফিরে পেলেন। মহর্ষির অলৌকিক সেবা-যত্নে পুত্র-পরিত্যক্তা মাতার বহুদিন সঞ্চিত মনের গ্লানি গেল মুছে। স্বল্পপরিসর গুহায় নেই নড়বার চড়বার স্থান। কোথায় বা ওষুধ, কোথায় বা চিকিৎসার উপকরণ! কিন্তু মহর্ষি-সান্নিধ্যের অমৃত-প্রলেপে মা ধীরে ধীরে উঠলেন আরোগ্য লাভ ক'রে। ফিরে গেলেন ঘরে। কিন্তু যাদের অবলম্বন ক'রে রচনা করেছিলেন তিনি সংসারের মায়া-নীড়, একে একে তাদের সকলেই গেল সরে। বিধাতা যেন অবশেষে অভ্রান্ত নির্দেশে তাঁর শেষ আশ্রয়ের স্থানটি দিলেন দেখিয়ে। অরুণাচলে ফিরে এসে মহর্ষি-জননী আশ্রম-জননী রূপে হলেন প্রতিষ্ঠিতা। পুত্রের সেবা, আশ্রমের পরিচর্যা, সমাগত ভক্ত-মণ্ডলির সুখ সুবিধার যাবতীয় দায়িত্বই তিনি নিজের কাঁধে নিলেন তুলে। কিন্তু সব কিছুর মাঝখানে তাঁর স্নেহ প্রীতি সেবা মমতার একটি মাত্র কেন্দ্রস্থল হ'য়ে রইলেন মহর্ষি স্বয়ং। আনন্দে সার্থকতায় কানায় কানায় ভরে উঠলো পূণ্যবতীর জীবন। মনে হ'ল যেন তিনি নূতন ক'রে ফিরে পেয়েছেন বহু-কাল-গত শৈশবের জীবনটি।

কিছুদিন এমনি ভাবেই কাটলো। মহর্ষিও প্রথম প্রথম সহজ অন্তরঙ্গতায় জননীকে করলেন সম্বর্ধিত। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই ঘটলো পরিবর্তন। স্নেহ-বিমুগ্ধা জননীর মনের ধারাটিকে আত্মো-পলব্ধির পথে পরিচালিত করবার উদ্দেশ্যে মহর্ষি ভাবান্তর পরিগ্রহণ করলেন। সহজ আদান প্রদানের দ্বারটি গেল বন্ধ হ'য়ে। অন্তরঙ্গতার সুরটি গেল কেটে। মহর্ষি জননীকে ডাকেন না, কথা বলেন না। তাঁর ব্যবহারে উপেক্ষার ভাবটিই যেন প্রত্যক্ষ হ'য়ে ফুটে ওঠে। মনে হয় যেন ইচ্ছা ক'রেই তিনি জননীর মনে আঘাত দিতে চান। খুঁজে খুঁজে বার করেন তাঁর পরম দুর্বলতার স্থানগুলি। শাণিত বিদ্রূপের

অব্যর্থ সন্ধানে ছিন্ন-ভিন্ন ক'রে দিতে চান তাঁর সুপ্রতিষ্ঠিত সংস্কারের ভিত্তিভূমি। জননীর মনে আসে অভিমান, প্রাণে বাজে ব্যথা। অপরাধীর মত কখনো বা হয়ে ওঠেন সঙ্কুচিত; নিরুপায়ের মত কখনো বা নিঃশব্দে করেন অশ্রুপাত। সকলের প্রতি যাঁর প্রসন্নতার অন্ত নেই, তিনি যে কেন জননীর প্রতি এমন বিমুখ এর কোন সদুত্তর তিনি খুঁজে পান না। অথচ রোগশয্যায় যে সেবা, যে অপরিসীম স্নেহ-প্রীতির নিদর্শন তিনি পেয়েছেন—তাকেও তো মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না! সমস্য হ'য়ে উঠলো যতোই জটিল, বেদনা হ'য়ে উঠলো যতোই অসহনীয়, ততই তাঁর অন্তর দিনে দিনে হ'য়ে উঠতে লাগলো অন্তর্মুখী। মহর্ষি জননী তিনি—কায়মনোবাক্যে তাঁকে হ'য়ে উঠতে হবে এই গৌরবময় পদ-মর্যাদার উপযুক্ত। দুঃখের মূল্যে তাঁকে অর্জন করতে হবে অমৃতের অধিকার। মহর্ষিকে তিনি এতদিন পুত্রজ্ঞানেই করেছেন স্নেহ। স্নেহান্ধ নয়নের মণি হ'য়ে ছিলো এতদিন মহর্ষির পার্থিব দেহটাই। এবার ধীরে ধীরে ঘটতে লাগলো তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। মানসিক বেদনার মূলটি অনুসন্ধান করতে গিয়ে মনাতীত অমৃতলোকের দ্বারপ্রান্তে তিনি পৌঁছে গেলেন।

এমনি ক'রে দুঃখে সুখে, আনন্দে বেদনায়, দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার পথে ঘটতে লাগলো মহর্ষি জননীর নিঃশব্দ রূপান্তর। দেহ মনকে অতিক্রম ক'রে এমন একটি সত্ত্বায় তিনি প্রতিষ্ঠিতা হলেন, যেখানে নিঃশেষ আত্মসমর্পণের অনুপম আনন্দটিই কেবল আছে—দেহও নেই, মনও নেই। যন্ত্রের মত উদয়াস্ত পরিশ্রমের ভারে এবার দেহযন্ত্র হ'ল বিকল। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে এলো শেষের আহ্বান। রোগশয্যায় মহর্ষি গ্রহণ করলেন পরিচর্যার সমস্ত ভার। দিনের পর দিন কর্তব্য-নিষ্ঠ স্নেহময় পুত্রের মত মহর্ষি অক্লান্ত সেবায়, অসীম ধৈর্যে পরিশোধ করলেন মাতৃঋণ। মৃত্যুর ছায়া এলো ঘনিয়ে ১৯শে মে তারিখের অপরাহ্ণে। আহার নিদ্রা ত্যাগ ক'রে মহর্ষি রইলেন

নিশ্চল হ'য়ে জননীর মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে। সমবেত আর সকলকে আহারের জন্য পাঠিয়ে দিয়ে মহর্ষি একা রইলেন জননীর কাছে। অনেক রাত্রে প্রতীক্ষিত মৃত্যু এলো।

প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে এই মহাপ্রয়াণের স্বরূপটি জানা যায়। মৃত্যুশয্যা ছেড়ে মহর্ষি যখন উঠলেন, তখন তাঁর কথাবার্তা ব্যবহারে মৃত্যুজনিত শোকচ্ছায়ার এতটুকু আভাস দেখা যায় নি। মৃত্যুকে উপলক্ষ ক'রে শুরু হয়ে গেল সারারাত্রির মহোৎসব। দেহের পিঞ্জরে আবদ্ধ হয়েছিল যে দেহাতীত পরম সত্ত্বা—মরণে হ'ল যেন তারই মুক্তি। মহর্ষি নিজে সকলকে আহ্বান ক'রে নিয়ে আহারে গিয়ে বসলেন। তারপরে সারারাত্রি ব্যাপি সংকীর্তন হ'ল শুরু।

জননীর মৃত্যুর পরে সাংসারিক কর্তব্যের বন্ধন বলতে যেটুকু অবশিষ্ট ছিলো, তারও হ'ল পরিসমাপ্তি। দৃশ্যত পরিবর্তন কিছুই হ'ল না। মহর্ষিকে কেন্দ্র ক'রে বিচিত্র জনসমাগমের যে ধারাটি গোড়া থেকে চলে আসছিলো, এখনো ঠিক তেমনিই চলতে লাগলো। প্রশান্ত সহজ নির্লিপ্ততায় নিজের মধ্যে নিজে রইলেন তিনি অবস্থিত। ধীরে ধীরে তাঁর চারিপাশে গড়ে উঠলো বর্তমান আশ্রমের ভিত্তি। শ্রদ্ধায় নিষ্ঠায় সমাগত ভক্তমণ্ডলির স্বেচ্ছাপ্রণোদিত প্রচেষ্টায় এসে জুটলো গৃহনির্মাণের উপকরণ সম্ভার। দিনে দিনে রূপ পরিগ্রহ করলো আশ্রমের পরিকল্পনা। ভাণ্ডার বলতে বা সঞ্চয় বলতে ছিলো না কিছু। কাল কি হবে, এ চিন্তারও ছিলো না কোন অবসর। একজনের আনীত দ্রব্য বা আহরিত খাদ্য সবাই সমানাধিকারের ভিত্তিতে নিতো ভাগ ক'রে। কেউ বড় নেই, কেউ ছোট নেই। মহর্ষির নিজের বলতে কোনদিনই কিছু ছিল না। তার জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট ক'রে এতটুকু খাদ্য পর্যন্ত আনবার নিয়ম ছিলো না। অর্থ তিনি স্পর্শ করতেন না, প্রয়োজন বলতেও কোনকিছু

তাঁর ছিলো না। নিজের দেহটির পর্যন্ত যাঁর কোনো খেয়াল নেই, তিনি যে আশ্রম ব্যবস্থায় স্বয়ং কোনরূপ সহায়তা করবেন, সে সম্ভাবনাও ছিলো না। অথচ কত দেশবিদেশ থেকে, দিনের পর দিন এসেছে অসংখ্য তীর্থযাত্রী। ক্ষুধিত পেয়েছে অন্ন, তৃষিত পেয়েছে পানীয়। ধনী দরিদ্র, শিক্ষিত অশিক্ষিত, উচ্চ নীচ যে যখন এসেছে সমভাবে হয়েছে অভ্যর্থিত। যা যেদিন জুটেছে সবাই খেয়েছে সমভাবে ভাগ ক'রে। সমারোহ না থাকলেও লোকসমাগমের ছিল না বিরাম। অথচ এ সমস্ত কিছুর মাঝখানে স্বয়ং মহর্ষি থাকতেন আত্ম-সন্তুষ্ট, নির্লিপ্ত, একাকি।

মহর্ষি রমণের জীবনযাত্রার সমসাময়িক আলেখ্য হিসাবে দু-একটি ঘটনার উল্লেখ হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না। একদা গভীর রাত্রে আশ্রমে ঘটলো একদল ডাকাতের আক্রমণ। দরজা জানালা ভেঙে, অধিবাসীদের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার ক'রে, ডাকাতের দল তাণ্ডবলীলা শুরু ক'রে দিল। মহর্ষি তাদের প্রচেষ্টায় দিলেন না কোন বাধা। অথচ দৈহিক বলপ্রয়োগের দ্বারা আক্রমণ প্রতিহত করবার মত সামর্থের বা ইচ্ছার অভাব আশ্রমবাসীদের ছিল না। মহর্ষি বললেন, 'না, তা হয় না। আশ্রমের যা আছে তাতে ওদের অধিকার কারুর চেয়ে কম নয়। ওদের ধর্মে যা হয় তা ওরা অবাধে ক'রে যাক। সে জন্য আমরা আমাদের ধর্ম খোয়াবো কেন ? আমরা কেন বাধা দিয়ে ক্ষমার ধর্ম, সহন করার ধর্ম থেকে বিচ্যুত হব ?' ডাকাতেরা কথাগুলি শুনলো ; প্রতিরোধের আশঙ্কা নেই জেনে বেশ একটু আশ্বস্তও হ'ল। তন্নতন্ন ক'রে চারিদিকে খুঁজেও আশানুরূপ দ্রব্যসম্ভার না মেলায় আশ্রমে অগ্নিসংযোগ করতে উদ্যত হ'ল। মহর্ষি বললেন, 'তার প্রয়োজন কি ? আমরা বরং আশ্রমের বাইরেই চলে যাচ্ছি। তাহলে আর তোমাদের কোন প্রচেষ্টার ব্যাঘাত হবে না।' অতঃপর মহর্ষি আশ্রমপালিত রুগ্ন কুকুরটির প্রাণরক্ষার

জন্য তাকে সযত্নে বাইরে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করলেন। আশ্রম ছেড়ে সবাই বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

দস্যুদল এতেও নিরস্ত হ'ল না। তাদের বিশ্বাস আশ্রমের ধন-সম্ভার নিশ্চয়ই কোথাও লুকানো আছে। নির্দয় ভাবে প্রত্যেকটি আশ্রমবাসীকে করলো প্রহার। স্বয়ং মহর্ষিও বাদ পড়লেন না। বাম পায়ে নিদারুণ ভাবে আঘাত লাভ ক'রে মহর্ষি বলেন, 'ইচ্ছা হয় তো ডান পায়েও তোমরা মারতে পারো।' ভক্ত রামকৃষ্ণস্বামী এবার বিচলিত হ'য়ে উঠলেন। অনেক বুঝিয়ে মহর্ষি তাঁকে নিরস্ত করলেন। এর পরেও দস্যুদল দাবি করলো লণ্ঠন, ঘরের সমস্ত চাবি। মহর্ষি'র আদেশে তাদের সমস্ত দাবিই স্বীকৃত হ'ল। এতেও যখন উদ্ধত অত্যাচার হ'ল না প্রশমিত—রামকৃষ্ণস্বামী আর নিজেকে সম্বরণ করতে পারলেন না। কোথা থেকে একটা লৌহদণ্ড সংগ্রহ ক'রে তিনি পাষণ্ডদলনে অগ্রসর হলেন। কিন্তু এবারেও তাঁকে মহর্ষি'র অনুজ্ঞার কাছে মাথা নত করতে হ'ল। মহর্ষি'র যুক্তি সেই এক: 'আমরা সাধু। স্ব-ধর্ম ত্যাগ করা যে কোন অবস্থাতেই আমাদের শোভা পায় না। ওরা ভ্রান্ত, ওরা অজ্ঞ। যে ধর্ম আমরা জানি তাতে আমাদেরই থাকতে হবে অবিচলিত। দাঁতের কামড় মাঝে মাঝে ঠোঁটে লাগে বলে তো কিছু দাঁতকে ভেঙে ফেলে তার সমুচিত দণ্ড দাও না!' রামকৃষ্ণস্বামী নতমস্তকে নিরুত্তর হ'য়ে বসে পড়লেন। অর্ধরাত্রি পর্যন্ত যথেচ্ছভাবে লুটপাট ক'রে দস্যুদল প্রস্থান করলো।

সকালে এলো পুলিশ। তাদের জিজ্ঞাসার উত্তরে এমন ভাবে মহর্ষি জবাব দিলেন, যেন বলার মত কিছুই ঘটেনি। তিনি নিজে গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন, এ কথাই কেউ জানলো না। এবিষয়ে যে রোষের কিছু আছে, ক্ষোভের কিছু আছে সে কথাও এই দিন বা পরবর্তী কোন দিন তাঁর মুখে কেউ কখনো শোনে নি।

পৃথিবীতে আত্মবস্তু ছাড়া আর কোন কিছুর অস্তিত্বই যাঁর কাছে নেই—এমনি ক'রে বুঝি তাঁকে পরীক্ষা দিতে হয়! সমগ্র অস্তিত্বকে পরিব্যপ্ত ক'রে আছে যাঁর চেতনা—তাঁর কাছে যেমন আপন কেউ নেই, পরও নেই কেউ। অথবা যেখানে যা কিছু আছে—অনন্ত চৈতন্যের বহুবিধ প্রকাশ রূপে নিজের মধ্যেই আছে সে সব কিছু।

রমণাশ্রমের আশ্রমবাসীদের কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। এদের মধ্যে আছেন লক্ষ্মী—আশ্রমধেনু। কমলা আছেন, লীলা আছেন, রোজ আছেন, জ্যাক্ আছেন—এরা সবাই সারমেয় বংশধর। জাত্যাভিমান এদের নেই—কিন্তু আশ্রমিক আভিজাত্য সুস্পষ্ট হ'য়ে আছে এদের ব্যবহারে। মহর্ষি'র স্নেহনীড়ে এদের জন্যও বিশিষ্ট মর্যাদার স্থানটি আছে নির্ধারিত। এরাও যে সে বিষয়ে পূর্ণমাত্রায় অবহিত তার প্রমাণ পাওয়া যায় প্রতিদিনের ঘনিষ্ঠতায়। মহর্ষি'র দৃষ্টিতে এরা কেউ ইতর প্রাণী নয়,—মহাপ্রাণেরই সাময়িক আবাসকেন্দ্র প্রত্যেকটি জীবজন্তু। অনেক বয়সে কমলা যখন মারা গেল, অশ্রুসজল নেত্রে মহর্ষি কোলে নিলেন তার শিশুসন্তানটিকে। আদরিণী লক্ষ্মী মহর্ষি'র সস্নেহ সেবা নিত্যপ্রাপ্য-রূপেই প্রতিদিন পেতে অভ্যস্ত। কুকুরে আর মানুষে বিশেষ যে কোন পার্থক্য মহর্ষি'র কাছে আছে—তা মনে হয় না। সেই যে রুগ্ন কুকুরটি, যার জীবন রক্ষার জন্য আহত অবস্থাতেও মহর্ষি তৎপর হ'য়ে উঠে-ছিলেন—তার নাম কারুপুন্। আশ্রমের নিয়মিত অধিবাসী, জীব-জন্তুগুলি ছাড়াও, প্রতিদিনের আগন্তুকদের মধ্যে আছে বানর। এরাও মহর্ষি'র অন্তরঙ্গ কম নয়। নন্দী ক্ষুধা পেলেই মহর্ষি'র কোলে এসে বসে থাকে। প্রসাদ পাবার জন্য দলবলকে ডেকে এনে হাজির করে। দলগত সংঘর্ষ অনিবার্য হ'য়ে উঠলে প্রায়ই বানরের দল মহর্ষি'র মধ্যস্থতার জন্য আসে। মহর্ষি'র নিজের ধারণা বানরেরা তাঁকে তাদেরই একজন বলে মনে করে। হয়তো বা এটা নিছক রহস্যেরই কথা। কিন্তু সর্বভূতমহেশ্বরের ভাবটি মহর্ষি রমণের জীবনে সর্বাবস্থায়

হ'য়ে আছে মূর্ত, তার ইঙ্গিত এর মধ্যেও আছে। কাঠবিড়ালিরা নিঃসঙ্কোচে মহর্ষি'র কাছে আনাগোনা করে। মহর্ষি যে তাদেরও একান্ত আপন, এ স্বীকৃতি তাদের নিঃশঙ্ক ব্যবহারেও সুস্পষ্ট হ'য়ে ফুটে ওঠে। শিশুগুলি তাঁর মাহাত্ম্যের কোন সংবাদ না রেখেই খেলা ফেলে কাছে এসে প্রহরের পর প্রহর হৃষ্টচিত্তে কোন্ প্রলোভনে থাকে বসে—কে বলবে? এমন কি বনের পাখীরা, কাকেরা পর্যন্ত অসঙ্কোচে মহর্ষি'র হাত থেকে খাদ্য গ্রহণ করতে হ'য়ে উঠেছে অভ্যস্থ। ভীতি বা দ্বিধা তাদের নেই।

এ অঞ্চলে বিষধর সর্পের অভাব নেই। রমণাশ্রমের আশেপাশে এদের আবির্ভাব প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। নিঃশব্দ অতিথির মত যেভাবে এরা যাওয়া আসা করে, তাতে মনে হওয়া বিচিত্র নয় যে মহর্ষি'র অহিংসাবৃত্তির কাছে এরাও নতি স্বীকার ক'রে হ'য়ে উঠেছে অহিংস। বিছার কামড়ে মহর্ষি কিছুমাত্র বেদনাবোধ করেন নি—এমন দৃষ্টান্ত কয়েকবারই ঘটেছে। পরিভ্রমণ কালে একবার মহর্ষি একঝাঁক ভীমরুলের দ্বারা আক্রান্ত হন। তাদের সমস্ত আক্রোশ গিয়ে পড়ে তাঁর একটি পায়ে। নির্বিকার মহর্ষি হাসিমুখে তাঁদের অত্যাচার সহ্য ক'রে বললেন, 'ঠিকই হয়েছে। অপরাধ করেছে আমার এই পা। অন্যমনস্ক ভাবে চলতে চলতে না জেনে আঘাত করেছে ওদের বাসায়। শাস্তি পাওয়াই তো এর উচিত।'

এই বিচিত্র জীবনযাত্রার বিস্ময়কর পটভূমিকায় সহজ মানুষ মহর্ষি রমণকে আমরা দেখি। দীনহীন কৌপীনধারী অতি সাধারণ যে কোন আর একজন সাধুর প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা হতে এমন কোন একটা বিভিন্নতা চোখে পড়ে না যা দিয়ে বিশেষ ভাবে তাঁকে চিহ্নিত ক'রে নেওয়া যায়। আশ্রম পালিত জীবজন্তুগুলির তত্ত্বাবধান, উদ্যানের পরিচর্যা থেকে আরম্ভ ক'রে রন্ধনকার্য, তরকারির খোসা ছাড়ানো পর্যন্ত তিনি নিজের হাতে করতে অভ্যস্থ। চিঠিপত্র পড়া, প্রুফ দেখে

দেওয়ার কাজেও তাঁর অবহেলা নেই। শিষ্য বলতে, বা বিশেষ ভাবে আপন বলতে তাঁর কেউ নেই। যারা আসে সবাই তাঁর আপন অথবা সবাই তাঁর আত্মস্বরূপের আর একটি রূপ। কোন লোককে স্বমতে আনয়ন করবার প্রয়োজন তাঁর নেই। তর্ক যুক্তির প্রয়োগ করা ও মনে চমক লাগাবার কিছুমাত্র আয়োজনও নেই। যারা আসে স্বেচ্ছায় আসে; প্রয়োজন মিটে গেলে নিঃশব্দে চলে যায়। যে কয়দিন থাকে, আতিথ্যের কোন ত্রুটি ঘটে না। মহর্ষির দৈনিক আহার কার্য সম্পন্ন হয় সবাইকার সঙ্গে বসে। কোথাও কোন বাধা নেই, কোনখানে নেই কোন আবরণ। আড়ম্বরও নেই, বিধি-নিষেধের ঘটাও নেই। যারা একাদিক্রমে বহুদিন যাবৎ আশ্রমজীবন অবলম্বন ক'রে মহর্ষির সঙ্গ করছে, তারাও জানে যে এত কাছাকাছি যে মানুষটি তাদের প্রতিদিনের দৃষ্টির সামনে উন্মুক্ত হ'য়ে আছে, অত্যন্ত কাছে থেকেও সে যেন কেমন ক'রে রয়ে গেছে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। যারা আসে যায় তারাও এই বোধটি নিয়ে ফিরে যায় যে, এই দুর্লভ-দর্শন মানুষটির মাঝে এমন একটা কি আছে, যা বুদ্ধি দিয়ে যায় না বোঝা, কোনরূপ অধিত জ্ঞান দিয়ে যায় না জানা। মনে হয় যেন মানুষের যত কিছু ভাবনা, যত কিছু সমস্যা, যত কিছু প্রশ্ন, তার শেষ মীমাংসা এখানে হ'য়ে গেছে। নিজের জন্য মহর্ষির আর চাইবারও নেই কিছু, পাবারও নেই কিছু।

এই প্রসঙ্গে যে কথাটি স্বতঃই মনে জাগে, সেটি হ'ল এই: চাইবারও যাঁর কিছু নেই, পাবারও যাঁর বাকি কিছু নেই—তিনি এতগুলি বৎসর ধরে ওই এক জায়গায় আছেন কি নিয়ে? এই প্রশ্নটির উত্তর ঠিকভাবে পেতে হ'লে মহর্ষির জীবনধারা পর্যবেক্ষণ করতে হয়। অতি অল্প বয়সে সর্বগ্রাসী ঐশী ক্ষুধা নিয়ে সংসার ত্যাগ ক'রে তিনি অরুণাচলে এলেন চলে। বিচারের অবসর ছিলো না—সংসার ভালো কি মন্দ। ওইটুকু বয়সে তথাকথিত বৈরাগ্যেরও যেমন কোন অর্থ ছিলো না,

তেমনি আবার সাংসারিক জীবনযাত্রার প্রতি বিরক্তিরও ছিলো না কেন হেতু। অতএব সংসার-বিবাগীরূপে তাঁকে দেখলে ভুল দেখা হয়। গৃহত্যাগের মূলে ছিল অনুরাগ—আত্মবস্তুর দুর্বার আকর্ষণ। সংসার-পীড়িত মানুষ, যে সংসারের ঘাতপ্রতিঘাত সহ্য করতে না পেরে অতৃপ্ত বাসনার পীড়নে বৈরাগ্যের ছলে পলাতক বৃত্তি অবলম্বন করে, তার সঙ্গে মহর্ষির কোনখানেই কোন মিল নেই। অশান্তিকে পিছনে ফেলে শান্তির সন্ধানে যাত্রা তিনি করেন নি। এড়িয়ে যাবার, পালিয়ে যাবার, মুক্তি পাবার—কোন কথাই ছিলো না। নিজ অন্তরের মধ্যে যে দিক দিয়ে এসেছে আনন্দের ডাক—সংসারের প্রতি অটুট শ্রদ্ধা বজায় রেখেও সেই পথেই করেছেন তিনি প্রয়াণ। কাজেই শেষ পর্যন্ত চিরাচরিত উদাসীনতার মধ্যেও এই ভাবটিই রয়ে গেছে তাঁর মধ্যে প্রবল হ'য়ে। তাই যখনি কেউ সংসার ছেড়ে বৈরাগ্যের পথে যাত্রা করার সঙ্কল্প জানাতে আসে, সম্মতি জানাবার আগে তিনি তার ভিতরটি দেখেন অনুসন্ধান ক'রে, সাবধান ক'রে দেন এই বলে যে কর্মত্যাগ বা লোকালয় বর্জন করলেই শান্তির পথটি ধরা দেবে না। নিরাসক্তি যে নিরানন্দের নামান্তর নয়, এই কথাটাই তিনি বলেছেন। বৈরাগ্যের ছলে কর্মবিমুখতাকে তিনি প্রশ্রয় দেন নি। সেবার পথকে, কর্মের পথকে তিনি ধর্মপথের সোপান হিসাবেই দিয়েছেন মর্যাদা। তিনি বর্জন করতে বলেন নি, বলেছেন জীবনকে অর্জন করতে।

দৃষ্টান্ত হিসাবে জনৈক শিক্ষকের কথাটি এখানে বলা যায়। আধ্যাত্মিকতার লালসা ভদ্রলোকটিকে পেয়ে বসেছিলো। মহর্ষিকে দেখে তিনি সিদ্ধান্ত ক'রে নিলেন যে অনুরূপ অবস্থা তাঁর নিজের পক্ষেও হয়তো বা দুষ্প্রাপ্য নয়। বৈরাগ্যের সাধনায় হলেন নিযুক্ত। সাংসারিক অবস্থা ভালো ছিল না—অতএব বৈরাগ্যের ইন্ধনের অভাব ছিলো না। প্রতিকারহীন অভাবের তাড়নায়, দৈনন্দিন দুর্ভোগের হাত থেকে মুক্তি পাবার পন্থা হিসাবে তাঁর সন্ন্যাসকে মনে হয়েছিল

লোভনীয়। এই আত্মপ্রবঞ্চনা-মূলক, পলায়নপর মনোবৃত্তিকেই তিনি ভাবলেন বৈরাগ্য। ভাবলেন সংসার ত্যাগ ক'রে বেরিয়ে গেলেই যেটুকু বাকি আছে তাও অনায়াসে হ'য়ে যাবে। তবু যাবার আগে কি ভেবে একবার মহর্ষির কাছে গিয়ে জানতে চাইলেন তাঁর অভিমত। মহর্ষি তখন বৃক্ষপত্র গেঁথে গেঁথে আশ্রমের জন্য ভোজন পাত্র নির্মাণে রত ছিলেন। প্রশ্নটি না শুনেই হাসলেন। বললেন, 'এই দেখো, পাতা গেঁথে গেঁথে থালা তৈরি করা কত হাঙ্গামের কাজ। পাতার থালায় লোকের খাওয়া যেই শেষ হবে তখনি এর প্রয়োজনও হবে শেষ। একে ফেলে দিতে হবে জেনেও—উদ্দেশ্যের দিকে চেয়ে কত যত্নে কত অধ্যবসায়ে নির্মাতা এগুলি তৈরি করে। দেহ ধারনেরও তেমনি একটা উদ্দেশ্য আছে। আত্মজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত তাকেও রাখতে হয় যত্ন ক'রে।' মাস্টারমশাই কথাটি বুঝলেন। তাঁর ভ্রম ভাঙলো। অকপটে তাঁর মনের কথা বলে, তিনি ঘরে ফিরে গেলেন।

এমনি ধরনের সাময়িক বৈরাগ্য নিয়ে কত লোকই আসে, আবার ফিরে যায় শান্ত হ'য়ে, সুস্থ হ'য়ে। কিন্তু এই শ্রেণীর লোক ছাড়াও সত্যিকারের মুমুক্ষু অন্তর নিয়ে যাঁরা আসেন, তাঁদের সংখ্যা হয়তো বেশি নয়; তবু তাঁদের বাদ দেওয়া চলে না। নাটেশা মুদালিয়ার এই শ্রেণীর এক সত্যিকারের পিপাসু। ইনিও এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। ছেলেবেলা থেকেই এঁর মনের গতিটা ছিল অসাংসারিক—পরম প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় উন্মুখ। বিবেকানন্দের বইগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে পড়তে পড়তে মনটি উঠেছিল কানায় কানায় ভরে। গুরুলাভের সঙ্কল্প নিয়ে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি মহর্ষির সন্নিধানে এসে হাজির হলেন। কয়েকদিন নিয়মিত ভাবে আশ্রমে যাতায়াত করলেন, কিন্তু মনের কথাটি নিবেদন করবার সুযোগ মিললো না। নিতান্ত হতাশ হ'য়ে গেলেন ফিরে। যেখানে যত সাধু সন্ন্যাসীর খবর পান, একে

একে দর্শন ক'রে আসেন। মন যেন কোথাও ধরা দিতে চায় না। ঘুরে ফিরে মনে আসে মহর্ষি'র ছবিটি। এমন ক'রে আকর্ষণ বিকর্ষণের মধ্য দিয়ে কাটলো দু'টি বছর। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে নাটেশা মহর্ষি'কে লিখলেন একখানি বিস্তারিত লিপি। উত্তর না পেয়ে আবার একখানি চিঠি লিখলেন। তাতে জানালেন—'জন্ম-জন্মান্তর যদি আমাকে ফিরে ফিরে আসতে হয় তাও স্বীকার, আমি আপনার কাছে উপদেশ না নিয়ে ছাড়ছি না। অযোগ্য বোধে যদি এ-জন্মে আমাকে আপনি স্বীকার না করেন, আমার জন্য পুনরায় জন্ম বিড়ম্বনা আপনাকেও সহ্য করতে হবে। আমার এ শপথ মিথ্যা হবে না।' পত্রোত্তর এলো না—কিন্তু এলো অপূর্ব এক স্বপ্নাদেশ। এর সামান্য কয়েকদিন পরেই আশ্রম থেকে লেখা একখানি পত্রে মহর্ষি সন্দর্শনের আহ্বান এলো।

পুলকিত চিত্তে নাটেশা মহর্ষি সন্নিধানে এসে হাজির। আবার দিনের পর দিন আসেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটে নিঃশব্দে, ব্যর্থতার বোঝা ব'য়ে ফিরে চলে যান। বছর খানেক কাটলো এই ভাবে। বহু-আকাঙ্ক্ষিত সুযোগ সহসা একদিন এসে হাজির হ'ল। সাহসে ভর ক'রে নাটেশা একদিন মুখ খুললেন, 'আমি তোমার অনুগ্রহের প্রার্থী। কাকে বলে অনুগ্রহ তাই জানতে চাই।' প্রত্যুত্তরে মহর্ষি বললেন, 'অনুগ্রহ দেওয়াই আছে। তুমি যদি নিতে না পারো আমি কি করতে পারি?' নাটেশা শুনে চলে এলেন। কতকটা বুঝলেন, কতকটা বুঝলেন না। কি এই অনুগ্রহ? মৌনের মাঝে মহর্ষি'র কোন্ অনুগ্রহ-স্বরূপটি আছে বিকশিত হ'য়ে?

উত্তর এলো; পত্রে নয়, স্বপ্নে। মনে হ'ল মহর্ষি'র দয়া তিনি পেয়েছেন; দীক্ষা লাভেও তিনি বঞ্চিত হ'ন নি। কিন্তু তবু যেন পিপাসার শান্তি হ'ল না। অশান্ত প্রাণে পুনরায় গেলেন মহর্ষি'র কাছে ছুটে। সেখানে কয়েকজন ভক্তের মধ্যে আধ্যাত্মিক আলোচনা

চলছিলো। তার কিছু কিছু নাটেশার কানে গেল। মনে হ'ল এ যেন এক বিস্ময়কর অজ্ঞাত জগতের অপরিজ্ঞাত আভাস। যে-সব কথা তিনি জীবনে কখনো শোনেন নি, যেসব সম্ভাবনা তাঁর মনে কখনো উদয় হয় নি—এরা যেন কি আশ্চর্য শক্তিবলে সে সব এমন একান্ত ভাবে নিয়েছে জেনে। নাটেশা বিষণ্ণ চিত্তে ভাবতে লাগলেন, 'কবে আর এই সব আমার জানার সময় হবে? সারা জীবন ধ'রে জমিয়ে তুলেছি কেবল নিরাশার বোঝা! এ জন্মটাই কি যাবে আমার এমনি ক'রে ব্যর্থ হ'য়ে?'

এই বেদনার পরম ক্ষণটিকে মহর্ষি অবহেলা করতে পারলেন না। নাটেশাকে একান্তে ডেকে বললেন, 'কিসের এত দুশ্চিন্তা তোমার? অনুসন্ধানের বস্তুটি রয়েছে হাতের কাছেই। নিত্য সত্য সে বস্তু। যা আছেই, যা চিরন্তন তার জন্য চিন্তার কি আছে? কেমন ক'রে তুমি জানলে যে পাওয়া তোমার হয় নি, প্রার্থিত ধন তোমার করতলগত নয়? আজ যেখানে দ্বিধা আছে, কাল সেখানে আসবে নিশ্চয়তা। নিরাশার হেতু কোথায়? সত্য সত্যই যদি তুমি অযোগ্য হতে, তাহলে এত সাধুসঙ্গের বাসনাই বা তোমার জাগবে কেন?' কথাগুলি শুনে নাটেশার মনে হ'ল যেন তাঁর এতদিনের সমস্ত ব্যথা এক মুহূর্তে গেছে জুড়িয়ে।

এর পরে নাটেশার জীবনে যে পরম পরিণতির স্রোতটি এসে উপনীত হ'ল, তার বিবরণ কোন ইতিহাসের বিষয় নয়। মহর্ষির অনুগ্রহে অবগাহন ক'রে যে রূপান্তর ঘটেছিলো, তাও চোখে দেখার ব্যাপার নয়। কিন্তু নাটেশার নিজের কথায় লিপিবদ্ধ প্রমাণ আছে যে তাঁর পিপাসার শান্তি হয়েছিলো। অনুগ্রহের প্রার্থনা নিয়ে যে শূন্য ভিক্ষাপাত্র হাতে মহর্ষির দ্বারস্থ হয়েছিলেন তা শেষ পর্যন্ত কানায় কানায় ভরে উঠেছিল—এইটুকুই কেবল নিশ্চিত ভাবে জানা যায়।

এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় রমানাথিয়ারের নাম। প্রথম জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনী ও বাণী যত্নসহকারে পাঠ ক'রে এঁরও প্রাণে জেগেছিল অসীমের তৃষ্ণা। ছুটির দিনে রমণাশ্রমে এসে বসে থাকতেন। এইভাবে হ'ল সূত্রপাত। ধীরে ধীরে মন গেল মেতে। রমানাথিয়ারের জীবনে এলো দুকূলপ্লাবী বন্যা—ভাসিয়ে নিয়ে গেল সমাজ-সংস্কারময় অতীত জীবনের ভালোমন্দ সব কিছু। স্ত্রী ও শিশু-সন্তানগুলি সমেত সমস্ত সংসারটিই গেল তাঁর কাছে অর্থহীন হয়ে। দায়িত্বজ্ঞানের যে বন্ধনটি সংসারে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে রেখেছিলো, ধীরে ধীরে গেল সেটি খুলে। রমানাথিয়ার সমস্ত ছেড়ে তপশ্চর্যায় গেলেন ডুবে। রমণাশ্রমে এসে নির্বাক হ'য়ে চুপ ক'রে বসে থাকতেন। কারুর সঙ্গে ছিল না বাক্যালাপ। এমন কি মহর্ষির সঙ্গেও নয়। কোথায় চলে যান, কি করেন, কিছুরই নেই ঠিক। মাঝে মাঝে গৃহে যান, কয়েকদিন কলের পুতুলের মত কাজকর্ম করেন—আবার উধাও হয়ে যান। পরণের কাপড়টি পর্যন্ত কখনো থাকে, কখনো খসে পড়ে যায়। আশ্রমের লোকজন এই উলঙ্গ সন্ন্যাসীকে নিয়ে বিব্রত হ'য়ে পড়লেন। সবাই মিলে ধরে বেঁধে কিছুদিন আশ্রমের একটি ঘরে এঁকে পুরে রেখে দিল। কিন্তু খোলা পেয়েই আবার মুক্ত পুরুষের মত অবাধ জীবনযাত্রা চালাতে লাগলেন। একগলা জলে ডুবে আশ্রম-সন্নিহিত জলাশয়ে ধ্যানস্থ হয়ে সারারাত্রি কাটিয়ে দিতেন। শেষ জীবনে এই আত্মসমাহিত মৌন তপস্বীর কি পরিণতি হ'ল তা জানবার উপায় নেই। কিন্তু যেটুকু জানা গেছে তাতেই বোঝা যায় যে, ইনি নিজের মধ্যে পরমতম সমর্পণের কেন্দ্রটি পেয়েছেন খুঁজে।

মহর্ষি রমণের বিশিষ্ট ভক্তরূপে যে কয়েকজনের নাম বা বিবরণ এখানে দেওয়া সম্ভব হ'ল, বলা বাহুল্য যে তারাই সব নয়। বিগত পঞ্চাশ বৎসর ধরে যে অগণিত তীর্থযাত্রী অরুণাচল পর্বতের জাগ্রত

দেবতার দর্শন মানসে এসে উপস্থিত হয়েছেন, তাদের কতটুকু পরিচয়ই বা আমরা জানি! তা ছাড়া প্রত্যেক মানুষের প্রাপ্তির পথটি নিজস্ব স্বকীয়তায় এমনি রহস্যাবৃত যে বাইরের দৃষ্টি দিয়ে এর কোন হিসাবই পাওয়া যায় না। বিরাট পুরুষ যোগী রামীয়া সমাধি লাভান্তে, শেষ সন্দেহ মোচনের অভিপ্রায়ে নিলেন মহর্ষি'র শরণ। অখণ্ড চৈতন্যের মাঝে যখন তাঁর উপলব্ধির সীমানায় দ্রষ্টা এবং দৃশ্য মিলিয়ে একাকার হয়ে গেল—আত্মজিজ্ঞাসার চরমতম সমস্যাটি তখন তাঁর মনে জাগালো প্রশ্ন। মীমাংসার জন্য পণ্ডিতদের কাছে অনেক ঘোরাঘুরি করলেন, কিন্তু মনের মত উত্তরটি পেলেন না কারো কাছে। তাঁরা বললেন, 'এ আবার কেমন কথা? সাধারণ বুদ্ধিতেই তো বোঝা যায় যে, দ্রষ্টা আর দৃশ্য পৃথক বস্তু। তারা আবার এক হয়ে যায়—এ কোন পাগলের কথা!' যোগী রামীয়া নিজের উপলব্ধির সত্যকে অকম্পিত দীপশিখার মত ক'রে নিজের অন্তরে আচ্ছাদন ক'রে সত্যদ্রষ্টার সন্ধানে মহর্ষি'র কাছে এলেন। মহর্ষি বললেন, 'তোমার ভুল হয় নি। সাধারণ দৃষ্টিতে দ্রষ্টা আর দৃশ্য বিভিন্ন ভাবেই প্রতীয়মান হয়। যোগদৃষ্টিতে, ভাবঘন চৈতন্য-সত্তায় অবস্থিতিকালে, সমস্ত পার্থক্য মুছে গিয়ে সব একাকার হ'য়ে যায়।' এই একটি কথায় দুজন দুজনকে নিলেন চিনে। দেয় যা ছিল দিলেন মহর্ষি, প্রাপ্য যা ছিল পেলেন যোগী রামীয়া।

আরও একজন পরম তপস্বী সারাজীবনের অক্লান্ত তপশ্চর্যার প্রচুর ঐশ্বর্যভার নিয়ে, জীবন সায়াহ্নে এসে উপনীত হ'লেন মহর্ষি'র দ্বারে। এঁর নাম শুদ্ধানন্দ ভারতী। তামিল সাহিত্যে অসাধারণ দান এঁর। সাংবাদিক মহলে ও শিক্ষাপ্রচারের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠাও ছিল এঁর অসাধারণ। জ্ঞানে কর্মে অমিত পরাক্রান্ত এই বিরাট মানুষটি ছিলেন শক্তির আধার। এমন ধর্মমত নেই যার পরিপূর্ণ অনুশীলন ইনি করেন নি। তপস্যার ফলও ইনি লাভ করেছিলেন

পরিপূর্ণ মাত্রায়। হয়তো বা শেষটুকুই ছিল বাকি। জীবনের গোধূলি লগ্নে তারই দাবি নিয়ে এলেন ইনি মহর্ষির কাছে। জিজ্ঞাসার কিছু ছিল না। মহর্ষি অতি সমাদরে এঁকে গ্রহণ করলেন। মহর্ষির সংস্পর্শে এসে হয়তো বা এঁর মনের শেষ আবরণটুকুও গেল বিনষ্ট হ'য়ে। এর পরে শুদ্ধানন্দ ভারতী নামে যে মানুষটিকে আমরা দেখি—সে যেন এক নূতন মানুষ। অহং জ্ঞানকে অতিক্রম ক'রে এতদূরেই তিনি চলে গেছেন যে কথায় বা কাজে—নিজেকে 'আমি' বলে অভিহিত করতেও তিনি কুণ্ঠিত হতেন।

মহর্ষি রমণের জীবনকাহিনী বিবৃত করতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে যে সমস্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ মানুষের বিবরণ উদ্ধৃত করা হ'ল, তাদের অধিকাংশের পরিচয় একমাত্র মহর্ষিরই পরিচায়ক। মহর্ষি এদের জীবনে কোন না কোন উপলক্ষে এসে উদয় হয়েছেন বলেই তাঁর জীবন কাহিনীতে এরা গেছে এমন ভাবে জড়িয়ে। এদের কথা বাদ দিলে মহর্ষির সম্বন্ধে বলারই যেমন বিশেষ কিছু থাকে না, তেমনি আবার মহর্ষির কথা বাদ দিলে এদের সম্বন্ধেও থাকে না বলার মত কোন কথা। অলৌকিক ঘটনা বলতে যা আমরা সাধারণতঃ বুঝি, মহর্ষির জীবনে তার দৃষ্টান্ত নেই—অথচ মানুষ সচরাচর সাধু-সন্ন্যাসীর কাছে যা চায় তা প্রধানত এই বস্তুই। এদিক দিয়ে, মহর্ষির জীবনে, এক হিসাবে, আকর্ষণের কিছুই নেই। মানুষের ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানকে অবলম্বন ক'রে নেই কোনরূপ শক্তির খেলা। মহর্ষি যে ইচ্ছা ক'রে কোনদিন কারো রোগ সারিয়েছেন কি অভীষ্ট পূরণে সহায়তা করেছেন, এমনতর কৃতিত্বেরও নেই কোন নিদর্শণ। তবু এই অনাড়ম্বর অনাসক্ত জীবনটির চারিপাশে কি যেন এক অলৌকিক সম্মোহনের মধুচক্র উঠেছে গড়ে, যার মাধুর্যরসে জড়িয়ে গেছে এতগুলি বিভিন্নধর্মী মানুষ। গড়ে উঠেছে এক মহামুক্তির সমন্বয়-তীর্থ, যেখানে না আছে সংস্কার,

না আছে তথাকথিত ধর্মমতের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ; ব্রাহ্মণে চণ্ডালে, বিদ্বানে মূর্খে, জ্ঞানে অজ্ঞানে মিলে মিশে গেছে একাকার হ'য়ে।

এই হ'ল মহর্ষি রমণ, যাঁর মধ্যে ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য লাভ করেছে নবজীবন—চিরদিনের তপোবন হ'য়ে উঠেছে রূপায়িত। সৌরজগতের কেন্দ্রস্থলে এ যেন সেই চিরন্তন সূর্যেরই অভ্যুদয়। প্রতি-দিবসের পটভূমিকায় এই অলৌকিক আবির্ভাবটিকে বিস্ময়কর বলে হয়তো বা মনে হয় না ; কিন্তু চোখ মেলে যারা দেখে তারা বলে অন্য কথা। অনন্ত আকাশের আলো এসে পড়ে কত দূর থেকে কোথাকার এক নিভৃত প্রান্তরের এক ফালি শ্যামলতার বুকে। অমনি জেগে ওঠে ঊর্ধ্বলোকে মুখ তুলে নামহীন গোত্রহীন বনফুল। কলরব ক'রে সাড়া দেয় পাখির দল। দৃষ্টির দ্বার যায় খুলে। সৃষ্টির অন্তরে লাগে দোলা। চোখ মুদে যারা থাকে অথবা যারা জন্মান্ধ তারা এ সমারোহের অর্থ খুঁজে পায় না। কেবল যারা চক্ষুষ্মান তারাই দিকে দিগন্তে বিস্মিত, মুগ্ধ, পরিতৃপ্ত দৃষ্টি মেলে আকর্ষণ ক'রে নেয় এই প্রাণময় আলোকের অমৃতধারা। নিঃশব্দে ভরে যায় তাদের অন্তরের মধুকোষ।

হাম্‌ফ্রিসের পরিচয় ইতিপূর্বে আমরা পেয়েছি। ভারতবর্ষের বাইরে মহর্ষির সৌরভ তিনিই এনেছিলেন বহন ক'রে। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ছোট একখানি সুমুদ্রিত পুস্তিকায় হাম্‌ফ্রিসের সংগৃহীত বিবরণ হয়েছিল প্রকাশিত। দেশান্তরের মানব সমাজের কাছে মহর্ষি রমণকে চেনার মত ক'রে চিনিয়ে দেবার মত সুপ্রচুর উপকরণ তার মধ্যে হয়তো ছিলো না ; কিন্তু যেটুকু ছিল—ইঙ্গিত হিসাবে তার মূল্য বড় কম নয়। মৌমাছির পায়ে পরাগ-রেণু যতটুকু ধরে, প্রাণ প্রতিষ্ঠার পক্ষে ততটুকুই হ'য়ে ওঠে যথেষ্ট। অথচ প্রাণসংক্রামনের এই রহস্য কোন মৌমাছিরই জানবার কথা নয়। অমৃতের তৃষ্ণা যাকে পেয়ে বসে সে বুঝি নিজেরই অজ্ঞাতসারে এমনি ভাবে জড়িয়ে

পড়ে সৃষ্টিধারার নিগূঢ় ষড়যন্ত্রে। নইলে এ পারম্পর্যগুলিই বা ঘটে কোন হিসাবে? হাম্‌ফ্রিসের বান্ধবী, যাঁর পরিচয় কিছুই নেই জানা, তিনি যে কিসের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে মহর্ষি'র পরিচয়টি ছাপার অক্ষরে লোকসমাজে প্রচার করলেন, এও এক রহস্য। অকিঞ্চিৎকর এই ইঙ্গিতটুকুকেই অবলম্বন ক'রে ক্লান্ত রজনীর বহু পথহারা পর্যটক অরুণাচলের আলোক-তীর্থে এসে আত্মস্বরূপের নির্ভয় লোকে পেয়েছেন আশ্রয়।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হ'ল রমণাশ্রমের উদ্‌যোগে মহর্ষি'র প্রথম জীবন কাহিনী। নরসিংহ স্বামী রচিত এই জীবনীটি আয়তনে স্বল্প হ'লেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ; কারণ এই প্রথম লোকসমক্ষে প্রচারিত হ'ল এই মহামৌনীর জীবনবেদ। এই বইখানিরই একখণ্ড গিয়ে পড়লো, প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, সমালোচনার জন্য পল্ ব্রাণ্টনের হাতে। সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও সমালোচক হিসাবে পল্ ব্রাণ্টনের খ্যাতি ছিল। মনস্তত্ব, যাদুবিদ্যা, প্রেততত্ব ইত্যাদি নানারকমের ব্যাপারে তাঁর অনুসন্ধিৎসা ছিল প্রবল। পর্যটক হিসাবেও খুব নগন্য তিনি ছিলেন না। আধ্যাত্মিক ভারতবর্ষকে তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে দেখবার অভিপ্রায়ে ইতিপূর্বেই তিনি এদেশে একবার এসে-ছিলেন। মহর্ষি-সাক্ষাৎকারের স্মৃতিটি ছিল মনের মধ্যে উজ্জ্বল হ'য়ে। তাই গ্রন্থ সমালোচনা সূত্রে, উচ্ছ্বসিত ভাষায়, মহর্ষি প্রসঙ্গে তিনি লিখলেন—'প্রাচ্যে বা পাশ্চাত্যে যদি কোনদিন কেউ নির্বাণের শীর্ষে আরোহণ ক'রে থাকেন, নিজের অভিজ্ঞতার নিঃসন্দিগ্ধতা থেকে আমি জোর গলায় বলতে পারি যে মহর্ষি রমণ তাঁদের অন্যতম।'

ডক্টর পল্ ব্রাণ্টনের নিজের লেখা বিবরণ থেকে মহর্ষি'র সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের যে কাহিনী পাওয়া যায়, সেটি নানা দিক দিয়ে কৌতূহলোদ্দীপক। রচনা হিসাবে সেটি যে সার্থক সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তা ছাড়া বিদেশীর চোখে মহর্ষি'র যে রূপটি উদার সার্ব-

জনীনতায় ভাস্বর হ'য়ে উঠেছে, সেটিও উপভোগ্য বড় কম নয়। সেই-জন্যই কাহিনীটি আগাগোড়া সংক্ষেপে তুলে দিলে ভাল হয়।

ডক্টর পল্ ব্রাণ্টনের ভারতবর্ষে আসার মূলে ছিল আশৈশব সঞ্চিত স্বতস্ফূর্ত প্রেরণা। জন্মান্তরের সংস্কারের মত কি যেন একটা দুর্বোধ্য আকর্ষণ ছিল তাঁর মনে। ভারতের নদী গিরি বন, দুর্ভেদ্য চিরতুষারময় নির্জনতা, দিগন্ত বিস্তৃত শৈলমালা, যুগযুগান্তের রহস্যাবৃত বনভূমি, দেবভাষার ধ্বনি, বেদমন্ত্রের অপরূপ ঝঙ্কার, প্রাচীন সভ্যতার সুমহান ঐতিহ্য—এই সমস্তগুলি মিলে তাঁর মনে গড়ে উঠেছিল এক অদৃষ্টপূর্ব স্বপ্নময় পরিমণ্ডল। ভারতবর্ষের কোন কিছু না জেনেই কেমন ক'রে যেন তাঁর মনের মধ্যে ধারণাটি হ'য়ে উঠেছিল বদ্ধমূল যে ইউরোপীয় পর্যটকদের প্রত্যক্ষ বর্ণনায় ভারতের যে রূপটি চোখে পড়ে তার আড়ালে রয়ে গেছে আর একটি নিভৃত ভারতবর্ষ যাকে চোখে যায় না দেখা, কানে যায় না শোনা। সেই অপ্রত্যক্ষ দেবভূমি যুগযুগান্তর ধরে প্রবহমান কালস্রোতের গ্রাস হ'তে সযত্নে রক্ষা ক'রে আসছে ভারতের নিজস্ব অধ্যাত্ম ঐশ্বর্য—যার হ্রাস নেই, নেই কোন বিবর্তন। মানচিত্রের ত্রিকোণাকার স্থলভাগটির পানে চেয়ে কত বিস্ময়কর অভিযানের রোমাঞ্চকর আবিষ্কারের স্বপ্নই যে তিনি দেখতেন তার সীমা সংখ্যা নেই। ভূগোলের খোলা পাতাগুলি দেখতে দেখতে হ'য়ে যেতো অস্পষ্ট; আর সেই ঝাপ্‌সা কুয়াশায় তিনি দেখতেন, গিরি-গুহা, পর্বতচূড়া—অরণ্যানীর অপরূপ রেখাচিত্র। তাঁর মনে হ'ত সন্ধানী দৃষ্টির অপেক্ষায় এই অলক্ষ্য মায়াপুরী যেমন তাঁর পথ চেয়ে আছে তেমনি আছেন যত তেজঃপুঞ্জ-কলেবর মুণি, ঋষি, যোগী সন্ন্যাসী। মনে হ'ত, এই তপস্যাভূমির আসল রূপটি যারা দেখেনি—তারাই কেবল দুর্ভোগের বোঝা ব'য়ে, খালি দুটো চোখ দিয়ে, মহাদেশটিকে দেখে বেড়িয়েছে, আর শেষ পর্যন্ত অসার ভ্রমণকাহিনী লিখে পূর্ণ করেছে তাদের বিড়ম্বনা। সত্য ভারতবর্ষ—

জীবন্ত ভারতবর্ষ গবেষণার বস্তু নয়, উপলব্ধির বস্তু। তাকে দেখতে হয় অন্তর দিয়ে, বুঝতে হয় অনুভূতি দিয়ে, জানতে হয় প্রাণ দিয়ে। পল্ ব্রাণ্টন্‌কে পেয়ে বসলো এই বিচিত্র উন্মাদনা। তারুণ্যের পরিপূর্ণ উৎসাহে অভিযানের পরিকল্পনাটি উঠলো গড়ে; আশানুরূপ পরিসমাপ্তি যে ঘটলো না সেটাও হয়তো বা তারুণ্যেরই বিড়ম্বনা।

মতলবটা ছিল খুবই সোজা। চলার জন্য দু'খানি পা যখন আছেই, তখন এশিয়া মাইনর হ'য়ে, আরব দেশ হ'য়ে এডেন বন্দরে উপনীত হওয়াটা আর কঠিন কি? পথ খরচের জন্য সামান্য কিছু টাকা; সেও একরকম ক'রে যোগাড় হ'য়ে গেল। একা একা ঠিক জমে না বলে সহপাঠি আর এক কল্পনাবিলাসী বন্ধুকেও নিয়েছিলেন যোগাড় ক'রে। তারপর—এডেন্ বন্দরে একবার পৌঁছে গেলে অসুবিধা আর রইলো কি? সেখান থেকে যেসব জাহাজ ভারতবর্ষে নিত্য যাতায়াত করে, তাদেরই একজন সদয়হৃদয় কাপ্তেনকে কি আর রাজী করা কঠিন হবে? এরপরে ভারতবর্ষ আর কতদূরের পথ? বড় জোর সাতটি দিন লাগবে সেখানে পৌঁছাতে। সবই ঠিক ছিলো কিন্তু ভাগ্য ছিলেন বিরূপ। বাস্তবতা এলো রুদ্র মূর্তিতে সঙ্গি বালকটির অবুঝ অভিভাবকের রূপে। ব্যবস্থাটি গেল ভেস্তে। এডেন্ বন্দরের সহৃদয় কাপ্তেনগুলি পূর্বের মতই জাহাজ ভাসিয়ে এপার ওপার করতে লাগলো। কিন্তু পল্ ব্রাণ্টনের ভারতাভিযান অনির্দিষ্ট-কালের জন্য স্থগিত রইলো। নিঃশব্দে বাড়তে লাগলো তাঁর বয়স।

সঙ্কল্প যদি মূর্ত হ'য়ে ওঠে তাকে শেষ পর্যন্ত ঠেকানো যায় না। তারই ফলে তাঁর জীবনে এসে আবির্ভূত হ'লেন লণ্ডনপ্রবাসী এক বৃদ্ধ হিন্দু ব্রাহ্মণ। পুরানো বইয়ের দোকানে ঘুরতে ঘুরতে এই লোকটিকে হঠাৎ পেয়ে গেলেন পল্ ব্রাণ্টন্। দিনের পর দিন স্নেহে সাহচর্যে বন্ধনটি হ'য়ে উঠলো গাঢ় আত্মীয়তায় পরিণত। পল্ ব্রাণ্টনের যে মনটি নিভৃতে ভারতের বাণীর জন্য ছিল উৎকর্ণ হ'য়ে,

অনেক দিনের তৃষ্ণার বারি পেয়ে সেও হ'ল পরিতৃপ্ত ; সুপ্ত আগ্রহটি নূতন ক'রে উঠলো জেগে। শেষ পর্যন্ত ঐকান্তিক চাওয়ার বিনিময়ে একদিন কেমন ক'রে বহুপ্রার্থিত সুযোগটি এসে হাজির হ'ল—সে অনেক কথা। সমস্ত কথা বলতে গেলে পল্ ব্রাণ্টনের গোটা জীবনীটাই এখানে তুলে দিতে হয়। সেটা সম্ভব নয় বলেই, অরুণাচলের পথে কেমন ক'রে তাঁর জীবনের পথটি সংযুক্ত হ'ল—সেই মূল কথাটাই কেবল এখানে বলা চলে। ভূমিকা স্বরূপ এই-টুকুই শুধু উল্লেখ করা যায় যে, ঘটনার পারম্পর্যে এই মিলনটি যতোই স্বাভাবিক বলে মনে হোক না কেন—এ পরিণতিটি সহজ ভাবে ঘটা সম্ভব ছিলো না। বিভিন্ন জগতের ও বিপরীত শতাব্দীর দু'টি মানুষের পক্ষে সাত সমুদ্র তেরো নদীর ব্যবধান পেরিয়ে কাছাকাছি আসাটা ভাগ্যচক্রে অনিবার্য হ'লেও আয়াস-সাধ্য না হ'য়ে পারে নি। পল্ ব্রাণ্টনের দিক থেকে যে আয়াসের ত্রুটি ছিল না—পর্যটনের অধ্যবসায়ে তার প্রমাণ আছে। যোগাযোগের সূত্রটি পর্যবেক্ষণ করলে সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে অনুকম্পার হাতখানি, হয়তো বা নিজের অজ্ঞাতসারেই, আগন্তুক বিদেশীর পথ-নির্দেশের ছলে মহর্ষিও দিয়েছিলেন প্রসারিত ক'রে। নইলে, হয়তো বা এমনটি নাও ঘটতে পারতো।

প্রথম দর্শনে মহর্ষির চিত্রটি পল্ ব্রাণ্টনের দৃষ্টিতে যেভাবে প্রতিভাত হয়েছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর নিজের লেখা বর্ণনায়। 'মুহূর্তের দৃষ্টিপাতেই মনে হ'ল—ইনি যে মহর্ষি তাতে সন্দেহ নেই। শয্যাবেদীর উপরে ঋজুভাবে উপবিষ্ট মূর্তিটির পরনে কৌপীন ছাড়া আর কিছু নেই। গাত্রবর্ণ তাম্রাভ, কিন্তু দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী হিসাবে ফর্সাই বলা চলে। দীর্ঘদেহ, বয়স মনে হয় পঞ্চাশের কাছাকাছি। সুডৌল উত্তমাঙ্গের চুলগুলি ছোট ক'রে কাটা। উন্নত ও বিস্তৃত ললাটে মনীষার সুস্পষ্ট ছাপ। আকৃতির

মধ্যে প্রাচ্যের চেয়ে পাশ্চাত্যের আভাসটিই যেন প্রধানতঃ চোখে পড়ে। দৃষ্টি গভীর। চোখ দু'টি বাদামী, আয়তনে মাঝামাঝি এবং বিস্ফারিত। দেহ পাথরের মূর্তির মত স্থির; চাঞ্চল্যের আভাস মাত্র নেই। আমাকে লক্ষ্য করেছেন কি না, চোখের দিকে তাকিয়ে সে কথা অনুমান করবার উপায় ছিল না। সে দৃষ্টি যেন কোন সুদূরপ্রসারী শূন্যে গিয়ে মিলিয়ে গেছে: এতদূর যে, তাকে অসীমই বলা চলে। অনেকদিন ধরে আমার ধারণা ছিল যে মানুষের চোখ দেখে তার আত্মার পরিচয় জানা যায়। সে ধারণা ওলোট-পালোট হ'য়ে গেল মহর্ষির চোখের সম্মুখে এসে।

'প্রথমটা, ইউরোপীয়-সুলভ মনোবৃত্তি থেকে, এই কথাটাই আমার ক্ষণিকের জন্য মনে এসেছিল যে ভক্তদের সমক্ষে আসর জমাবার কায়দাই বুঝি লোকটির এই! আমার মন যেন কথাটাকে আমলই দিল না। পরক্ষণে মনে হ'ল, 'সমাধির তন্ময়তা কি শূন্য-গর্ভ?' নিজের কাছে এ প্রশ্নের উত্তর মিললো না। চুম্বক যেমন ক'রে লৌহ-কণাকে টেনে রাখে, তেমনি ক'রেই মানুষটি মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে রেখেছে আমার সমগ্র চেতনাকে। কি এমন আছে এর মধ্যে যে চোখ ফেরাতে পারি না? প্রাথমিক বিস্ময়টা কেটে গিয়ে তার স্থানে এলো বিমুগ্ধ বিহ্বলতা। বহুক্ষণ পরে মনে হ'ল যেন নিঃশব্দ-প্রবাহে সেখানে চলেছে একটা পরিবর্তনের স্রোত। পথে আসতে আসতে যে প্রশ্নতালিকা তৈরি ক'রে রেখেছিলাম—একটি একটি ক'রে তারা মিলিয়ে গেল। মনে হ'ল সেগুলির উত্তর পেলেও যা, না পেলেও তাই। সমস্যাগুলির সমাধানে অসমাধানে আর আমার কিছুই ক্ষতি বৃদ্ধি নেই। অনুভব করলাম যেন আমার পাশ দিয়ে নিরবচ্ছিন্ন শান্তির নির্ঝর চলেছে ব'য়ে। আমার সত্তার নিভৃত কেন্দ্রগুলি শান্তিতে কানায় কানায় গেছে ভরে। চিন্তা-জর্জরিত মস্তিষ্কের কোষগুলি যেন এক অনির্বচনীয় প্রশান্তির স্পর্শ পেয়েছে। বহুদিনের

অভ্যস্ত প্রশ্নগুলি হ'য়ে উঠলো নগন্যতায় অর্থহীন। পিছনে ফেলে আসা জীবনটি অকস্মাৎ হ'য়ে গেল নিরর্থক। সহসা যেন বুঝে নিলাম কি ভাবে বুদ্ধি সমস্যার বোঝা তৈরি ক'রে নিজের জালে নিজে জড়ায়, সমাধানের ছলে সৃষ্টি করে নূতনতর দুঃখের জাল।

'নূতন ক'রে আর একবার মনে হ'ল—এই বুঝি তবে আধ্যাত্মিক সৌরভ। ফুলের পাপড়িগুলি থেকে যেমন ক'রে সৌরভ পড়ে ছড়িয়ে, তেমনি ক'রেই বুঝি মহর্ষির চারিপাশে জড়িয়ে থাকে এই সুরভি। বিস্মিত হ'য়ে ভাবতে লাগলাম—এ বস্তুর ধর্মই বুঝি এই যে, দাতা ও গ্রহীতা উভয়েরই অজ্ঞাতসারে অলৌকিক প্রভাবটি যায় বিস্তৃত হ'য়ে। বোধ হ'ল যেন সম্মুখে আমার দিগন্তবিস্তৃত অমৃতসিন্ধুর স্রোতে লেগেছে সুবাতাসের দোলা। পিছনেও গেছে নোঙরের বাঁধন শিথিল হ'য়ে।'

প্রথম দর্শনের এই পটভূমিকায়, প্রথম দিনের আলাপটি কৌতূহলোদ্দীপক। একে জানে না অন্যের ভাষা, অথচ জিজ্ঞাসাও আছে, উত্তরও চাই।

মহর্ষি তখন হাতে লেখা একখানি বাঁধানো বইয়ে অত্যন্ত ধীরে ধীরে কি যেন লিখছিলেন। লেখা থামিয়ে, জনৈক ভক্ত মারফৎ, পল্ ব্রাণ্টনের আহারাদির সুবিধা হয়েছে কি না জানতে চাইলেন। উত্তর দিলেন পল্ ব্রাণ্টন। সঙ্গে সঙ্গে এক নিশ্বাসে ঝড়ের বেগে বলে গেলেন তাঁর নিজের যাবতীয় কথা—সারাজীবন ধরে যা চেয়েছেন, যা পেয়েছেন, যা করেছেন, যা ভেবেছেন সব কিছু। অভাব, অভিযোগ, অশান্তি, অপূর্ণতার সমস্যাগুলির সমষ্টি দিলেন একসঙ্গে নিবেদন ক'রে। বললেন, 'শেষ প্রশ্নের মীমাংসা আমার মেলে নি। অভিজ্ঞতায় যার প্রমাণ পাওয়া যায় না, তা বিশ্বাস করতে আমার বাধে। ধার্মিক বলতে যা বোঝায় তা আমি নই। মানুষের বাস্তবজীবনের বাইরে যদি কোন সত্ত্বার অস্তিত্ব থাকে, তাকে আমি কোন্ উপায়ে করবো

উপলব্ধি ? পাশ্চাত্যের জ্ঞানে এ প্রশ্নের উত্তর নেই। আমি জানতে চাই—কোথাও কি এর উত্তর নেই ?' প্রশ্নটি শেষ হবার পরে অনেকক্ষণ পর্যন্ত বিরাজ করতে লাগলো অখণ্ড নীরবতা। মহর্ষির দৃষ্টিতে পলক নেই। উৎকর্ণ হ'য়ে আছেন পল্ ব্রাণ্টন।

প্রায় দশমিনিট পরে প্রতীক্ষিত উত্তর এলো। মহর্ষি বললেন, 'তুমি বললে, 'আমি জানতে চাই।' আমায় বলো দেখি—কে এই 'আমি' যে জানতে চায়।'

এ ধরনের প্রশ্নের জন্য পল্ ব্রাণ্টন প্রস্তুত ছিলেন না। 'কে এই আমি ?' সে আবার কি কথা ! উত্তর তো সামনেই হাজির। নূতন ক'রে বলার আছে কি ! তাঁর বিমূঢ় ভাবটি লক্ষ্য ক'রে মহর্ষি আবার বললেন, 'ভেবে দেখো আমিটা কে ?' পল্ ব্রাণ্টন অঙ্গুলি নির্দেশে নিজেকে দেখিয়ে দিলেন, নিজের নামটিও আবৃত্তি করলেন। স্মিতহাস্যে মহর্ষি বললেন, 'ও তো তোমার দেহ মাত্র। তুমি কোথায় ?' পল্ ব্রাণ্টন নিরুত্তরে ভাবতে লাগলেন। মহর্ষি বললেন, 'আমি কে' জানলেই সব জানা হ'য়ে যাবে। করণীয় বলতে আছে এই একটিই। ঠিক ভাবে তাকাও নিজের মধ্যে—সর্ব সমস্যার পাবে সমাধান।'

পল্ ব্রাণ্টন বললেন, 'সত্যানুসন্ধানের প্রচেষ্টা আমি কম করিনি—কিন্তু কিছু লাভ হয়েছে বলে মনে হয় না। ঠিক ভাবে চলবো কোন পন্থায়, বলে দিন।'

মহর্ষি বললেন, 'আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে উন্নতির লক্ষণ সহজে চোখে পড়ে না। লাভ যে হয়নি তুমি জানলে কেমন ক'রে ? আত্মস্বরূপের প্রশ্নটি মনের মধ্যে রাখো জাগিয়ে। আলোক আসবেই।'

পল্ ব্রাণ্টন জিজ্ঞাসা করলেন, 'গুরু কতখানি সাহায্য করতে পারেন এই চলার পথে ?' উত্তর এলো, 'অনুসন্ধানের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তা তিনি দিতে পারেন।' আবার প্রশ্ন হ'ল, 'কতদিন লাগে এই আলোক পেতে ?' মহর্ষি উত্তর দিলেন, 'সেটা নির্ভর

করে অনুসন্ধানকারীর প্রস্তুতির উপর বারুদ জ্বলে এক নিমেষে, কিন্তু কয়লা জ্বলতে সময় লাগে।'

পল্ ব্রাণ্টনের মনে বহু প্রশ্নই ছিলো জমা হ'য়ে। এ সুযোগ তিনি ছাড়তে পারলেন না। জিজ্ঞাসা করলেন, 'দারুণ দুঃসময়ের সন্ধিক্ষণের মধ্যে রয়েছে বর্তমান সভ্য জগৎ। জগতের ভবিষ্যৎ কি—তারই ইঙ্গিত চাই।' মহর্ষি বললেন, 'ভবিষ্যৎ নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন কি তোমার? বর্তমানেরই বা কতটুকু জানো! ভবিষ্যতের ভার ছেড়ে দাও ভবিষ্যতের হাতে। বর্তমানই তো যথেষ্ট।' পল্ ব্রাণ্টন এতেই ক্ষান্ত হবার পাত্র নন। সভ্য-যুগের জীবন-সংগ্রামের স্বরূপটি অরণ্য-আশ্রমের অধিবাসীরা ভালো ক'রে জানেন না বলেই, তাঁরা না হয় নিশ্চিন্ত হ'য়ে আছেন। কিন্তু পল্ ব্রাণ্টন, যিনি এই হিংস্র বর্বরতাকে, সভ্যতার সঙ্কটময় রণক্ষেত্রকে স্বচক্ষে দেখেছেন—বর্তমানকে নিয়ে তিনি সন্তুষ্ট থাকেন কি করে! আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার কি মনে হয় পৃথিবীতে এবার শুভ ও মৈত্রীভাবের হবে বিস্তার, না উত্তরোত্তর যুদ্ধ ও বিশৃঙ্খলাই চলবে বেড়ে?' প্রশ্নটি মহর্ষির প্রীতিকর হ'ল না। তিনি বললেন, 'একজন আছেন যিনি বিশ্বের নিয়ন্তা। তিনিই আছেন তাঁর সৃষ্টির ভার বহন করবার জন্য। প্রাণের যিনি স্রষ্টা—প্রাণকে রক্ষা করতেও তিনি জানেন। বিশ্বের দায়িত্ব তাঁর—তোমার নয়।'

পাশ্চাত্য চিন্তার দায়িত্ব-জ্ঞান তখনো পল্ ব্রাণ্টনকে ছাড়ে নি। মহর্ষির উক্তিতে তাঁর চিরাচরিত দৃষ্টিভঙ্গীটি আর একবার স্বমত-প্রতিষ্ঠায় মুখর হ'য়ে উঠলো। তিনি মন্তব্য করলেন, 'কিন্তু কোথায়? খোলা চোখে চারিদিকে তাকিয়ে দেখলে নির্ভর সান্ত্বনার যুক্তি মেলে কই?' নিরস কণ্ঠে মহর্ষি এই মন্তব্যের উত্তরে বললেন, 'যেমন তুমি, তেমনি তোমার জগৎ। নিজেকেই যে বুঝতে পারলো না—সে আবার যায় জগৎকে বুঝে নিতে। সত্যসন্ধানী যে তার কেন এ

প্রশ্ন! লোকে অযথা শক্তিক্ষয় করে এই সব অর্থহীন জিজ্ঞাসায়। প্রথমে আবিষ্কার করো সত্যের পটভূমিকা নিজের মধ্যে, তার পরে জগতের পটভূমিকায় সত্যের খোঁজ করো। কারণ, তুমি জগতেরই একটি অংশ ছাড়া আর কিছু নও। স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব তোমার নেই।'

প্রথম দিনের পরিচয়ের শুরু এবং শেষ হ'ল এইখানেই। এর পরে যে কয়দিন পল্ ব্রাণ্টন রমণাশ্রমে রইলেন, দিনে দিনে রূপান্তরিত হ'তে লাগলো তাঁর মহর্ষি সম্বন্ধীয় মনোভাব। মনে হ'তে লাগলো, যেন এই মানুষটি জনতাকে অতিক্রম ক'রে এক দুর্নিরীক্ষ লোকে নিজত্বের মধ্যে করেছেন স্থিতিলাভ। সাধারণ মানুষের দুঃখসুখের সঙ্গে তাঁর কোথাও কোন যোগ বা মিল নেই। নির্জন গিরিশিখরের সঙ্গে, সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে, বন প্রান্তর অরণ্যের সঙ্গে যেন তাঁর ঘনিষ্ঠতর আত্মীয়তা। অনন্ত শূন্য আকাশের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ। সমস্ত বন্ধনের ঊর্ধ্বে, যাবতীয় ক্ষুদ্রতা তুচ্ছতাময় জাগতিক সম্বন্ধের পরপারে এমন একটি দুরারোহ দুর্লভ স্থিতি তিনি লাভ করেছেন যে সবাইকার মাঝে থেকেও তিনি হ'য়ে উঠেছেন অনন্য—চিরদিনের একা।

দৈনন্দিন পরিচয়ের ফলে পল্ ব্রাণ্টনের মনে মহর্ষির প্রথম দিনের আত্মতত্ব সহজ বোধ্য হ'য়ে উঠেছিল এ কথা আমরা অনুমান ক'রে নিতে পারি। কিন্তু অজ্ঞতার দ্বিধা তো সহজে যায় না! যোগীরা যে যোগের কথা বলেন, সে কি সংসারের মধ্যে থেকে সম্ভব? তাই যদি হবে তবে তাঁরা বনে জঙ্গলে পাহাড়ে পর্বতে গিয়ে তপস্যার আয়োজন করবেন কেন? অথচ মহর্ষি এ ধরনের তপস্যার কথা বলেন না। বলেন আত্ম-জিজ্ঞাসার কথা, আত্ম-বিশ্লেষণের কথা। সংসারে বাস ক'রে—বিশেষত পাশ্চাত্য জীবন যাত্রার গতিমুখর কর্ম-স্রোতে এই ধরনের আত্ম-জিজ্ঞাসার সম্ভাবনা কোথায়? অথচ মহর্ষির দৃষ্টিতে এই আত্ম-জিজ্ঞাসার ধারাটি কর্ম জীবনকে বাদ দিয়ে নয়।

আত্মধ্যান যদি ঠিকমত হয়—তার ফলে কর্মের নিগূঢ় কৌশলটিই শেষ পর্যন্ত আয়ত্তে আসে। একটি সুরই বেজে ওঠে দুটি বিভিন্ন ধারায়। বাহির ও ভিতর মিলে যায় সেই সুরে।

পল্ ব্রাণ্টন কৌতূহলি হয়ে প্রশ্ন করেন, 'তাই যদি হয়, তাহলে কর্মের রূপটি শেষ পর্যন্ত কেমন হ'য়ে ওঠে ?'

মহর্ষি উত্তর দেন, 'এই ভাবে চলতে চলতে মানুষের প্রতি ও বস্তু জগতের প্রতি তোমার দৃষ্টিভঙ্গিটিই যাবে ধীরে ধীরে বদলে। কর্মগুলি ধ্যানধর্মী হ'য়ে উঠবে।'

পূর্ব প্রসঙ্গের জের টেনে পল্ ব্রাণ্টন বলেন, 'কিন্তু যোগীরা তো তা বলেন না। কর্মকে বাদ দিয়ে ত্যাগের পথে তাঁদের তপস্যার জয়যাত্রা।'

মহর্ষি বলেন, 'ব্যক্তিগত স্বার্থের সম্বন্ধে বাঁধা সংসার থেকে মুখ ফিরিয়ে, মিথ্যা সত্তার মোহকে দিতে হয় বিসর্জন। একেই বলে সত্যিকারের সন্ন্যাস!' চমকে ওঠেন পল্ ব্রাণ্টন। তবে কি সত্যই সাংসারিক কর্মে লিপ্ত থেকেও নিঃস্বার্থ হওয়া যায়। দ্বিধা-পীড়িত কণ্ঠে আবার জিজ্ঞাসা করেন, 'যদি কর্মের মধ্যেও সন্ন্যাসের স্থান থাকে তবে যোগীরাই বা কেন সে পথটি গ্রহণ করেন না ?'

উত্তর পেলেন, 'যোগীদের পদ্ধতি বিভিন্ন। মনটাকে তাড়না ক'রে তাঁরা কেন্দ্রের অভিমুখে পরিচালিত করেন। আর এ পথে মন স্বচ্ছন্দ-সুখে আকর্ষিত হ'য়ে নিজের স্থানটি বেছে নেয়।'

পল ব্রাণ্টন বললেন, 'কোন্ আকর্ষণের কথা বলছেন—ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

মহর্ষি বললেন: 'ওই যে নিজেকে নিজে প্রশ্ন করবার কথা বললাম, 'কে আমি'। এই অনুসন্ধানে লেগে থাকলে ধীরে ধীরে আবিষ্কৃত হবে মনাতীত পটভূমিকা। এদিকটা যতোই পরিস্ফুট হ'য়ে উঠবে, ততই অন্যান্য যাবতীয় সমস্যার ঘটবে সমাধান। আচ্ছা, আরো

একটু পরিষ্কার করে বলছি। সব মানুষই কামনা করে এমনতর সুখ বা আনন্দ যাতে দুঃখের সংস্পর্শ লাগে নি। যে আনন্দ ফুরিয়ে যাবে না তাই সবাই চায়। সহজাত এই প্রবৃত্তিকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি চিরন্তন সত্যকেও না মেনে উপায় নেই যে, নিজেকে মানুষ যত ভালোবাসে তত আর কোন কিছুকেই ভালবাসে না। এবার এই দুটিকে একসঙ্গে মিলিয়ে দিলে কি দেখা যায়? দেখা যায় যে প্রত্যেকটি মানুষই আনন্দলাভের উদ্দেশ্যে কোন-না-কোন পন্থা অনুসরণ ক'রে চলেছে। কেউ নিচ্ছে ধর্মের আশ্রয়, কেউ বা খাচ্ছে মদ। কিন্তু পন্থা যাই হোক, উদ্দেশ্য সেই আনন্দ ছাড়া আর কিছুই নয়। এর থেকে এই প্রমাণই হয় যে—আনন্দ হ'ল মানুষের সত্যিকারের স্বভাব। মানুষের প্রকৃত সত্বার স্বরূপটিই হ'ল আনন্দ। আনন্দের অনুসন্ধানের সঙ্গে ওতপ্রোত হ'য়ে আছে আত্মানুসন্ধান; কারণ, আনন্দ চাওয়ার মানেই হ'ল আত্মবস্তুকে চাওয়া। আত্মবস্তু অমর। একে লাভ করলে তবেই মানুষ সেই আনন্দকে লাভ করে যার শেষ নেই।'

পল্ ব্রাণ্টন বিহ্বল হ'য়ে শুনলেন। হয়তো বা কথাগুলির অন্তর্নিহিত অর্থটি ঠিক ধরতে পারলেন না। অথবা হয়তো—দুঃখ-প্রপীড়িত, আর্ত, ব্যথিত মানবতার যে স্বরূপটি তাঁর প্রত্যক্ষ বস্তু তার সঙ্গে মহর্ষি-বর্ণিত এই আনন্দময় অবিনশ্বর সত্বার যোগটি খুব স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো না। তাই বললেন, 'পৃথিবীতে তো দেখি দুঃখের অন্ত নেই।' মহর্ষি বললেন, 'হ্যাঁ, তার কারণ জগতের লোক আত্মস্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞ। অথচ একথাও ঠিক যে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে সুখ সন্ধানের বেনামীতে আত্মানুসন্ধান করছে না এমন মানুষও নেই। যে পাপী সেও পাপ করে আনন্দের জন্য—আনন্দ-স্বরূপ সত্বার অনুসন্ধান-প্রেরণাই পাপকর্মের রূপে প্রতিভাত হয়। স্বতস্ফূর্ত্ত প্রবৃত্তির মূলটি প্রচ্ছন্ন হ'য়ে থাকে বলে তারা জানেও না যে দোষ-দুষ্ট পথে আত্মানুসন্ধানের প্রবৃত্তিই তাদের পরিচালিত করছে।'

পল্ ব্রাণ্টন জিজ্ঞাসা করলেন 'যে আত্মবস্তুকে জানলে পরিপূর্ণ আনন্দের অধিকারী হওয়া যায়—কাকে বলে সেই আত্মবস্তু? আমার জানা আছে আমি কেমন: কিন্তু যে 'আত্মাকে' আমি জানি—তা ছাড়া আরও যে আত্মবস্তুর কথা আপনি বলছেন, তাকে মানতে হ'লে তো একাধিক আত্মবস্তুর অস্তিত্বকে মানতে হয়।' স্মিত হাস্যে মহর্ষি বললেন, 'না, তা নয়। একাধিক সত্ত্বা কারুর থাকে না। সত্ত্বা একটিই; কিন্তু এই সত্ত্বাটিকে নিঃসংশয়ে চিনে নিতে হ'লে যে আত্ম-বিশ্লেষণের প্রয়োজন সাধারণত তারই ঘটে অভাব। আত্ম বলতে, বহুদিনের পুঞ্জীভূত সংস্কারে আমরা বুঝে রেখেছি দেহকে আর মস্তিষ্ককে। সত্যিকারের আত্মবস্তুর সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয় ঘটবার সুযোগ হ'ল কই? কে আমি—এই অনুসন্ধানের সেই জন্যই তো প্রয়োজন। প্রকৃত যে আত্মবস্তু তার বর্ণনা করা তো সহজ নয়! এইটুকুই কেবল বলা যায় যে ব্যক্তিগত আমির বোধটি যে সত্ত্বা থেকে উদ্বুদ্ধ হয় এবং যেখানে গিয়ে শেষ পর্যন্ত মিলিয়ে যায়, তাই হ'ল আত্মসত্ত্বা।'

গোল বাধলো মহর্ষির এই শেষের কথাটিতে। 'আমি' বোধটি সত্ত্বা থেকে উদ্বুদ্ধ হ'ল। ফলে এলো আমিত্ব, ব্যক্তিত্ব। এ পর্যন্ত পল্ ব্রাণ্টন এক রকম ক'রে মেনে নিলেন। কিন্তু ব্যক্তিত্বটি যদি আবার এই সত্ত্বায় গিয়ে মিলিয়ে যায় তবে আর আত্মসত্ত্বা বলতে থাকে কি? যে সূক্ষ্মতম বিশ্লেষণের পন্থার কথা মহর্ষি বলছেন সেই পথে আমির ধারাটিকে অনুসরণ ক'রে যদি বা শেষ পর্যন্ত তার উৎসমুখে গিয়ে পৌঁছানো যায়, তখনো থাকে সমস্যা কণ্টকিত আরও একটা সম্ভাবনার প্রশ্ন। 'আমি' বোধটি যখন সত্যি সত্যিই মিলিয়ে যাবে—তখন অবশিষ্ট থাকবে কি? হয় মানুষটা হয়ে যাবে জড়বুদ্ধি, নাহয় জ্ঞান শূন্য। আশঙ্কার কথাটি পল্ ব্রাণ্টন অকপটে মহর্ষিকে জানালেন।

স্বভাবসিদ্ধ কোমল স্মিত হাস্যে মহর্ষি বললেন, 'না,—সে ভয়

নেই। আত্মসত্ত্বায় প্রতিষ্ঠিত হলে মানুষ স্ব-স্বরূপে বা চৈতন্যসত্ত্বায় হয় প্রতিষ্ঠিত। অজ্ঞানের স্থান নেই এই জ্ঞানময় অমৃতসত্ত্বায়।'

কিন্তু পল্ ব্রাণ্টনের মনে তখনো ছিল সেই মিলিয়ে যাওয়া 'আমি'টির জন্য দুশ্চিন্তা। তিনি প্রশ্ন করলেন, 'যতো যাই হোক, উন্নততর সত্ত্বার কেন্দ্রস্থলেও তো 'আমি' থাকতে বাধ্য!' মহর্ষি উত্তর দিলেন—'হ্যাঁ, কিন্তু তখনকার 'আমি' আর পূর্বেকার সমগ্র সত্ত্বা বোধক 'আমি' নয়। দেহ মনকে মাত্র নির্দেশ করে সেই আমি। আত্মসত্ত্বার প্রথম সাক্ষাৎকারের সঙ্গে সঙ্গে সত্ত্বার গভীর লোক হ'তে মনাতীত একটি বস্তু নিজের প্রভাব বিস্তার করে। এই বস্তুটিকে কেউ বা বলে আত্ম, কেউ বা বলে স্বর্গরাজ্য, কেউ বা বলে নির্বাণ, কেউ বা বলে মোক্ষ। নাম যাই দাও—অসীম, অনন্ত, স্বর্গীয় এই অবস্থাটি যার জীবনে ঘটে সেই হ'য়ে ওঠে পরিপূর্ণ; হারাবার কিছু থাকে না তার, অভাবও থাকে না তার কোনখানে। দ্বিধা, অনিশ্চয়তার শেষ কিছুতেই হয় না যে পর্যন্ত না জীবনের চরমতম এই পরম অবস্থাটি আসে।'

'রাজশক্তি বা রাষ্ট্রশক্তির প্রয়োগে প্রজা শাসনের প্রহসনটা হয়তো বা খানিকদূর পর্যন্ত চালানো যায়; কিন্তু এই শক্তিমানেরা নিজেদের মনে অভ্রান্ত ভাবে জানে যে নিজেদের পরিচালনা করবার মত শক্তি তাদের নেই। বুদ্ধির গর্বে যারা তাল ঠুকে বেড়ায়, হয়তো বা তারা জানে অনেক, লাভ করেছেও অনেক—কিন্তু জিজ্ঞাসা ক'রে দেখো দেখি—তারা জীবনের রহস্য ভেদ করেছে কি না। তখনি মনে হবে, শেষ পর্যন্ত যে তিমিরে সেই তিমিরেই তারা রয়ে গেছে। অনেক জেনেই বা কি হবে, সব কিছু জেনেই বা কি হবে, যদি নিজের জীবনের রহস্যটুকুর মীমাংসাই জীবনে না হয়! শেষ প্রশ্নটি সবাই চলে এড়িয়ে, অথচ এ কথাও সত্য যে এর চেয়ে বড় জানা সংসারে আর কিছুই নেই।'

পল্ ব্রাণ্টন আবার বললেন, 'মানি ; কিন্তু মহর্ষি, ব্যাপারটি তো বড় সহজ নয়। মনে হয় যেন অতিমানুষিক।'

মহর্ষি বললেন, 'তা হতে পারে, কিন্তু অসম্ভব নয়। পথ যত কঠিনই হোক, আয়াসসাধ্য সন্দেহ নেই। ধ্যানের স্রোতটি অভ্যাসের দ্বারা জাগিয়ে রাখতে হয়। সাংসারিক কর্মধারার মাঝখান দিয়েও প্রবাহিত থাকে অব্যাহত ভাবে এই ধ্যানের ধারাটি। 'কে আমি'—এই জিজ্ঞাসাটি কর্মজগতের মাঝখানে প্রতিফলিত হ'য়ে এই ভাবটিই রাখে জাগিয়ে যে দেহ বা মস্তিষ্ক বা আকাঙ্ক্ষাগুলির কোনটাই আত্মবস্তু নয়। জিজ্ঞাসার ভাবটি ঠিকমত জাগিয়ে রাখতে পারলেই ধীরে ধীরে আত্মসত্ত্বার গভীর লোক হতে নিঃশব্দ অনুভূতির প্রবাহে সমাধানটি এসে হাজির হয়। মনের দ্বিধাগুলি, সমস্যাগুলি একে একে যায় মিলিয়ে। সূর্যালোকের মত স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে চিরন্তন সত্যবস্তু।'

মহর্ষির কথাগুলি দোলা দেয় পল্ ব্রাণ্টনের সংশয়াচ্ছন্ন চেতনায়। মহর্ষির অত্যুজ্জ্বল প্রজ্ঞানঘন দৃষ্টির সামনে যে সত্যকে করতলগত বলে মনে হয়, তাঁর দৃষ্টির আড়ালে তাই যেন মনে হয় অসম্ভব কল্পনার মতই সুদূর। নিভৃত ভারতের অনুসন্ধানে এসে—অনেক যাদু, অনেক ইন্দ্রজালের ভিড় ঠেলে বারে বারে এসেছেন মহর্ষির সান্নিধ্যে—বারে বারে গেছেন ফিরে পল্ ব্রাণ্টন। সাংবাদিকতার ভূয়োদর্শন-স্পৃহা টেনেছে তাঁকে একদিকে ; আর একদিকে টেনেছে কেন্দ্রাতিগ শক্তির দুর্বার আকর্ষণ। ভূত-গ্রস্তের মত পল্ ব্রাণ্টন দিকে দিকে পরিভ্রমণ ক'রে খুঁজে বেড়িয়েছেন কখনো বা সাপের ওঝা, কখনো বা অলৌকিক শক্তিশালী সাধু সন্ন্যাসী ফকির। কৌতূহলি হ'য়ে জানতে চেয়েছেন এই সমস্ত তথাকথিত দৈব-শক্তির মূলগত রহস্যটি। সংগ্রহ করেছেন অজস্র সাংবাদিকতার উপকরণ। আবার পরক্ষণেই এই সমস্ত অনুসন্ধান অকস্মাৎ হ'য়ে উঠেছে অর্থ-

হীন। আত্মসত্তার আহ্বানে আবার ছুটে গেছেন অরুণাচল পর্বতের সানুদেশে। তাঁর মনে হয়েছে যেন তিনি মহর্ষির সান্নিধ্যে এসে ফিরে পেয়েছেন তাঁর বহুদিনের হারানো শৈশব। স্বপ্নের মত মনে হয়েছে যেন বিগত দিনের আশা আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে আর তাঁর এ জীবনের কোন যোগ নেই, নেই কোন সামঞ্জস্য। মহর্ষির অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যেন কেমন ক'রে সব কিছুই গেছে ওলোটপালোট একাকার হ'য়ে। অথচ ঠিক যাকে বলে গ্রহণ করা, তাও যেমন এ ক্ষেত্রে সম্ভব নয় বলে মনে হয়েছে—যাকে বলে অস্বীকার করা, তাও এ ক্ষেত্রে অসম্ভব বলেই তাঁকে মানতে হয়েছে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত পল্ ব্রাণ্টনের জীবনে এই দোটানার ঘটলো অবসান। কেমন ক'রে কি ঘটলো তার সঠিক পরিচয় পল্ ব্রাণ্টনের নিজের কথাতেই দেওয়া ভাল।

'ইতিমধ্যে আমার মনের মধ্যে জিজ্ঞাসার স্রোতটি এসেছে ক্ষীণ হ'য়ে। আমার চেতনায় যত রকমের অনুভূতির ছায়া পড়েছে, বিধিমত ভাবে দেখেছি তাদের পরীক্ষা ক'রে। কিন্তু আত্মজ্ঞান লাভের কোনরকম সুবিধাই এতে হয় নি। চেতনার কেন্দ্রস্থলে ডুব দিয়ে চিন্তার উৎস সন্ধানে হয়েছি সচেষ্ট। হঠাৎ যেন কোন এক অপ্রত্যাশিত মুহূর্তে মন গেল নিজের মধ্যে বিলুপ্ত হ'য়ে—রইলো একটা অখণ্ড অবিচ্ছিন্ন নিস্তব্ধতা। ছায়ার মত হয়ে মিলিয়ে গেল পরিচিত জগত। তার পরে এলো একটা অপরিসীম শূন্যতা।'

'সাধারণত এই শূন্যতার ভাবটিকে জাগিয়ে রাখতে মনের সঙ্গে খানিকটা বোঝাপড়ার দরকার হয়। কিন্তু আজ আর আমার তরফে কোনরকম সচেষ্টতার প্রয়োজন হ'ল না। কি যেন একটা দুর্বার শক্তির আকর্ষণে আমার সমগ্র সত্ত্বা হ'য়ে উঠলো অন্তর্মুখী। সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল যেন আমার আর নিজের চেষ্টা বলতে কোন কিছুই নেই—এবং তার প্রয়োজনও গেছে ফুরিয়ে। বুদ্ধির সীমানার বাইরে

দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ করলাম একটির পরে একটি বহিরাগত চিন্তার ধারাবাহিক আবির্ভাব। মনে হ'ল এদের সঙ্গে আমার কোন যোগ নেই। এরা আসে যায় এদের নিজের নিয়মে, বোঝা হ'য়ে চেপে বসে থাকে মনের উপরে। মনে হ'ল যেন এই প্রথম এদের স্বেচ্ছাচারের পীড়ন হ'তে পেয়েছি নিষ্কৃতি। চিন্তার পাশ কাটিয়ে ইচ্ছা হ'ল এবার গভীরে দিই ডুব। চেতনার গভীর লোকে অধিষ্ঠিত হ'য়ে আবিষ্কার করি চিন্তার প্রাথমিক উৎসটিকে।'

'সঙ্কল্পটি জাগলো আর সঙ্গে সঙ্গে কি যেন একটা ঘটে গেল। চিন্তার জ্বলন্ত বাতিটা দপ্ ক'রে গেল নিভে। চেতনা আছে, অথচ মস্তিষ্কের ক্রিয়া নেই। চৈতন্যের কেন্দ্রস্থলে লগ্ন হয়ে গিয়ে চিন্তা গেছে স্তব্ধ হ'য়ে। এ যেন একটা গভীর সুষুপ্তির ভাব। অথচ এ জড় সুষুপ্তি নয়, কারণ এর মধ্যেও চৈতন্য আছে অব্যাহত। শান্ত হয়ে সব কিছুই আমি প্রত্যক্ষ করছি; জানছি আমি কে, বুঝছি কি ঘটছে: কিন্তু এই জানার মধ্যে নেই সত্তার স্বাতন্ত্র্য। এ যেন এক নূতনতর 'আমির' দীপ্যমান সত্তায় আমার রূপান্তরিত পরিণতি। এ যেন এক বিশাল, বিরাট ভূমায় অনির্বচনীয় মুক্তিস্নান—আমাকে ঘিরে আছে শূন্যময় নভতল, অনন্তকালের চিন্তা-প্রপীড়িত দাসত্বের বাঁধন গেছে খুলে।'

'আমার মনে হ'ল আমি যেন বিশ্বচেতনার বহির্দেশে পেয়েছি আশ্রয়। পৃথিবী নামে যে গ্রহটির বাসিন্দা আমি, সে যেন কোথায় গেছে মিলিয়ে। সৃষ্টির আদিমতম জ্যোতিঃসমুদ্রে যেন আমি করেছি অবগাহন। আমি যেন বিশ্ব-নাট্যের অন্তর্নিহিত রহস্য-কেন্দ্রকে পরিক্রমা ক'রে এক মুহূর্তে নিজের প্রাচীনতম সত্তায় এলাম ফিরে। এখানে যেন শান্তির অমৃত-সাগর। বিগতকালও নেই, আগামী কালও নেই। সমস্ত সৃষ্টিতে ওতপ্রোত হ'য়ে যেন আমি আমার সীমানার বাইরে গেছি বহু বিস্তৃত হ'য়ে—খুঁজে পেয়েছি আমার সত্তার অর্থ।'

আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা বলতে কি বোঝায় সে সম্বন্ধে পল্ ব্রাণ্টনের কোনরূপ ধারণাই যে ইতিপূর্বে ছিল না—তাতে ভুল নেই। অথচ নিঃসংশয় সত্যের রূপে যখনি তাঁর চেতনার দ্বারে পরমতম রহস্যটি উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো, তখনি যেন এক নিমেষে ঘটে গেল কি একটা বিপর্যয়। ধ্যানের ঘোর যখন কাটলো, ধীরে ধীরে পল্ ব্রাণ্টন ফিরে এলেন পূর্বতন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে। মহর্ষির বসবার ঘরটি তখন প্রায় জনশূন্য। ঘড়ির দিকে চেয়ে তিনি বুঝলেন যে একঘর লোকের মধ্যে একভাবে বসে ইতিমধ্যে দুটি ঘণ্টা কেটে গেছে। আহারের ঘণ্টা হ'তেই সবাই নিঃশব্দে কোন সময় একে একে উঠে গেছেন। পার্শ্বোপবিষ্ট জনৈক বৃদ্ধ আরও কাছে ঘেঁসে এসে আনন্দ সংবাদটি দিলেন জানিয়ে—'যতক্ষণ আপনি ধ্যানস্থ ছিলেন, মহর্ষির দৃষ্টি সারাক্ষণ নিবদ্ধ হয়েছিল আপনার দিকে। সে দৃষ্টির প্রভাব নিশ্চয়ই আপনি বোধ করেছেন।'

এই ঘটনার পরে দু' এক দিনের মধ্যেই পল্ ব্রাণ্টনের ভারতবর্ষে অবস্থানের মেয়াদ শেষ হ'ল। কর্মজগতের আহ্বানে দিতে হ'ল তাঁকে সাড়া। পিছনে পড়ে রইলো রমণাশ্রমের তপোভূমি। কিন্তু তাঁর নিজের কথা থেকে জানা যায় যে আসন্ন বিদায়ের ক্ষণটিতেও সবচেয়ে বড়ো হয়ে ছিল এই ধ্রুব বিশ্বাসটিই যে সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হ'য়ে সুদূর বা অদূর ভবিষ্যতের অমোঘ বিধানে আবার তাঁকে ফিরে আসতে হবে। পল্ ব্রাণ্টনের ঘটনাবহুল বিচিত্র অভিজ্ঞতার এই অধ্যায়ে ছত্রে ছত্রে যে কথাটি ফুটে উঠেছে তার সারার্থ হ'ল এই যে, মহর্ষির কৃপাদৃষ্টিপাতে তিনি আবিষ্কার করেছেন তাঁর নিজের অজ্ঞাত সত্তাকে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জীবনের নিভৃত গভীর লোকে বেজে উঠেছে নূতনতর একটি সুর যার আবেদনকে অগ্রাহ্য করবার মত শক্তি তাঁর নেই।

মহর্ষি রমণের অলোক-সামান্য জীবন কাহিনীর পটভূমিকায়

নানান কারণে পল্ ব্রাণ্টনকে অনেকখানি স্থান দেওয়া হয়েছে। মহর্ষির পরিচয়ের যে বিশেষ দিকটি এই বিদেশী মানুষটিকে উপলক্ষ ক'রে হ'য়ে উঠেছে উদ্ভাসিত, তাকে বাদ দিলে মহর্ষি চরিত্রের অনেকখানি মাধুর্যই যেন বাদ পড়ে যায়। পল্ ব্রাণ্টনের সাংবাদিক মনোবৃত্তি তাঁর লিখিত বিবরণে হয়তো বা নানাভাবেই প্রতিফলিত হ'য়ে আছে। হয়তো বা তাঁর উচ্ছ্বাসময় বর্ণনায় সাংবাদিক সুলভ মামুলী অত্যুক্তির অভাব নেই। এমনও হতে পারে যে নূতনত্বের মোহে আচ্ছন্ন হ'য়ে তিনি অনেক কিছু বলেছেন যা সর্বতোভাবে তাঁর অন্তরের কথা নয়। কিন্তু পাশ্চাত্য জগতের বস্তু-তান্ত্রিক সভ্যতার সমক্ষে কোন একটা চমকপ্রদ নূতন তথ্যকেই তিনি সাহিত্যের সজ্জায় সাজিয়ে হৃদয়গ্রাহী ক'রে বলতে চেয়েছেন —এইটুকু মাত্র স্বীকার করলে পল্ ব্রাণ্টনের উপরে নিদারুণ অবিচার করা হবে। উচ্ছ্বাস, মোহ, আত্মপ্রচারের লোভ, সাংবাদিকতার বদভ্যাস ইত্যাদি বাদ দিলেও তাঁর আত্মকাহিনীর মধ্যে এমন অনেক কিছু থাকে যা চিরন্তন সত্যের কোঠায় স্থান পাবার যোগ্য।

মহর্ষি রমণের সত্যিকারের স্বরূপটি পল্ ব্রাণ্টনের কাছে কতখানি স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছিল সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এ কথা স্বীকার না ক'রে উপায় নেই যে, যে দৃষ্টি দিয়ে তিনি মহর্ষির কার্যকলাপকে লক্ষ্য করেছেন, তার সবটাই নিছক সাংবাদিকতা নয়। মহর্ষির কাছে এসে মানবাত্মার নবতম মাহাত্ম্যের একটি রূপ তিনি চোখ দিয়ে দেখেছেন, মন দিয়ে উপলব্ধি করেছেন। তা না হ'লে মহর্ষিকে এভাবে গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হ'ত না। পাশ্চাত্য দৃষ্টির বিচার-বুদ্ধির মাপকাঠি যে এখানে অচল—এ কথাটা তাঁকে কেউ বলে দেয় নি। বলে দিলেও তিনি নির্বিচারে সে কথা মেনে নিতে পারতেন না। অথচ তাঁর আজীবন সংস্কারের মজ্জাগত

এই মাপকাঠিটি তিনি অত্যন্ত সহজে মহর্ষির ক্ষেত্রে নিঃশেষে বিসর্জন দিয়েছেন ; এটা কম কথা নয়।

পল ব্রাণ্টন দিনের পর দিন মহর্ষির আশ্রমে অবস্থান ক'রে দেখেছেন—শারীরিক ও মানসিক বিভিন্ন প্রকারের ব্যাধি নিয়ে, নানা দেশের নানা ধর্মের বিবিধ নরনারী তাঁর কাছে আশ্রয় নিতে আসে। যার অনেক আছে সেও আসে, যার কিছু নেই সেও আসে। ধনী দরিদ্র, বিদ্বান মূর্খ, ভক্ত অভক্ত, বিশ্বাসী অবিশ্বাসী—কারুর সঙ্গে মহর্ষি বড় একটা বাক্যালাপ করেন না। বিশেষ ভাবে কারুর দিকে তিনি চেয়ে দেখেছেন বলেও মনে হয় না। কারুর জন্য কোনরকম দুশ্চিন্তা করেছেন বলেও মনে হয় না। অথচ বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে কেবল এই ক্ষণকালের সান্নিধ্যটুকু লাভ ক'রেই যেন কোন অলৌকিক প্রভাবে রোগীর রোগ সেরে গেছে, বিষণ্ণের মুখে ফুটেছে হাসি, চিন্তিতের চিন্তা গেছে দূর হ'য়ে। পল্ ব্রাণ্টনের মনে হয়তো প্রথম প্রথম সন্দেহ জাগতো। তিনি হয়তো ভাবতেন, এ তাঁর মনের ভুল—দৃষ্টির ভ্রম। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে তাঁর মন উদ্যত হ'য়ে উঠতো। তিনি ভাবতেন এ কেমন ক'রে সম্ভব হয় ? কিন্তু চোখের সামনে যে ঘটনা নিত্য ঘটছে তাকে অস্বীকার করা যায় কি ক'রে ?

এইরূপে ক্রমে ক্রমে তাঁর নিজের দ্বিধাগ্রস্ত পীড়িত মনেও বুঝি, মহর্ষির অত্যাশ্চর্য প্রভাবটি তাঁর নিজের অজ্ঞাতসারেই হ'য়ে গেল প্রতিফলিত। বুদ্ধি দিয়ে না বুঝলেও তিনি অন্তরে অন্তরে, অনুভূতির স্তরে স্তরে, চেতনার অদৃশ্যলোকে, লাভ করলেন মহাসত্যের প্রেরণা। বস্তুকে নিয়ন্ত্রিত করে যে নিগূঢ় নিঃশব্দ সত্ত্বা—না বুঝেও তাকে তিনি মেনে নিলেন। অথবা, বোধাতীত পরম রহস্য এমন ক'রেই তাঁর অন্তরকে পেয়ে বসলো যে বুদ্ধি বা যুক্তির কোনরূপ জিজ্ঞাসাই আর সেখানে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারলো না। তিনি দেখলেন সত্যের স্বরূপ। স্থান কাল শিক্ষা সংস্কারের সমস্ত বিভেদকে

অতিক্রম ক'রে অতি অনায়াসে তিনি সন্দেহাতীত সত্যকে নিলেন চিনে।

মহর্ষির সন্নিধ্যানে এসে যে সমস্ত অগণিত নরনারী দিনের পর দিন সাক্ষাৎ সত্যের প্রত্যক্ষ অনুভূতি আহরণ ক'রে নিয়ে গেছেন তাঁদের কয়জনের সংবাদই বা আমরা জানি! এঁদের মধ্যে যে দু'একজন ছাপার অক্ষরে নিজেদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনী লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন, শ্রীমতী প্যাস্‌কালিন্ ম্যালেট্ তাঁদের অন্যতমা। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে যখন ইংরাজী ভাষায় লিখিত মহর্ষির প্রথম জীবনীর অভ্যুদয় হয়, তখন থেকেই দেশ-দেশান্তরের চিঠিপত্র আসা শুরু হয়েছিল। দেখা গেল, বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষের বুকে জেগে আছে শাশ্বত তৃষ্ণা। যারা পথহারা তারা পথের সন্ধান চায়, যারা প্রবঞ্চিত তারা উঠতে চায় বঞ্চনার ঊর্ধ্বে। শ্রীমতী ম্যালেট্ কিসের আশায় আকুল হ'য়ে ছুটে এসেছিলেন তা বলা যায় না, কিন্তু তাঁর নিজের লেখা কতকগুলি পড়লে বোঝা যায় যে নিছক তৃষ্ণার দিক দিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কোন পার্থক্য নেই। তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার যে বর্ণনা তিনি করেছেন তা এইরূপ:

'বড় রাস্তার মোড় ঘুরে সামনেই পড়লো বিরাট এক আম গাছ। তারই পাশ দিয়ে আশ্রমের প্রবেশ দ্বার। একটু এগিয়ে যেতেই বৃক্ষান্তরালবর্তী গৃহগুলি চোখে পড়লো। আমাদের আসবার কথা ছিল না। কিন্তু দেখলাম, যে আসে তাকেই এখানে সাদরে গ্রহণ করা হয়। দু'একটি কথার পরেই আমরা মহর্ষির সান্নিধ্যে নীত হলাম। ঘরের ছাদ থেকে দুটি আলো ঝুলছে। টালি বিছানো মেঝেয় একঘর ভারতবর্ষীয় মানুষ সারি সারি আসনপিঁড়ি হয়ে বসে আছে। ঘরের এক ধারে, দরজার সোজাসুজি চৌকিতে উপবিষ্ট একটি মূর্তি—নিঃশব্দ নিস্পন্দ। গভীর ধ্যানে তিনি ডুবে আছেন। মনে হয় না যে, কোন ব্যক্তি বা কোন বস্তু সম্বন্ধে তিনি কিছুমাত্র সচেতন।'

'নিঃশব্দে প্রবেশ ক'রে ভারতীয় প্রথায় প্রণাম জানিয়ে আমরা ভিড়ের মধ্যে স্থান ক'রে নিয়ে একধারে বসলাম। সমগ্র পারি-পার্শ্বিকের সঙ্গে মাঝখানের মানুষটির প্রভাব অতি অবিস্মরণীয়ভাবে মনের মধ্যে ঘনীভূত হ'য়ে উঠতে লাগলো। মনে হ'তে লাগলো যেন শান্ত মহিমায়, সমাহিত শক্তিতে ও প্রশান্ত স্থৈর্যে এই মহামানবের ব্যক্তিত্ব সমস্ত স্থানটিতে পরিব্যাপ্ত হ'য়ে আছে। বলে বোঝানো যায় না এমন একটি নিবিড় শান্তির আবেষ্টন আছে ছড়িয়ে। নক্ষত্রের মত উজ্জ্বল দুটি চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হয় যেন জীবনে এই প্রথমবার অসীমের আভাস পেলাম; রসঘন আনন্দলোকের আবর্তে পড়ে ভেসে গেলাম। চকিত বিস্ময়ে মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগলো—কে এই পুরুষোত্তম? ক্রমবিবর্তনের মানবীয় বা অতিমানবীয় কোন্ স্তরে এঁর অবস্থিতি? অবশ্য এমনতর প্রশ্নের কোন অর্থই নেই। সূর্য যখন ওঠে তখন সেই সাক্ষাৎ মহাপ্রকাশের সম্মুখে দাঁড়িয়ে কেন, কি বৃত্তান্ত ইত্যাদি জানতে চাওয়ার প্রয়োজন হয় না। বক্ষে যার তৃষ্ণা সে কি সামনে সুপেয় জল পেয়ে জিজ্ঞাসা করবে—কোথাকার জল?'

'অস্থির, চঞ্চল, বুদ্ধি-সর্বস্ব আমার মন শান্ত হ'য়ে নিঃশব্দে অবগাহন করলো এই অত্যুজ্জ্বল আলোকের স্নিগ্ধ ধারায়। মনে হ'ল যেন আমার চারিদিকে দ্যুতিময় মহাশক্তির তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত আবেগে দ্যুলোকের পানে ছুটেছে। মহর্ষির নিবাত-নিষ্কম্প দেহে নেই এতটুকু চঞ্চলতা। সেই ঘরের মধ্যে যারা বেদ পাঠ করছিলো তাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তিনি মোটেই সচেতন ছিলেন না। আমি অনুভব করলাম তিনি যেন স্থান-কালের সীমানা ছাড়িয়ে এই পৃথিবীর বহু ঊর্ধ্বে বিরাজ করছেন।'

মনে রাখতে হবে যে এই উচ্ছ্বসিত উক্তি অন্তরঙ্গ স্তবের মত যাঁর অন্তর থেকে নির্গত হয়েছে, তিনি ইতিপূর্বে মহর্ষিকে জানা দূরে থাক, কখনো চোখেও দেখেন নি। শ্রীমতী প্যাস্‌কালিন ম্যালেটের জন্ম ও শিক্ষা ফরাসী দেশে। ভারতবর্ষ তাঁর কাছে এক অনাবিষ্কৃত মহাদেশ।

এখানকার সংস্কৃতি ও সভ্যতার সঙ্গে তাঁর কিছুমাত্র পরিচয় নেই। আত্ম-জ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান, সমাধি ইত্যাদি ব্যাপার তাঁর কাছে নিতান্তই কথার কথা। এই সব আধ্যাত্মিক স্তরের কথা তিনি যদি বা কখনো কানে শুনে থাকেন, তাহলেও বিলাতি মানুষ যেভাবে সচরাচর এ সব কথা শোনে, সেই ভাবেই বড় জোর শুনেছেন। এমন অবস্থায়, এই অদৃষ্ট-পূর্ব পরিস্থিতির মধ্যে এই এক অজ্ঞাতকুলশীল অর্ধ-উলঙ্গ অসুন্দর প্রৌঢ়কে প্রথমবার দর্শন ক'রেই, তাঁর অন্তর এমন ক'রে কানায় কানায় ভ'রে উঠলো কেন? এই প্রশ্নের উত্তর তিনি নিজেই দিয়েছেন।

তিনি বলেছেন—'কেন আমার মনে এমনতর ধ্রুব বিশ্বাসের জন্ম হ'ল তা আমি কোনদিন বুঝিয়ে বলতে পারবো না। এ আমার বুদ্ধির কথা নয়। যেমন ক'রে সৌরভকে অনুভব করি কিন্তু বোঝাতে পারি না, তেমনি ক'রে পেলাম আভাস আমার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে। বর্ণনা করতেও পারবো না, প্রমাণ দিতেও পারবো না আমার এই পরমাশ্চর্য অভিজ্ঞতার। কিন্তু একথা সত্য যে এ জীবনে কোনদিন এই অচিন্ত্যনীয় আবির্ভাবকে আমি ভুলতেও পারবো না। প্রথম দর্শনের পরের দিন যখন মহর্ষির সন্নিধানে উপস্থিত হ'লাম—দেখলাম তিনি চিঠিপত্র খবরের কাগজ ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত আছেন। তখনো মনে হ'ল, সব কিছুর মাঝখানে থেকেও তিনি যেন কোন কিছুর মধ্যে আবদ্ধ হ'য়ে নেই। যে আপেক্ষিক জ্ঞান অজ্ঞান নিয়ে আমাদের প্রতিদিনের কারবার এ সবের ঊর্ধ্বে তিনি যেন বিশ্বসৃষ্টির মূলকেন্দ্রে সংলগ্ন হ'য়ে আছেন। অথচ এই নিরালম্ব, নিরুপাখ্য, নির্গ্রন্থ অবস্থায় থেকেও তিনি জগতের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেই। তাঁর মধ্যে করুণা আছে, মমতা আছে, সহৃদয়তা আছে, সহানুভূতি আছে। দুঃখজর্জরিত শোকনিপীড়িত মানুষগুলির দুঃখ তিনি কান পেতে শোনেন, বুক ভ'রে করেন অনুভব। যারা আসে তারা কেউই শূন্যপ্রাণে বা রিক্তহস্তে ফিরে যায় না।'

ঠিক এমনি ধরনের অনুভূতির সাক্ষ্য দেয় আরও একজন য়ুরোপীয় দার্শনিকের লিখিত বিবরণ। এঁর নাম গ্র্যাণ্ট ডাফ্। সারা জীবন ধরে দর্শন শাস্ত্র ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বের পর্যালোচনা ক'রে এঁর মনে এই ধারণাটি বদ্ধমূল হ'য়ে উঠেছিল যে বিবিধ দর্শনের আলোচনায় সত্যকে জানা যায় না। বিশেষতঃ য়ুরোপীয় দার্শনিকবৃন্দের বিভিন্ন মতবাদ তন্নতন্ন ক'রে ঘেঁটে গ্র্যাণ্ট ডাফ্ বুঝলেন যে এই সব মতবাদ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে আর্য সভ্যতার কাছে বহুলাংশে ঋণী; অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ঋণ স্পষ্ট ভাষায় স্বীকৃত হয় নি। সত্যানুসন্ধানের পিপাসা যখন গ্রন্থপাঠের দ্বারা মেটানো গেল না, তখন তিনি ভারতবর্ষে চলে এলেন এবং শেষ পর্যন্ত মহর্ষির সান্নিধ্যলাভ ক'রে কৃতার্থ হলেন। নিজের কথা তিনি যে ভাবে বলেছেন তা এইরূপ:

'মহর্ষির কাছে এসে অচিরেই আমি বুঝলাম যে মানুষটি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগতের সীমানা অতিক্রম ক'রে আত্মসত্তার কেন্দ্রস্থলে নিঃসংশয়-ভাবে হয়েছেন প্রতিষ্ঠিত। দেহটি কোনরকমে টিকে আছে জগতের কল্যাণ কল্পে। দেহ ছাড়া আর যা কিছু, সব অনন্তের মাঝে মিশে একাকার হ'য়ে হারিয়ে গেছে।

লোকে জিজ্ঞাসা করতে পারে আমার এ প্রত্যয় হ'ল কি ক'রে। আমি বলবো, জানালার বাইরে তাকিয়ে যখন সূর্যকে দেখি, তখন যদি কেউ জিজ্ঞাসা ক'রে কেমন ক'রে আমি সূর্যকে দেখলাম—তার যা উত্তর, আমার উত্তরও তাই। আমি বলবো চোখ মেলে চেয়েছিলাম, অন্য সব ইন্দ্রিয় করেছিল সহযোগিতা,—তাতেই দেখা সম্ভব হ'য়েছিল। প্রত্যক্ষ সূর্যকে দেখতে বীজগণিত, জ্যোতিষবিদ্যা বা অন্য কোন শাস্ত্র প্রমাণের প্রয়োজন হয় নি। মহর্ষির বেলাতেও ঠিক তাই। তিনি যে প্রত্যক্ষ ঈশ্বর, তারও আর অন্য কোন প্রমাণের দরকার আমার হয় না।'

এ কথার পরে আর কিছুই বলবার থাকে না। কিন্তু গ্র্যাণ্ট ডাফ্,

এর পরেও পথভ্রান্ত মানবজাতিকে সম্বোধন ক'রে আরও কিছু বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'জীবনের মেয়াদ আছে আর যে ক'টা বছর, কেন মিছে দর্শনের পাঁক ঘেঁটে বৃথায় অপব্যয় করবে? সত্য রয়েছে সামনে পড়ে; চোখ ভ'রে তাকে দেখো, বুক ভ'রে তাকে গ্রহণ করো। অনন্ত, দীর্ঘ, দুরূহ মতবাদের গোলকধাঁধায় পড়ে মিছামিছি নিজেকে বিভ্রান্ত ক'রো না। পাশ্চাত্য দর্শনের অপরিসর জলাভূমি থাক পিছনে পড়ে। ধর্মতত্ত্বের কঠিন বন্ধুর পার্বত্য পথের নিষ্ফল যাত্রায় আসুক বিরতি। এই তো রয়েছেন সত্যস্বরূপ তোমার একান্ত সম্মুখে।'

আর এক যায়গায় এই ভক্তটিই লিখেছেন: 'পৃথিবীর ইতিহাসে বোধ হয় ইতিপূর্বে আর কখনো চরমতম সত্যস্বরূপ মানুষের কাছে এতখানি সুলভ হ'য়ে, এত নিকটে সরে আসেন নি। এর আগে যতবারই অনুরূপ সুযোগ এসেছে তার কাছে আসার, পাশাপাশি এসে জুটেছে পথের নানাবিধ প্রতিবন্ধক। সেও সোজা চলে গিয়ে সত্য-স্বরূপের প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ করতে পারে। অসুবিধার মধ্যে বড়জোর রেলের খরচটা আছে। বিপদ তো নেই-ই—হাতে হাতে লাভের নিশ্চয়তা রয়েছে আত্মজ্ঞানের মহাসম্পদ।'

কথাগুলি শুনলে যে কোন লোকের মনে হতে পারে হয়তো বা এর মধ্যে অনিচ্ছাকৃত খানিকটা উচ্ছ্বাসের আতিশয্য মেশানো আছে। পৃথিবীর ইতিহাসে পরমতম সত্যের চরমতম বিকাশ কবে কোথায় কি ভাবে ঘটেছে তা কোন মানুষেরই প্রত্যক্ষ ভাবে জানা নেই। কিন্তু সূর্যকে যখন দেখি তখন যদি ভুলে যাই যে এই সূর্যের পিছনেও বৃহত্তর সূর্যের অস্তিত্ব আছে, সেটা কি অপরাধ? ভক্ত যে চোখ দিয়ে দেখে সে তো সাধারণ মানুষের সচরাচর দেখার চোখ নয়। উপরোক্ত কথাগুলির মধ্যে যদি কোন আতিশয্য চোখে পড়ে সে দোষ ভক্তের নয়, আমাদের—যারা ভক্তির অভাবে সত্যদর্শনের দৃষ্টি থেকে হ'য়ে আছি

বঞ্চিত। ভক্তিহীন আর কিছু দেখতে না পেয়ে আতিশয্য বলে সব কিছু উড়িয়ে দিতে চায়। তাতে সে নিজেই ঠকে।

মহর্ষি রমণের বন্ধনহীন জীবনের যে অধ্যায়টি তাঁর জননীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সমাপ্ত হ'ল—বর্ত্তমান আশ্রমের সূত্রপাত অনুসন্ধান করতে হ'লে আবার সেই অধ্যায়ে ফিরে যেতে হয়। জননী দেহ রাখলেন ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে। ঘটনাটি ঘটলো ভক্তমণ্ডলির প্রথম সংঘ-জীবনের কেন্দ্রস্থল—স্কন্দাশ্রমে। জীবন-মৃত্যুর চিরন্তন লীলাপ্রবাহ এর অনেক আগেই মহর্ষির কাছে অর্থহীন হ'য়ে গিয়েছিল। জননীর মৃত্যুকে তিনি যে অতি সহজ ভাবেই মেনে নিয়েছিলেন, সে কথা ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে। মায়ের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে পূর্বেকার আবাস বিরূপাক্ষ গুহা ছেড়ে মহর্ষি এসেছিলেন স্কন্দাশ্রমে। মাতৃ-বিয়োগের সামান্য কিছুদিন বাদেই স্কন্দাশ্রমে বসবাসের পালা তিনি সাঙ্গ ক'রে দিলেন। এর মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ কতটুকু আছে বলা যায় না। ঘটনাটি ঘটলো এইভাবে।

মহর্ষি জননীর মহাপ্রয়াণের পরে ভক্তমণ্ডলি তাঁর সিদ্ধদেহ সমাধিস্থ করবার ব্যবস্থা করলেন। কাব্যকান্ত গণপতি শাস্ত্রী নিজে উপস্থিত থেকে এই অনুষ্ঠানে সহায়তা করলেন। আশ্রমজননীর দেহ সকলে মিলে বহন ক'রে নিয়ে গেলেন অরুণাচল পর্বতের ওপারে—পলীতীর্থম পুষ্করিণীর তারে। দূর-দূরান্তরের গ্রাম থেকে দলে দলে পল্লীবাসীগণ এসে এই উৎসবে যোগ দিলেন। গোড়া থেকে কোন রকম সমা-রোহের আয়োজন না থাকা সত্ত্বেও দেখা গেল সংবাদটি মুখে মুখে ছড়িয়ে গিয়ে যথেষ্ট লোক সমাগম হয়েছে। যথারীতি শাস্ত্রসম্মতভাবে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হ'ল। মহর্ষি স্বয়ং সমাধিস্থলে অবস্থান ক'রে জননীর শেষ কৃত্য পর্যবেক্ষণ করলেন। সমাধিস্থলে বেদী গেঁথে শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা হ'ল। মাতৃভূতেশ্বর শিবরূপে সেই লিঙ্গদেবতার নিত্যপূজার ব্যবস্থা এ যাবৎ চলে আসছে।

উৎসবের অবসানে আর সকলের সঙ্গে মহর্ষিও স্কন্দাশ্রমে ফিরে গেলেন। কিন্তু সামান্য কয়েকদিন পরেই মহর্ষি ফিরে গেলেন মায়ের সমাধিস্থলে এবং সেইখানেই রয়ে গেলেন। শূন্য স্কন্দাশ্রম ছেড়ে মহর্ষি'র ভক্তমণ্ডলি একে একে সকলেই মহর্ষি'র সন্নিধানে এসে সমবেত হলেন। এইখানেই ধীরে ধীরে গড়ে উঠলো বর্তমান আশ্রম।

আশ্চর্য এই গড়ে ওঠার বিবরণ। অর্ধশতাব্দী কাল ধরে মহর্ষি রয়েছেন অরুণাচল পর্বতের সীমানায়। এর মধ্যে সারা পৃথিবীর বুকে কত যে ভাঙাগড়া ঘটে গেছে তার হিসাব নেই। স্রোতের জলের মত, দিনের পর দিন, কত কামনা কত বেদনার বোঝা মাথায় নিয়ে লক্ষ লক্ষ নরনারী মহর্ষি'কে এসে দর্শন ক'রে গেছে। কেউ এসেছে পাশের গ্রাম থেকে, কেউ বা এসেছে পৃথিবীর অপর প্রান্ত থেকে। কেউ এসেছে অকৃত্রিম শ্রদ্ধায়, কেউ এসেছে নিছক কৌতূহলে। এসেছে নিঃস্ব পথের কাঙাল, এসেছে ধনকুবের। কেউ দেখেই চলে গেছে, কেউ বা আরও ভাল ক'রে দেখবার জন্য কয়েকদিনের জন্য আশ্রমের আতিথ্য গ্রহণ করেছে। আরও একদল, মধুর পাত্রে যেমন ক'রে মক্ষিকা ধরা পড়ে যায়, তেমনি ক'রে গেছে জড়িয়ে। কত দেশের, কত ধর্মের, কত জাতের, কত ভাষার, কত প্রকৃতির মানুষ এখানে এমনি ক'রে বাঁধা পড়ে আছে। অথচ মহর্ষি'র এই আশ্রমে সর্বধর্ম সমন্বয়ের কোনরূপ প্রচেষ্টা নেই। মিলনের সূত্র হ'য়ে একমাত্র সত্য আছে। প্রত্যেকটি মানুষের বুকের ধন সেই সত্য। আচার বিচারের সাম্প্রদায়িক সমস্যা বা ব্যক্তিগত রীতিনীতির প্রশ্ন এখানে ওঠে না। এ যেন এক পার্বত্য প্রবাহ—এ যেন এক জীবনের ধারা। যার প্রয়োজন আছে সে আসে। যতদিন খুশি থাকে; স্রোতস্বিনীর অনন্তধারার অমৃতবারি অঞ্জলি ভরে পান ক'রে পরিতৃপ্ত হ'য়ে চলে যায়। ঝর্ণার নিজের কোন প্রয়োজন নেই। না আছে দেওয়ার বোধ, না আছে তার ক্ষয়ব্যয়।

রমণাশ্রমে যে যখন এসেছে, এই কথাটাই তার মনে হয়েছে। কোন মানুষের কাছে মহর্ষি'র কোন প্রয়োজন নেই। এ আশ্রম যেন অপ্রয়োজনের একটা খেলাঘর। কারুর আসা যাওয়ায় মহর্ষি'র কিছুমাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি নেই। তিনি কখনো কোন লোককে আসতেও বলেন না, কোন লোককে যেতেও বলেন না। কামনাও নেই, যাচ্ঞাও নেই। আশ্রমে যারা আসে তাদের প্রত্যেকের জন্যই সহজ অভ্যর্থনা আছে ; কিন্তু কারুর জন্যই বিশেষ আবাহন নেই। বিজ্ঞাপনও যেমন নেই, কোলাহলও তেমনি নেই। আছে এক অখণ্ড অপরূপ শান্তির প্রবাহ।

অথচ রমণাশ্রমে উৎসবের অভাব নেই। এই সব উৎসবে সমারোহও বড় কম হয় না। কার্তি'কী উৎসবে, জন্মদিনের জয়ন্তী দিবসে এবং মাতৃপ্রয়াণের মহাপূজা উপলক্ষে প্রতি বৎসরেই অসংখ্য লোকের সমাগম হয়। হাজারে হাজারে দেশ-দেশান্তরের অতিথি অভ্যাগত ভোজ্য পানীয় লাভে পরিতৃপ্ত হয়। বাদ্যে, সঙ্গীতে, সংকীর্তনে, আলোকে-পুলকে, বহুকণ্ঠের উল্লসিত কলরবে অরুণাচলের পাদদেশ হ'য়ে ওঠে মুখরিত। এই সমস্ত উৎসবের কালে মহর্ষিকে দেখে মনে হয় তিনিও যেন বহু অতিথির মধ্যে নিজেও একজন অতিথি। প্রত্যেকের অভাব অভিযোগের প্রতি তাঁর দৃষ্টি থাকে। তিনি নিজে আহারে বসেন সকলের শেষে। সকলকে নিয়ে যিনি, তাঁর তৃপ্তি সকলকে তৃপ্ত ক'রে।

জন্মদিনের জয়ন্তী উৎসবে পুষ্পমাল্যের স্তূপ জমে যায়। মাল্য-চন্দনে বিভূষিত ক'রে আল্পনা-আঁকা উৎসব-বেদিকায় মহর্ষিকে এনে বসানো হয়। সুবোধ শান্ত শিশুর মত মহর্ষি সভায় এসে বসেন। তাঁর চারিদিকে এই দিনটিতে যেন আনন্দের হাট বসে যায়। দলে দলে স্বেচ্ছাসেবকেরা অতিথি সৎকারের সেবাকার্যে এসে যোগ দেয়। এদের মধ্যে স্থানীয় বিদ্যায়তনের শিক্ষক ও ছাত্রেরাই হয় অগ্রণী।

আশ্রমের প্রাত্যহিক ব্যবস্থার মধ্যেও মহর্ষির জন্য কোনরকম

বিশেষ বন্দোবস্ত হবার উপায় নেই। নিজস্ব বলতে যাঁর কিছু নেই, সবার অন্তরে অন্তর্যামীরূপে যাঁর অধিষ্ঠান—তিনি কেমন ক'রে নিজেকে আর সকলের কাছ থেকে আলাদা ক'রে দেখবেন? সমস্ত মানুষের সমগ্র অস্তিত্বের মাঝখানে যাঁর নিজস্ব ব্যক্তিগত সত্ত্বার নিঃশেষে মৃত্যু হয়েছে, তিনি আর নিজের বিশিষ্ট খণ্ড-সত্ত্বাটুকুর পরিচর্যা করবেন কি ক'রে? তাই দেখি, মহর্ষি রমণ আশ্রমের যাবতীয় ব্যাপারেও 'সবার মাঝে, সবার সাথে'—আর সকলের মতই থাকেন। আশ্রমে শত শত অতিথি যখন খেতে বসে, তিনিও বসেন তাদের মাঝখানে, তাদেরই পাশটিতে। সবাইকার খাওয়া শুরু হ'লে তবে তিনি নিজে খেতে আরম্ভ করেন। সবাই যা খায় তার অতিরিক্ত কোন বস্তু তাঁকে দেবার উপায় নেই।

হয়তো কোন ভক্ত, মহর্ষির এই নিয়ম নিষ্ঠার কথা না জেনে, বিশেষ ক'রে মহর্ষি'র জন্যই, কোন একটি সুখাদ্য নিয়ে হাজির হ'ল। পরিমাণে বেশি থাকলে সেই খাদ্যটুকু সমবেত মণ্ডলির প্রত্যেকটি লোককে সমানভাবে বণ্টন ক'রে দিয়ে, নিজে আর সকলের মত একটি ভাগ গ্রহণ করবেন। আর যদি সেভাবে ভাগ করা সম্ভব না হয়, সে খাদ্য মহর্ষি স্পর্শও করেন না। মহর্ষি'র সম্মুখে কেউ হয়ত সামান্য একটু খাদ্য বা পানীয় এনে রাখলো। ভক্তের একান্ত ইচ্ছা মহর্ষি স্বয়ং এই শ্রদ্ধার দানটুকু গ্রহণ করেন। মহর্ষি বললেন, 'তোমার খাবার না খেয়েও তো আমি ভালই আছি। সবাই যদি না খায়, আমিই বা একা এ খাবার খাবো কি ক'রে? তার চেয়ে এক কাজ করো—ছেলেরা আছে, তাদের দিয়ে দাও। তারা খেলেই আমার খাওয়া হ'ল।' এখানে বলে রাখা যেতে পারে যে মহর্ষি'র পরিভাষায় 'ছেলেরা' বলতে শুধু মানব সন্তানদের বোঝায় না। আশ্রমের পোষ্য হিসাবে যে কুকুরের দল বংশানুক্রমে এখানে বসবাস করে, প্রধানত তাদেরই বোঝায়।

আহার সম্বন্ধে মহর্ষি'র নীতি হ'ল সন্তোষ। খাদ্যদ্রব্য ভালো

কি মন্দ এ বিষয়ে তাঁর বিচার নেই। ভালো লাগছে কি লাগছে না তা তাঁর খাওয়ার ধরন দেখে কোনদিনই বোঝবার উপায় থাকে না। কিন্তু কোন কারণে, কোন অবস্থার একটি নিয়মের ব্যতিক্রম কখনো কেউ ঘটতে দেখে নি। পাতের খাবার ফেলে রেখে কখনো তিনি উঠে যান নি। ছেলেবেলা থেকে অতি নিষ্ঠাভরে তিনি একটি নিয়ম পালন ক'রে আসছেন যে, কম হোক, বেশি হোক, পরিবেশিত খাদ্য তাঁর পাত্রে অভুক্ত অবস্থায় কখনো পড়ে থাকবে না। এর ফলে, দৈবাৎ কোনদিন যদি তাঁর পাতে অধিক খাদ্য পড়ে যায়, সে দিন মহর্ষিকে বিব্রত বড় কম হতে হয় না। কিন্তু এমনতর অবস্থায় পড়েও, অসীম ধৈর্যে তিনি শেষ বিন্দুটুকু পর্যন্ত গলাধঃকরণ ক'রে তবে আসন ছেড়ে ওঠেন।

ইতিপূর্বে জন্মতিথি উৎসবের যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে তা থেকে একটি প্রশ্ন জাগতে পারে। মহর্ষি—যাঁর মানবীয় সত্তার কিছুমাত্র আর অবশিষ্ট নেই—তাঁকে উৎসব বেদীতে বসিয়ে, পুষ্পমাল্যচন্দনে বিভূষিত ক'রে লোকসমক্ষে খাড়া করবার সার্থকতা কোথায়? দেহ নামক বস্তুটিকে যিনি স্বীকারই করেন না তিনি এই সব লৌকিক অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন কেন? এর উত্তরে এই উৎসব অনুষ্ঠানের গোড়ার দিকের ইতিহাস বলতে হয়। জন্মতিথি উৎসবের পরিকল্পনা করেছিলেন মহর্ষির ভক্তমণ্ডল ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে। মহর্ষি বললেন, 'না, এ উৎসবের কিছুমাত্র অর্থ হয় না। জন্ম এমন একটা ব্যাপারই নয় যা নিয়ে সমারোহ ক'রে উৎসব জমানো যায়। এ দেহটাকে তোমরা এর মধ্যে জড়িও না।'

কিন্তু ভক্তদের উৎসাহ ততক্ষণে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। তাঁরা কিছুতেই হাল ছাড়তে চাইলেন না। সকলে মিলে মহর্ষিকে অনুরোধ উপরোধে উদ্ব্যস্ত ক'রে তুললেন। কথায় কিছু হবে না মনে ক'রে মহর্ষি কাগজে কলমে দিলেন এর উত্তর:

'তোমরা—যারা উৎসব ক'রে জন্মতিথি পালন করতে চাও, জন্মের মূল কোথায় তারই আগে অনুসন্ধান করো।

'সেই হ'ল জন্মতিথি—যেদিন জন্ম-মৃত্যুর অতীত লোকে, অনন্ত সত্তায় মানুষ করে প্রবেশ লাভ।

'যে দিনটিতে মানুষ সংসারে এসে জন্মলাভ করে, অন্তত সেই জন্মতিথির দিনটিতে তার উচিত এই জন্মের জন্য শোক করা।

'এ নিয়ে উৎসবের গৌরব করলে ব্যাপারটা হয়ে ওঠে যেন মহানন্দে শবদেহকে অলঙ্কৃত করার মত অর্থহীন। অনুসন্ধান ক'রে নিজেকে খুঁজে বার করা এবং তার মধ্যেই অবগাহন করা—একেই বলে জ্ঞান।'

শেষ পর্যন্ত এতেও কোন কাজ হ'ল না। ভক্তরা বললেন, 'আমরা তো এখনো জ্ঞানী হ'য়ে উঠিনি। অতএব জন্মদিনে আমরা জন্মেরই উৎসব করবো। মহামানবকে আমরা পেয়েছি আমাদের মাঝখানে এই দিনটিতে। আমরা আনন্দে করবো এই পবিত্র দিনটির সম্বর্ধনা। যে দেহে পরম চৈতন্যের অধিষ্ঠান হয়েছে সে দেহ যদি শবদেহ হয়, তবে সেই শবদেহকেই আমরা বিগ্রহের মত ক'রে পুষ্প-চন্দনে সাজাবো। পূজার অধিকার যখন অজ্ঞানেরও আছে তখন আপনিই বা বাধা দেবেন কেন?'

মহর্ষিকে হার মানতে হলো। জন্মোৎসবের বাৎসরিক ব্যবস্থা কায়েমী হ'য়ে সেই থেকে এখনো পর্যন্ত সমভাবে চলে আসছে। অনেক কাকুতি মিনতি ক'রে মহর্ষি ভক্তদের ভক্তির অত্যাচার থেকে এইটুকু রেহাই পেয়েছেন যে—এই সমস্ত বিশেষ দিনেও রমণাশ্রমের ভক্তবৃন্দ ষোড়শোপচারে মহর্ষির পূজার দাবী করেন না। পাছে বেশি জেদ করলে ভক্তেরা এইটুকু সুবিধাটুকুও প্রত্যাহার ক'রে তাঁকে নিয়ে যা-খুশি-তাই করতে শুরু করে, সেই ভয়ে মহর্ষি আর কথা বলেন নি। ভক্তের হাতে পড়ে সময়ে সময়ে ভগবানকেও তো বড় কম নাকাল হতে হয় না!

উৎসবের দিন ছাড়া .অন্যান্য সব দিনেও মহর্ষির নিজস্ব বলে কোন স্থান বা কোন ক্ষণ নেই। দিবারাত্রির মধ্যে প্রায় কোন সময়েই তিনি লোকচক্ষের আড়ালে থাকেন না। তাঁর কাছে সকলেরই অবাধ গতি। তাঁর কাছে যেতে কোনরকম অনুমতির প্রয়োজন হয় না। যে কোন লোক যে কোন সময়ে তাঁর কাছে গিয়ে হাজির হতে পারে। অধিকারের দিক দিয়ে কেউ কারুর চেয়ে খাটো নয়। দুঃখ সুখের কথাগুলি তাঁর কাছে গিয়ে নিবেদন করতে কারুরই বাধা নেই। একঘর লোকের মাঝখানে মহর্ষি প্রায় সারাক্ষণই বসে থাকেন। লোকে যেমন খুশি আসে, বসে—যতক্ষণ খুশি থাকে, আবার ইচ্ছা হ'লেই উঠে যায়। কেউ বা স্তুতিপাঠ করে, কেউ বা শাস্ত্র আবৃত্তি করে, কেউ বা কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, কেউ বা নিঃশব্দে তাঁর মুখের পানে চেয়ে বসে থাকে। মহর্ষি কখনো বা দু-একটি কথা বলেন—হয় তামিল, নয় ভাঙা ভাঙা ইংরাজিতে। কখনো বা স্তব্ধভাবে নিঃশব্দে বসে থাকেন। কিন্তু মহর্ষির সান্নিধ্য যাঁরা লাভ করেছেন তাঁরা সকলে একবাক্যে এই কথাই বলেন যে নিঃশব্দে থেকেও মহর্ষি তাঁর চারিপার্শ্বে বাণীর বার্তা বিকীরণ করেন। সে বাণী কান দিয়ে হয় তো শোনা যায় না, কিন্তু অন্তরের গভীরে গিয়ে সেই বাণী ভাষাতীত প্রেরণায় ঝঙ্কৃত হ'য়ে ওঠে।

চিরদুঃখিনী লক্ষ্মী অম্মলের জীবন কাহিনীর উল্লেখ ইতিপূর্বেই করা হয়েছে। মহর্ষির বিবরণ যে সময়ে তাঁর কানে প্রথম এসেছিলো তখন তিনি শোকে দুঃখে মুহ্যমান হ'য়ে ছিলেন। বেঁচে থাকার কোন অর্থই তাঁর কাছে ছিল না। এমন সময়ে কে যেন কোথা থেকে এসে তাঁকে পরমতম আশ্বাসের অভয়মন্ত্র শুনিয়ে গেল। লক্ষ্মী অম্মল ছুটে এল মহর্ষির নাম শুনে। কিসের লোভে এল তা সে নিজেও ভাল ক'রে জানে না। 'অরুণাচল পাহাড়ে আছেন এক মৌন তপস্বী—তিনি কারুর সঙ্গে বাক্যালাপ করেন না। অথচ লোকে তাঁর

কাছে এসে জীবনের সব দুঃখ ভুলে যায়।' জনৈক শুভানুধ্যায়ীর মুখে এইটুকু মাত্র লক্ষ্মী অম্মল শুনেছিলেন। শোনার সঙ্গে সঙ্গে কেমন ক'রে যেন তাঁর মনে বিশ্বাসের চেয়ে বড় কি একটা সত্যানুভূতি জেগে উঠেছিল।

প্রথম সাক্ষাতের কালে মহর্ষি ছিলেন মৌন। লক্ষ্মী অম্মলেরও তখন কথা বলার মত অবস্থা ছিল না। কিন্তু এরই মধ্যে মহর্ষি তাঁর যা দেবার তা দিলেন, লক্ষ্মী অম্মলও তাঁর যা কিছু প্রাপ্য নিঃশেষে বুঝে পেলেন। লক্ষ্মী অম্মলের বুকের মধ্যে জ্বলছিলো যে শোকের আগ্নেয়গিরি, যেন কোন মন্ত্র বলে সেই উত্তাপ গেল শান্ত হ'য়ে। বিগত দিনের দুঃখ-শোকের স্মৃতিটুকু পর্যন্ত তাঁর মন থেকে ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেল। এই অলৌকিক রূপান্তরের রহস্য সহজবুদ্ধি দিয়ে অনুধাবন করা না গেলেও, এই ঘটনায় মহর্ষি রমণের অত্যাশ্চর্য প্রভাব খানিকটা অনুমান করা যায়।

মহর্ষির জীবনকাহিনীর মধ্যে যাদের উল্লেখ পাওয়া যায় তাদের সংখ্যা বেশি নয়। লক্ষ্মী অম্মলের দৃষ্টান্ত থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে যদিও ভাগ্যক্রমে একটি মাত্র লক্ষ্মী অম্মলের সাক্ষাৎ পরিচয় আমরা পেয়েছি, মহর্ষি রমণের নিঃশব্দ তপস্যার অলক্ষ্য জীবনের সঙ্গে, লোকচক্ষের অন্তরালে, হয়তো বা সহস্র সহস্র লক্ষ্মী অম্মল আছে জড়িয়ে। কেউ এদের চেনে না—কারণ মানুষ যে চেনা পথ দিয়ে সাধারণত চলে, তা হ'ল বাইরের দৃশ্যজগতের ঘটনাবহুল রাজপথ। সে পথ মহর্ষি বা তাঁর অতি নিকটের লোকগুলির কাছে কোনদিনই পরিচিত নয়। জীবনের যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত, বিপর্যস্ত হ'য়ে যারা শেষ পর্যন্ত মহর্ষির চরণে এসে আশ্রয় নেয়, তারা তাদের পরম-প্রাপ্তির ইতিকথা কৃপণের ধনের মত ক'রে অতি সঙ্গোপনে অন্তর দিয়ে ঢেকে নিঃশব্দে আত্মগোপন ক'রে থাকে। সেসব কথা বাইরে থেকে কে জানবে?

যে দু-একজন ভাগ্যবানের কথা লোকপরম্পরায় ক্বচিৎ জানা যায়, তাদের মধ্যে শান্তাম্মলের কাহিনী বহু কারণে উল্লেখযোগ্য। প্রৌঢ়া বিধবা এই মহিয়সী রমণীর জন্মস্থান ছিল রামনাদে। দূর থেকে মহর্ষির অনুপম তপস্যার কিছু কিছু বিবরণ তিনি শুনেছিলেন। কেমন ক'রে যেন মহর্ষির চিত্র সম্বলিত জীবন-কাহিনী তাঁর হাতে এসে পড়েছিল। বইখানি পড়ে তাঁর মনে হ'ল তিনি যেন তাঁর জীবনের উপাস্য দেবতার সন্ধান পেলেন। মনে হ'ল এই পরমাশ্চর্য গ্রন্থখানির পাতায় পাতায় যেসব ঘটনার উল্লেখ আছে তার প্রত্যেকটি সত্য; যাঁর কথা লেখা আছে তিনি যেন সমস্ত ঘটনাকে ছাপিয়ে সত্য-স্বরূপ হ'য়ে উঠেছেন। বই থেকে মহর্ষির ছবিখানি বিচ্ছিন্ন ক'রে নিয়ে, ইষ্টদেবতার স্থলাভিষিক্ত ক'রে শান্তাম্মল তাঁরই পূজা করতে লাগলেন।

অত্যল্প কালের মধ্যেই ছবিখানি তাঁর অন্তরলোকে জীবন্ত হ'য়ে উঠলো। জাগ্রত অবস্থায় ধ্যানরূপে, নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্নযোগে, তিনি আনন্দ সাগরে মহর্ষির প্রসাদে অবগাহন করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত এমন হ'য়ে উঠলো তাঁর ভক্তির আকর্ষণ যে গৃহসংসার সমস্ত পরিত্যাগ ক'রে তিনি রমণাশ্রমে—তাঁর কামনার স্বর্গলোকে গিয়ে আশ্রয় নিলেন।

সেখানে গিয়ে সমগ্র মনপ্রাণ ঢেলে তিনি মহর্ষির সেবা ও আশ্রমের পরিচর্যায় করলেন আত্মনিবেদন। কয়েকটি বৎসর ধ'রে চললো এই আত্মবিলুপ্ত তপশ্চর্যা। এই সময়ের মধ্যে, কথিত আছে, তিনি বহুবিধ আধ্যাত্মিক সম্পদ লাভ করেছিলেন। উন্মীলিত অথবা নিমীলিত চক্ষে তিনি সদাসর্বদাই অপরূপ জ্যোতির দর্শন পেতেন। কখনো বা দেখতেন জ্যোতির্ময় শুভ্ররূপে মহর্ষি তাঁর চোখের সামনে বিরাজ করছেন। এই সমস্ত অলৌকিক দর্শনের কাহিনী তাঁর মুখে শুনে মহর্ষি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বলেছিলেন, 'মনঃকল্পিত এই সব দর্শনকে আমল দিও না। মনের খেলা ছাড়া এগুলি আর কিছুই নয়।

জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল আত্মজ্ঞান লাভ। এরাই তার প্রতিবন্ধক। চোখের সামনে যা ঘটবার ঘটে যাক। তা নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার কোন হেতু নেই। চঞ্চল মনের পিছনে আছে যে অচঞ্চল স্থির সত্ত্বার গভীর লোক—সেইখানে পৌঁছে তোমাকে স্থিতিলাভ করতে হবে। সেই কথা মনে রেখে এই সমস্ত ক্ষণচঞ্চল দৃশ্যপটকে অতিক্রম ক'রে তোমাকে অগ্রসর হ'তে হবে।'

শান্তাম্মলের জীবনে মহর্ষির ধ্রুব নির্দেশ সত্যে পরিণত হয়েছিল। মহর্ষি নির্দিষ্ট পথে তিনি পরম শান্তির অধিকারিণী হয়েছিলেন। আরও কি হয়েছিলেন—তা কে জানবে?

প্রসঙ্গক্রমে, মহর্ষির জীবনধারার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত না হ'লেও, আর একটি অদ্ভুত মানুষের কথা এর আগেই বলা উচিত ছিল। মানুষটির নাম শেষাদ্রি বা শেষাদ্রিস্বামী, পরিচয়—বলার মত কিছু নয়। উত্তর আর্কট জেলায় তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে। পিতামাতা কতদিন বেঁচে ছিলেন সে খবর জানা যায় না। শেষাদ্রি মানুষ হয়েছিলেন মায়ের মামার বাড়ি। সংস্কৃত সাহিত্য দর্শন পুরাণে বেশ খানিকটা ব্যুৎপত্তিও লাভ করেছিলেন। বালক বয়সেই তিনি কামাক্ষী দেবীর ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন এবং মাত্র সতেরো বছর বয়সেই গৃহসংসারের আবেষ্টন পরিত্যাগ ক'রে শ্মশানে মশানে ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন। দিনের পর দিন যেখানে সেখানে পড়ে থেকে এই বালক তপস্বীর আকৃতি প্রকৃতি হয়ে উঠেছিল পাগলের মত। না ছিল আহারের, না ছিল বাসস্থানের কোন ঠিক-ঠিকানা। শোনা যায় তিনি নাকি শক্তি সাধনায় সিদ্ধির পথে অনেকদূর এগিয়েছিলেন এবং কিছু কিছু শক্তির স্ফুরণও নাকি তাঁর মধ্যে এই বয়সেই দেখা গিয়েছিল।

কিন্তু এই মানুষটির হাবভাব ধরনধারন দেখে লোকে এঁকে পাগল বলেই ধরে নিয়েছিল। লোকের দোষ দেয়া যায় না। অনাহারে, অনিদ্রায়, কখনো গাছতলায়, কখনো গোরস্থানে পড়ে

থেকে থেকে চেহারাটি হয়ে উঠেছিল সত্যিই অপরূপ। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া রুক্ষ চুলের বোঝা, পরনে শতচ্ছিন্ন মলিন বস্ত্রখণ্ড দেখে ছোট ছোট ছেলের দল লাগলো এঁর পিছনে। ফলে, বিষম বিরক্ত হ'য়ে শেষাদ্রি জন্মভূমির মায়া ত্যাগ ক'রে দেশদেশান্তরে ভবঘুরের মত ঘুরতে ঘুরতে অরুণাচলের পাদদেশে এসে উপস্থিত হলেন এবং তাঁর গৃহহীন বন্ধনহীন মন এই স্থানটির আকর্ষণে বাঁধা পড়ে গেল।

মহর্ষি রমণের জন্ম হয়েছিল ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বর। শেষাদ্রি মহর্ষির চেয়ে নয় বৎসরের বড়। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে যখন শেষাদ্রি অরুণাচলের ছায়ায় এসে উপস্থিত হলেন, তখন মহর্ষি বালক মাত্র। তখনো মহর্ষির কাছে অরুণাচল পর্বত স্বপ্নের মত সুদূর। কিন্তু যখন দেখা যায় চির উদাসীন, অনন্তকালের পথিক—এই ক্ষ্যাপা মানুষটি ঘুরতে ঘুরতে এসে, মহর্ষির আগমনের ছয় বৎসর আগে থেকে সেই অরুণাচলেই রইলেন জড়িয়ে, তখন কেমন ক'রে যেন মনে হয় এই দুজনের মধ্যে কি একটা অস্ফুট যোগাযোগের সূত্র ছিল। দুজনে দু-পথ দিয়ে এলেন সেই একই রঙ্গমঞ্চে। প্রায় একই বয়সে দুজনের বুকে দোলা দিল নাম-না-জানা অরূপের বিপুল আকর্ষণ। নেপথ্যে যেন কি একটা নিগূঢ় ষড়যন্ত্র চলছিল এই দুটি অসামান্য মানুষকে কেন্দ্র ক'রে। এর অতিরিক্ত আর কিছু জোর ক'রে বলবার উপায় না থাকলেও এদের সম্বন্ধটি লক্ষ্য ক'রে দেখবার মত।

অরুণাচলের নামটি মাত্র শুনে, বালক রমণ উন্মাদের মত যখন এই অরুণাচলের বক্ষে এসে আশ্রয় নিলেন, তখন বিশাল বিশ্বে তিনি নিঃসঙ্গ, একক। মুণ্ডিতমস্তক, কৌপীনধারী এই নবীন সন্ন্যাসীকে দেখে শিশুবালকের দল পুলকিত হ'য়ে উঠলো। ইতিপূর্বে তাদের মজার আসর জমিয়ে রেখেছিলেন শেষাদ্রি। এবার তারা আর একটি নতুন খেলনা পেয়ে মহানন্দে মেতে উঠলো। শেষাদ্রির গায়ে ইট-পাটকেল ছুঁড়লে শেষাদ্রি চুপ ক'রে সহ্য করতেন না। কাজেই

শেষাদ্রিকে নিয়ে এই খেলা একেবারে নিরাপদ ছিল না। কিন্তু মৌন মহর্ষির বাহ্যজ্ঞান ছিলো না বললেই হয়। অতএব খেলাটা সহজেই জমে উঠতো। মহর্ষি নির্বাক নিস্পন্দ অবস্থায় সহস্রস্তম্ভ মন্দিরের প্রাঙ্গনে বসে থাকতেন আর ছোট ছেলেরা দলবদ্ধ হ'য়ে মনের সুখে তাঁর সারা দেহে ধূলা বালি বর্ষণ ক'রে মজা দেখতো।

এই সময়ে, লোহা যেমন ক'রে চুম্বকের টানে তার কাছে সরে আসে, শেষাদ্রি স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে গ্রহণ করতেন তাঁর দেহরক্ষার দায়িত্ব। মহর্ষি অচেতন হ'য়ে অবস্থান করতেন এবং মাতা যেমন ক'রে সন্তানের প্রতি সজাগ দৃষ্টির প্রহরায় নিযুক্ত থাকেন, ঠিক তেমনি ক'রেই শেষাদ্রি তাঁর স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কর্তব্য ক'রে যেতেন। মহর্ষির আসল পরিচয়টি সম্পূর্ণ না হলেও, কিছু কিছু হয়তো শেষাদ্রি জানতেন। অন্ততঃ তাঁর কথাবার্তার ভাবভঙ্গি থেকে এই কথাটাই মনে হয়।

শেষাদ্রি যে কোনদিন মহর্ষির খুব কাছাকাছি এসেছিলেন বা নিবিড়ভাবে তাঁর সাহচর্য লাভ করেছিলেন, এমন কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। তবে, নিজের দেহটি পর্যন্ত যাঁর কাছে নিজের বলে মনে হয় নি, তাঁর সম্পর্কে এ কথাই তো ওঠে না। মহর্ষির কাছাকাছি আসার দুর্লভ সৌভাগ্য তাঁর তথাকথিত পার্শ্বচরবৃন্দের মধ্যেই বা পেয়েছেন কয় জন? এ কথাও ঠিক যে শেষাদ্রিও যেন একটু দূরে দূরে, আড়ালে আড়ালে থাকতেই পছন্দ করতেন। যাদের প্রতি তিনি প্রসন্ন হতেন তাদেরই টেনে আনতে চাইতেন মহর্ষি সন্নিধানে। তাঁকে যারা শ্রদ্ধা করতো—তাদের সবাইকে তিনি মহর্ষির দিকে ঠেলে দেবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। বলতেন, 'আমার কাছে নয়! আমি যাঁর ছোট ভাই, তাঁর হাতে আছে অমৃতের পূর্ণ পাত্র। আমি বলছি, তোমরা তাঁরই শ্রীচরণে গিয়ে আশ্রয় নাও!'

ভাবতে ভাল লাগে এই স্বভাবগম্ভীর স্বল্পভাষী চির উদাসীন অদ্ভুত মানুষটির কথা। মহর্ষির কাছে শেষাদ্রির নিজস্ব চাওয়া পাওয়ার

পরিমাণ কতখানি তা জানবার উপায় নেই। কোনরকম ঘনিষ্ঠতা করবার চেষ্টা না ক'রেও শেষাদ্রি যেমন ক'রে দূরে থেকেও মহর্ষি'র এতটুকু সেবা, এতটুকু আনুকূল্য করতে পেলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করতো, তাতে মনে হয় যে এই দুটি মানুষের মাঝখানে সবার দৃষ্টির আড়াল দিয়ে নিরন্তর প্রবাহিত হ'ত একটি অন্তঃসলিলা ফল্গুধারা। অন্তরঙ্গতার বহিঃপ্রকাশ ছিলো না বলেই হয়তো বা এই দুজনের সম্বন্ধটি যেন রহস্যে, সৌন্দর্যে, মাধুর্যে অধিকতর রমণীয় হ'য়ে ওঠে।

লিখিত বর্ণনায় যতটুকু বিবরণ পাওয়া যায়, তাতে মহর্ষি'র সঙ্গে শেষাদ্রির কথোপকথনের একটুখানি নমুনা এইরূপ। ঘটনাটি বলবার আগে প্রথমেই জানা দরকার যে শেষাদ্রির মধ্যে কিছু কিছু অলৌকিক ক্ষমতার স্ফুরণ পরিদৃষ্ট হ'ত। তিনি অভ্রান্ত ভাবে লোকের মনের কথা জানতে পারতেন এবং অনেক সময়ে তাঁর এই আশ্চর্য ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে লোকে স্তম্ভিত হ'য়ে যেতো। মহর্ষি যে সময়ে আম্রকুঞ্জে অবস্থান করছেন সেই সময়ে একটা সন্ধ্যাকালে শেষাদ্রি, কি মনে ক'রে, মহর্ষি'র সামনে এসে বসলেন। কিছুক্ষণ আপন মনে চিন্তা ক'রে শেষাদ্রি স্বগতোক্তি করলেন, 'এ লোকটির মনের খবর কিছুই বোঝবার উপায় নেই!'

মহর্ষি পূর্বের মত রইলেন নিস্তব্ধ হয়ে। আরও কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে শেষাদ্রি পুনরায় স্বগত ভাবে বললেন, 'অরুণাচলকে পূজা করলে তিনি মুক্তি দেবেন।' কথাগুলি খাপছাড়া, ধরনটিও জিজ্ঞাসার নয়। হঠাৎ এ কথা কি প্রসঙ্গে এলো—কেন তিনি সহসা এই কথাগুলি উচ্চারণ করলেন তাও পরিস্ফুট নয়। কিন্তু মহর্ষি এই উক্তিকে নিঃশব্দে উপেক্ষা করতে পারলেন না। মহর্ষি বললেন, 'পূজা যে করে সে কে, এবং পূজা যে গ্রহণ করে—সেই ব্যক্তিটিই বা কে?

শেষাদ্রি হয়তো বুঝলেন যে তাঁর নিজের মনের ভাব মহর্ষি'র

কাছে ধরা পড়ে গেছে। হো হো ক'রে হেসে তিনি বললেন, 'সেইখানেই তো হয়েছে বিপদ। সেই কথাটাই তো ঠিক ধরা যাচ্ছে না।'

মহর্ষি ধীর ভাবে তাঁর নিজের উপলব্ধিগত সমাধানের কথা বলতে লাগলেন। অন্ধকার রাত্রি উৎকর্ণ হ'য়ে শুনতে লাগলো অদ্বৈতবাদের নিগূঢ় রহস্য। আম্রবনের পুঞ্জীভূত ছায়ার বক্ষে কখন এসে পড়লো এক ফালি জ্যোৎস্নার আলো। মহর্ষির কথা শেষ হ'ল অনেক রাত্রে। শেষাদ্রি বিমূঢ়ভাবে সমস্ত কথা শুনলেন। শেষে বললেন, 'কি জানি! এসব কথার কিছুই যেন বুঝলাম না। কার পূজা, কেন পূজা—কে পূজা করে, কেমন ক'রে পূজা করে, তাও আমি বুঝি না বলেই বুঝিয়ে বলতে পারবো না। কিন্তু এ কথা অন্তত ঠিক যে আমি পূজা করি।'

কথা কয়টি বলে শেষাদ্রি নিঃশব্দে গাত্রোত্থান করলেন। তারপরে, সেই ঘনান্ধকার বনচ্ছায়াতলে অরুণগিরির শিখরের উদ্দেশে ভূলুণ্ঠিত দেহে করলেন প্রণিপাত। একবার, দুবার থেকে শুরু ক'রে অসংখ্যবার এই ভাবে প্রণিপাত ক'রে নির্জন গিরিপথ ধরে একা একা নিঃশব্দে ফিরে চলে গেলেন।

এর পরে আর একবার মাত্র শেষাদ্রির দেখা পাওয়া যায়—মৃত্যুর কোলে। মহর্ষি স্বয়ং তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় উপস্থিত ছিলেন।

মহর্ষি এবং তাঁর পার্ষদগণের কাহিনী বলতে গিয়ে, প্রসঙ্গক্রমে আশ্রমের বিচিত্র ইতিহাসের কথাটিও বাদ দেওয়া যায় না। বলা বাহুল্য আশ্রমের প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে রমণের ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত কোনরকম প্রচেষ্টাই ছিল না। কোথা থেকে অনাহূত মানুষগুলি দেশ-বিদেশের শ্রদ্ধা-প্রীতির অর্ঘ্য নিয়ে একে একে এসে হাজির হ'ল—আর কেমন ক'রে তাদের নিজেদের প্রয়োজনে ধীরে ধীরে গড়ে তুললে বর্তমানের আশ্রম, তার সঠিক বিবরণ সংগ্রহ করা কঠিন। অরুণাচলের

গুহায় বা আম্রকুঞ্জের পর্ণকুটিরে অবস্থান কালে মহর্ষির নিজস্ব প্রয়োজন বলে যেমন কিছু ছিল না, চিরদিন চলে এসেছে ঠিক সেই একই ভাবে। যে আশ্রমের প্রথম অবস্থায় ছিল খড়ের চালাঘর, সেই আশ্রম যেন তার নিজের প্রয়োজনেই ধীরে ধীরে পাকা ঘরে পরিণত হয়েছে। আবেষ্টনের এই আমূল পরিবর্তনের মাঝখানেও মহর্ষি কিন্তু যেমনটি ছিলেন ঠিক তেমনটিই আছেন। কোন কিছুর সঙ্গেই তাঁর যোগ নেই।

এই আশ্রমকে অক্লান্ত পরিশ্রমে যারা গড়ে তুলেছে তাদের পরিচয় কোথাও লেখা নেই। যারা পাহাড় কেটে মাথায় ক'রে এনেছে পাথরের বোঝা, নিজের হাতে কোদাল চালিয়ে তৈরি করেছে আশ্রমের উদ্যান, ইট কাঠ বালির সংযোগে গড়ে তুলেছে আশ্রম-গৃহ, তারা কেউই সাধারণ শ্রমিক নয়। তাদের মধ্যে আছে ব্যবহার-জীবী, অধ্যাপক, শিক্ষক, রাজকর্মচারি, জমিদার, পুলিশের দারোগা, ডাক্তার, বৈজ্ঞানিক এবং ছাত্র। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ত্যাগে, আত্মবিলুপ্ত শ্রদ্ধায়, বহুজনের প্রীতি-প্রসন্ন অন্তরের পরিপূর্ণ প্রেরণায় যেভাবে রমণাশ্রমের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সে কাহিনী যারা জানে না তারা সহজে ধারণা করতেও পারবে না।

অথচ যাঁকে কেন্দ্র গড়ে উঠেছে এই আশ্রম, তিনি যেন সবার মাঝে থেকেও রয়ে গেছেন সবার আড়ালে। আশ্রমে যত চিঠি আসে, আশ্রম থেকে যত চিঠি যায়—প্রত্যেকটি পায় তাঁর হাতের স্পর্শ। দিনের পর দিন আশ্রমে যারা আসে, তারা দেখে—মহর্ষি স্বয়ং যেন তাদেরই একজন। তিনি কারুর গুরু নন, কেউ তাঁর শিষ্য নয়। এ আশ্রমে মহর্ষি রমণের নিজস্ব বলতে কিছু নেই। ক্ষণিকের পান্থশালায় আর সকলের যতটুকু অধিকার আছে—তার চেয়ে বেশি অতিরিক্ত কোন অধিকারের দাবি তাঁর নেই। আপনার কেউ নেই, পরও কেউ নেই।

কিন্তু এই নির্বিকার নিরপেক্ষ ভাবটুকুই মহর্ষি চরিত্রের শেষ কথা নয়। একদিকে যিনি অতিমানব, আর এক দিকে তিনিই আবার মানবীয় করুণা ও কোমলতার অবতার। যে অখণ্ড অদ্বৈতবাদী আত্মসত্ত্বার বহির্ভূত কোন কিছুরই অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তাঁর স্নেহ-নির্ঝরিনীর তুষার গলা বারিধারা অজস্রভাবে ঝরে পড়ে রমণাশ্রমের প্রত্যেকটি বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী, নরনারীর উপরে সমভাবে। লক্ষ্মী নাম্নী আশ্রম ধেনুটির কথা ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে। মহর্ষির আদর পাবার লোভে এই সুরভি তাঁর পিছনে ঘুরে বেড়ায়। কাঠবিড়ালিরা নির্ভয়ে তাঁর কোলে উঠে খেলা করে। বন থেকে চিতাবাঘের বাচ্চারা বিড়ালছানার মত এসে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে। বানর ও কুকুরগুলি মহানন্দে তাঁর চারিপাশে আনন্দের হাট বসিয়ে দেয়। মহর্ষি যদি কেবল শুষ্ক জ্ঞানীই হতেন, তাহলে তাঁকে ঘিরে এত আনন্দের উৎসব সম্ভব হ'ত কি ক'রে?

এ কথা অবশ্য ঠিক যে সচরাচর মহর্ষি আপনমনে একান্ত নিঃশব্দে থাকতেই ভালবাসেন। এই নির্জন মৌনতা কিন্তু ভাষাহীন নয়। প্রশ্ন-ভারাক্রান্ত অন্তর নিয়ে যারা যখনই মহর্ষির কাছে গেছে, তারাই একবাক্যে স্বীকার করেছে যে মহর্ষির মৌনতা তাদের অন্তরে গিয়ে কথা বলেছে। সাধু সন্ন্যাসীর কাছে গিয়ে দুটো চারটে ভাল ভাল জ্ঞানের কথা শুনে আসবার লোভ অনেকেরই থাকে। কিছু বা ধর্মালোচনা কিছু বা উপদেশ লোকে শুনতে চায়। হয়তো বা এরও প্রয়োজন এবং সার্থকতা আছে। মহর্ষির নিশ্ছিদ্র মৌনতায় হাঁপিয়ে উঠে একবার জনৈক আগন্তুক সোজাসুজি তাঁকে এই কথাটাই জিজ্ঞাসা করেছিলেন। উত্তরে মহর্ষি বলেছিলেন, 'জানলে কি ক'রে যে কথা বলি না? সভায় দাঁড়িয়ে কথার স্রোত বইয়ে দিলেই তো আর জানানো যায় না! জ্ঞান সংক্রামিত হয় মৌনতার মাধ্যমে। ঘণ্টাখানেক বসে, কান পেতে, কতকগুলি বাছাবাছা কথা শুনলেই

তো আর জীবনের চিরন্তন ধারাটি বদলে যায় না! শোনার সময়কার মনোযোগ, বিযুক্ত মনের কাছে হ'য়ে যায় অর্থহীন। কিন্তু মৌনতার প্রভাব নিঃশব্দে কার্য করে অন্তরের গভীরে। জীবনের ধারাটি যায় একেবারে বদলে। কথার মূলে আছে চৈতন্যসত্ত্বা। মাঝখানে আছে চিন্তা। কথাও যখন থাকে না, চিন্তাও যখন স্তব্ধ হ'য়ে থাকে, তখন চৈতন্যসত্ত্বার শাশ্বত তরঙ্গ বিস্তার করে তার ভাষাহীন বাণী। অন্তরের কূলে কূলে আছড়ে পড়ে সেই মৌনতার ভাবধারা। চৈতন্যে চৈতন্যে ঘটে বাণীর বিনিময়। তোমরা যাকে লোকশিক্ষা দেওয়া বলো—তা আমার কাছে একান্ত অর্থহীন বলেই আমি মৌন হয়ে থাকি।'

শ্রীযুক্ত নীলকান্ত নামে জনৈক তামিল ভক্ত মহর্ষির সান্নিধ্যে এক রাত্রি অতিবাহিত ক'রে সকালে উঠে দেখলেন মহর্ষি খুশি মুখে তরকারির ঝুড়ি সামনে নিয়ে কুটনো কুটতে বসেছেন। আশে পাশে তৃতীয় ব্যক্তিকে না দেখে নীলকান্ত আশ্বস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: 'জগতের দুঃখ দুর্দশার প্রতিকার হবে কি ক'রে?' বোধ হয় প্রশ্নকর্তার মনের ভাবটি ছিল এইরূপ: 'বুঝলাম এটি আশ্রম, মানলাম আপনি মহর্ষি। এখানকার আকাশে বাতাসে আছে শান্তির প্রলেপ। এও স্বাভাবিক। স্বয়ং মহর্ষি হ'য়েও আপনি কুটনো কুটতে বসেছেন, তাও দেখতে পাচ্ছি। এখানে উদ্বেগ নেই, অশান্তি নেই, দুশ্চিন্তা নেই—কর্মজগতের কর্কশ কোলাহল নেই। কিন্তু সমস্ত জগতটা তো আর আশ্রম নয়! পৃথিবীতে দুঃখ আছে, বেদনা আছে। আর্ত প্রপীড়িত জনগণের বেদনামথিত ক্রন্দনকে আপনি উপেক্ষা করতে পারেন না!'

মহর্ষি মুখ তুলে চাইলেন। মুখভাবে আলো-ছায়ার মত জড়িয়ে ছিলো করুণার সঙ্গে মেশা প্রচ্ছন্ন একটুখানি ব্যঙ্গের হাসি। বললেন, 'কোন জগতের কথা বলছো?'

নীলকান্ত বললেন, 'বিশাল মানবতার কথা। সেখানে দুঃখের বোঝা হ'য়ে উঠছে ভারী; শ্রমক্লান্ত পৃথিবী অসন্তোষে ও হতাশায় হ'য়ে

উঠছে জর্জরিত। এই বিপুল বেদনার কি প্রতিকার নেই?' মহর্ষি বললেন, 'জগতের সমস্যার কথা ভাববার আগে আত্মসমস্যার মীমাংসা কি করলে, তাই বলো। দুঃখ কি তোমারই কিছু কম?' এ কথার উত্তরে বলবার মত কিছু না পেয়ে নীলকান্ত নিরুত্তর হ'য়ে রইলেন।

কথার জালে জড়িয়ে গিয়ে মানুষ যে অহরহই নিজের মনে সমস্যার জটিলতা গড়ে তোলে, একথা মহর্ষি জানেন বলেই শাণিত ব্যঙ্গের খড়্গাঘাতে তিনি অর্থহীন উচ্ছ্বাসের অতিশয়োক্তিকে মাঝে মাঝে এইভাবে করেন শাসন। আত্ম স্বরূপকে না জেনে মানুষ নেয় কল্পনার আশ্রয়। আপন মনে গড়ে, আপন মনে ভাঙে। বাইরের চোখ দিয়ে দেখে গুরুকে, বাইরের দিকে চেয়ে আহ্বান করে ভগবানকে। সমস্যা কণ্টকিত দার্শনিক প্রশ্নের সম্মুখীন হয় অথবা স্বেচ্ছায় সমস্যা সৃষ্টি করে, অসার্থক গবেষণায় জীবনকে ক'রে তোলে উদ্‌ভ্রান্ত। ত্যাগ বৈরাগ্যের, উচিত অনুচিতের, ভূত ভবিষ্যতের জল্পনার ছলে মনের উপরে শাস্ত্রের পরে শাস্ত্রের বোঝা চাপিয়ে যতই বিড়ম্বনার সৃষ্টি করে—সত্যবস্তু, আত্মবস্তু ততই দূরে সরে যায়। বস্তুহীন পাত্রটিই তখন শূন্যতার সীমাহীন দম্ভে হ'য়ে থাকে পরিপূর্ণ অথচ অর্থহীন।

বিগত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে স্বল্পভাষী মহর্ষিকেও এই ধরনের যে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়েছে তাদের সংখ্যা বড় কম নয়। সমস্ত প্রশ্ন এবং সমস্ত উত্তর এখানে লিপিবদ্ধ করা যাবে না। অনেকের অনেক ব্যক্তিগত প্রশ্নের উত্তর ছাপার অক্ষরে প্রকাশিতও হয় নি। যেগুলি প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে বেছে সর্বসাধারণের গ্রহণযোগ্য যে কয়েকটি এখানে দেওয়া হ'ল—তা থেকেই মহর্ষির বিশিষ্ট বক্তব্য এবং বিশেষ ভঙ্গির খানিকটা আভাষ পাওয়া যাবে।

প্রশ্ন হল—আত্মসত্তায় পৌঁছানো যাবে কি ক'রে?

উত্তরে মহর্ষি বললেন, 'আত্মসত্তায় পৌঁছাতে হয় না। পৌঁছাবার কথা যদি থাকতো তাহলে বুঝতে হ'ত যে আত্মসত্তা নামধেয় বস্তুটি

এখানে বা এখন নেই ; সে যেন এমন একটি বস্তু যাকে পাওয়ার বাকি আছে। যাকে পেতে হয় তাকে আবার হারাতেও হয়। এমনতর বস্তু অচিরস্থায়ী না হ'য়েই পারে না। আর, যা চিরদিন থাকবে না তাকে পেয়েই বা কি হবে? সেই জন্যই আমি বলি, আত্মসত্ত্বায় পৌঁছাতে হয় না। তুমিই তো আত্মসত্ত্বা—আত্মসত্ত্বাতেই তো তুমি রয়েছ প্রতিষ্ঠিত। সেইটুকু জানলেই সব জানা হয়।'

'অতএব, উপলব্ধিতে অধিকার আছে প্রত্যেকটি মানুষের। যারা জানতে চায়, অধিকারের দিক দিয়ে তাদের প্রত্যেকেই সমান। উপলব্ধির যোগ্যতা তোমার আছে কিনা—এই যে দ্বিধা, এবং তোমার উপলব্ধি হয় নি বলে এই যে ভ্রান্ত ধারণা—এই গুলিই হ'ল বাধা। এই বাধাকে অতিক্রম ক'রে যেতে হবে।'

প্রশ্ন হল—মোক্ষলাভে গৃহস্থের অধিকার কতখানি?

মহর্ষি উত্তর দিলেন, 'নিজেকে তুমি গৃহস্থ বলেই বা ভাবো কেন? সন্ন্যাসী হ'লে তখনো তো তোমার মন জুড়ে এই ভাবটি থাকবে যে তুমি সন্ন্যাসী! গৃহেই থাকো বা বনেই থাকো, মন তোমাকে ভুতের মত ক'রে পেয়ে থাকে। এই অহঙ্কারই তো চিন্তার উৎস। এই থেকেই দেহের সৃষ্টি হয়, জগতের সৃষ্টি হয় এবং শেষ পর্যন্ত তোমার মনে ধারণা জন্মায় যে তুমি গৃহস্থ। সংসার ত্যাগ ক'রে যদি চলে যাও, তখনও বড়জোর, গৃহস্থ-চিন্তাটির স্থলে এসে হাজির হবে সন্ন্যাস-চিন্তাটি—গৃহের স্থান দখল করবে বন। কিন্তু মনের বাধাটি সেখানেও সমভাবে রয়ে যাবে। বরং, অভিনব আবেষ্টনে গিয়ে এই বাধা আরও বড় হ'য়ে উঠবে। পারিপার্শ্বিক বদলালে কি হবে? একমাত্র বাধা হ'ল মন। ঘরেই থাকো আর বনেই যাও—অপসারিত হবে এই বাধাটি। যদি বনে গিয়ে বাধা সরানো যায়—তবে ঘরেই বা তা সম্ভব হবে না কেন? তবে আর পারিপার্শ্বিক বদলাবার দরকার কি? এখনকার পরিস্থিতির মাঝে থেকেও তো চেষ্টা করতে পারো।'

প্রশ্ন হল : এ জন্মের কর্ম কি পরজন্মে প্রতিফলিত হয় ?

মহর্ষি বললেন : তুমি কি এখন জন্মেছ যে জন্মান্তরের চিন্তা তোমাকে পেয়ে বসেছে ! আসলে জন্মও নেই মৃত্যুও নেই। যার জন্ম হয়েছে সে-ই ভাবুক মৃত্যুর কথা অথবা মৃত্যুর প্রতিষেধকের কথা। আত্মচিন্তার পরপারে যে স্থিতিলাভ করতে চায়, তার কাছে এ প্রশ্ন অর্থহীন।

প্রশ্ন হল : নাম জপ করার কালে, মাঝে মাঝে ঘণ্টাখানেকের জন্য ঘুমের মত একটা ভাব এসে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে। জেগে উঠে মনে পড়ে যে আমার জপে বিঘ্ন ঘটেছিল। তখন আবার নূতন ক'রে জপে বসি। কেন এমন হয় ?

মহর্ষি বললেন : ঘুমের মত একটা ভাব ? হ্যাঁ, এমনিই তো হয়। এই তো সত্যিকারের স্বাভাবিক অবস্থা। অহঙ্কার আছে বলেই এই স্বাভাবিক অবস্থাটিকে তোমার কাজের বিঘ্নকর বলে মনে হয়। এমনি ক'রে আত্মবিলোপের অভিজ্ঞতা যত পাকা হ'তে থাকবে, ততই বুঝতে পারবে যে এইটাই হ'ল তোমার স্বাভাবিক স্থিতি। তখন তুমি দেখবে যে, জপ হ'ল বাইরের বস্তু এবং জপ তখন আপনিই চলতে থাকবে তার স্বাভাবিক পরিণতির পথে। তোমার যে বর্তমান দ্বিধা, এর মূলে আছে এই ভ্রান্ত ধারণা যে স্বরূপত তোমার আত্মবস্তু, এবং যে মন জপ করে—তারা এক এবং অভিন্ন। সমস্ত চিন্তাকে বাদ দিয়ে একটি মাত্র চিন্তায় যুক্ত হ'য়ে থাকার নাম জপ। জপের উদ্দেশ্যই হ'ল তাই। এই থেকে ক্রমে ক্রমে আসে ধ্যান, এবং এরই পরিসমাপ্তি হয় আত্মোপলব্ধি অথবা জ্ঞানে।

প্রশ্ন হল : মানুষের কর্তব্য, দায়িত্ব—এ গুলির কি কোন অর্থ নেই ?

উত্তর দিলেন মহর্ষি : গাড়িতে যখন ওঠো, তখনও কি তোমার নিজের বোঝাটি মাথায় ক'রে বইতে থাকো ? ব্রহ্মাণ্ডের প্রভু যিনি, সকলের সব বোঝা তিনিই বহন করেন। তোমার বোঝা যে তুমিই

বইছো, এ তোমার মিথ্যা কল্পনা মাত্র। তোমার সব ভার তুমি তাঁর হাতে নিশ্চিন্ত হয়ে সমর্পণ করতে পারো, কারণ ইচ্ছায় অনিচ্ছায়, জেনে না জেনে, এ সমর্পণ হ'য়েই আছে। তোমার যা কিছু করণীয়, সবই যথা সময়ে তোমাকে দিয়ে করিয়ে নেওয়া হবে। এ কথা ভেবো না যে তোমার ইচ্ছা না হ'লে তোমার দ্বারা নির্দিষ্ট কাজটি হবে না। তোমার ইচ্ছা হ'লেই কি তোমার ব্যক্তিগত ইচ্ছা পূরণের সামর্থ্য হবে? সব শক্তি ঈশ্বরের। তোমার নিজস্ব কোন পৃথক সত্তা বা শক্তিই তো নেই।

মহর্ষির ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে একজন কৌতূহলী হ'য়ে জানতে চাইলেন জীবন্মুক্ত মহর্ষি'র নিজের জীবনে মুক্তির উপলব্ধি এলো কোন পথ দিয়ে। উত্তরে মহর্ষি বললেন: 'আমার জীবনে নূতন কিছু ঘটেছে বলে আমি জানি না। চিরদিন যা ছিলাম আমি ঠিক তাই আছি। বন্ধন ও মুক্তি—এ দু'টিই হ'ল আপেক্ষিক সত্য, অতএব মিথ্যারই নামান্তর। 'আমি বদ্ধজীব'—এই চিন্তা যতক্ষণ আছে, ততক্ষণই আছে মুক্তির চিন্তা। 'কে আমি বদ্ধ হয়ে আছি?'—এই আত্মানুসন্ধানের ফলে যখন চিরমুক্ত আসল সত্তাটি কালাতীত, মরণাতীত রূপে প্রতিভাত হয়, তখন আর বন্ধনের চিন্তার অস্তিত্ব থাকে কেমন ক'রে? আর যদি বন্ধনের চিন্তারই অস্তিত্ব মুছে যায়, তাহলে আবার মুক্তি চিন্তা আসে কি ক'রে?'

আর একটি প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি'র এই বক্তব্যটি আরও সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে। নিজের উপলব্ধির সত্যে তিনি কেন সর্ব-সাধারণকে উদ্বুদ্ধ ক'রে মহামুক্তির পথে টেনে নিয়ে যান না—এই ছিল প্রশ্নকর্ত্তার জিজ্ঞাসার বিষয়।

এর উত্তরে মহর্ষি বললেন, 'মনে করো, ঘুমন্ত অবস্থায় একটি লোক স্বপ্ন দেখলো যে একঘর লোক ঘুমিয়ে আছে। ঘুম ভাঙার পরে উঠে এই লোকটি কি জিজ্ঞাসা করে—'সেই যে ঘুমন্ত লোকগুলিকে

আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম, তারা কি জেগে উঠেছে?' ঠিক এমনি ক'রেই—পৃথিবীর লোকদের নিয়ে মুক্ত পুরুষের কোন কারবার নেই। তবু যদি কেউ বলে, বদ্ধজীবের জগতে জীবন্মুক্তের ব্যক্তিগত মুক্তিলাভে স্বার্থপরতা প্রকাশ পায়, তবে তার উত্তরে, উপরোক্ত উপমাটির পুনরাবৃত্তি ক'রে, আমি বলবো—যে লোকটি স্বপ্নে দেখলো একঘর ঘুমন্ত লোক, সে কি স্বপ্নের মধ্যেই বলবে—'সব ঘুমন্তরা না জাগলে আমি জাগবো না!'

দৈব ও পুরুষকারের মধ্যে সত্য কোনটি—এই প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি বলেছেন: 'যাকে আমরা সচরাচর নিয়তি বলি তার গোড়ার দিকে আছে একটি মূল কারণ বা প্রাথমিক একটি কর্ম। স্বাধীন ইচ্ছাকে স্বীকার না করলে এই কর্মের অর্থ হয় না। অতএব প্রথম কারণ রূপে স্বাধীন ইচ্ছাটিকে বিশেষ ভাবে স্বীকার করতেই হয় এবং একথাও মানতে হয় যে স্বাধীন ইচ্ছার প্রবল প্রয়োগে নিয়তিকে জয় করাও নিশ্চয়ই যায়। এই স্বাধীন ইচ্ছাকে বলিষ্ঠ ক'রে তুলতে হ'লে চাই আত্মজিজ্ঞাসা অথবা অদ্বিতীয় সত্ত্বারূপ ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ। সাধারণত যাকে আমরা আত্মনির্ভরতা ব'লে ভুল করি, সেটা আত্মাভিমান ছাড়া আর কিছুই নয়, এবং তাতে বন্ধনের দশা আরও জটিল হ'য়ে ওঠে। আসল আত্ম-নির্ভরতা হ'ল ঈশ্বর-নির্ভরতা, কারণ তিনিই হলেন প্রকৃত আত্মবস্তু।'

'আত্মসমর্পণ যার হ'য়ে গেছে তার মনে আর দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকে না। অহঙ্কারের বিনাশ হ'য়ে দৈব-পুরুষকারের সমস্যারও পরিসমাপ্তি হ'য়ে যায়। নিম্নতর মনে যে চিন্তা দোলা দেয়, মহামনের মহাকাশে সেই চিন্তা নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যায় মিলিয়ে। এই মিলিয়ে যাওয়াই হ'ল সত্যিকারের আত্মসমর্পণ।'

আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে গুরুর প্রয়োজন কতখানি—এই প্রশ্নটির উত্তরে মহর্ষি যে কথাগুলি বলেছেন তার মধ্যে ভাববার কথা যথেষ্ট আছে।

গুরুকে দেহধারী আর একজন মানুষ বলে দেখলে গুরুকরণের কোন সার্থকতা থাকে না। কারণ বাইরের কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে মহর্ষি, প্রথমত, স্বীকারই করেন না। দ্বিতীয়ত, গুরু যদি অন্তরের অন্তরতম হ'য়ে প্রকটিত না হ'ন, তবে তিনি অন্তরকে আত্মসত্ত্বায় প্রতিষ্ঠিত করবেন কি ক'রে? এ ছাড়া মহর্ষি বলেন: 'পৃথিবীতে এমন কি আছে যা আত্মসত্ত্বার অজানা বা যা আত্মসত্ত্বাকে নতুন করে শিখতে হবে! যা কিছু জানবার তা জানাই আছে; যা কিছু পাবার সব পাওয়াই আছে; যা কিছু হবার হওয়াই আছে। নিজের সাম্রাজ্য বুঝে নেওয়াই যা অপেক্ষা। আর কিছু নয়, কেবল চোখদুটি খুলে দেখা।'

তবে, যদি কেউ নিজেকে লঘু ভাবতে ভাবতে লঘু ভারাক্রান্ত হ'য়ে গিয়ে থাকে, তার পক্ষে গুরুর প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। লঘু বস্তু মাত্রেই প্রবহমান, তা পরিবর্তনশীল স্রোতে ভেসে যায়। মানুষ যখন শাশ্বত আত্মবস্তুর সন্ধান না পেয়ে নিজেকে বস্তু ও ব্যক্তির ভিড়ে হারিয়ে বসে থাকে, তখনই তার প্রয়োজন হয় গুরুতর এমন একটি বস্তুর যা তাকে নিজের প্রবল আকর্ষণে লঘুত্বের ভ্রান্তি থেকে টেনে তুলতে পারে। পরিশেষে দেখা যায় গুরুও নেই শিষ্যও নেই! অন্তর ও বাহিরের দ্বন্দ্ব যখন শেষ হয় তখন বাহিরে একাকার হ'য়ে বিরাজ করেন আত্মসত্ত্বা।

লোকে মহর্ষিকে জিজ্ঞাসা করে—মনকে বশে আনবার পন্থা কি? মহর্ষি বলেন, 'কই দেখাও দেখি তোমার মন!' উত্তর হয়—'মনকে আমি দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু সে তো একটা বস্তু নয় যে বার ক'রে দেখানো যাবে।' মহর্ষি বলেন 'এই তো ভুল বললে। মনকে তুমিও দেখতে পাচ্ছ না। যা দেখছো তা চিন্তার স্রোত। ভাবছো এই চিন্তার স্রোতই তোমার মন। চিন্তাকে আর একটু নিবিষ্টভাবে পরীক্ষা ক'রে দেখলে বুঝতে পারবে যে সে তোমার মন নয়, মনের পটভূমিকায় ভেসে-ওঠা কতকগুলি ব্যক্তি ও বস্তুর ছায়া মাত্র।'

প্রশ্নকর্ত্তা আবার জিজ্ঞাসা করে—'তাই না হয় হ'ল! কিন্তু মন যে চঞ্চল তা তো নিশ্চিত, এবং এই চঞ্চল মনকে সংযত করার যে প্রয়োজন আছে তাও তো নিশ্চিত। এবারে বলুন, এর পন্থা কি?'

উত্তরে মহর্ষি বলেন, 'এই যে বললে চঞ্চল মনকে সংযত করার কথা, এও তো তোমার মনের আর একটি চিন্তা ছাড়া আর কিছুই নয়। যে মন চিন্তা করতে ইচ্ছা ক'রে, চঞ্চল হ'তে ইচ্ছা করে, সেই মনই যখন আবার খেয়ালের বশে স্থির হবার ইচ্ছা করে, তবে তার সদিচ্ছার উপরে নির্ভর করা যায় কি ক'রে? অতএব, মনের দ্বারা অবসান ঘটানো যায় না। মনের উৎস-মুখে অধিষ্ঠান ক'রে কে চিন্তা করছে, কে আবার চিন্তাকে নিরুদ্ধ করবার জন্য উৎসাহ দিচ্ছে—তারই অনুসন্ধান করতে হবে এবং সেইখানে নিশ্চিত হ'য়ে ডুব দিতে হবে। এ ছাড়া অন্য কোন পথ আমার জানা নেই।'

ঈশ্বরের নাম জপে কি হয়—এই প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি বলেন: 'তুমি দেহ নও, তোমার দেহও তোমার আত্মসত্তা নয়। তবু তোমার একটা নাম আছে। এই নাম নিয়ে তুমি জন্মাও নি, একথাও যেমন ঠিক, তেমনি আবার একথাও সত্য যে তোমার নাম ধরে কেউ ডাকলে তুমি স্বভাবতই সাড়া দাও। তেমনি ঈশ্বরের নাম ধরে ডাকলে তিনিও সাড়া দেন।'

উপরোক্ত প্রশ্নোত্তর-মালা থেকে মহর্ষি রমণের বিশিষ্ট মতবাদের ও জীবন দর্শনের একটি নির্ভরযোগ্য পরিচয় পাওয়া যায়। কথাগুলি হয়তো একেবারে নূতন নয়, কিন্তু প্রকাশ-ভঙ্গিটি মৌলিক এবং একান্তভাবে মহর্ষির নিজস্ব। বইয়ের কথা এগুলি নয়, পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণাও এর মধ্যে নেই। প্রত্যক্ষ উপলব্ধির দ্বিধাহীন নিশ্চয়তায় মহর্ষির প্রত্যেকটি উক্তি হ'য়ে উঠেছে প্রাণস্পর্শী।

এই ধরনের মীমাংসা ছাড়াও, মাঝে মাঝে ক্বচিৎ আলোচনা প্রসঙ্গে,

মহর্ষির কথাবার্তার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। স্বভাবসিদ্ধ মৌনতার নিয়ম লঙ্ঘন ক'রে যে দু-একটি ক্ষেত্রে মহর্ষি বিচার বিতর্কে যোগ দিয়েছেন, তারই দৃষ্টান্ত হিসাবে পরবর্তী বিবরণটি কৌতূহলোদ্দীপক, সন্দেহ নেই।

জনৈক পাশ্চাত্য ভক্তের জিজ্ঞাসার উত্তরে মহর্ষি বললেন: 'অজ্ঞানী মনে করে যে এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগত আগাগোড়া সত্য। ইন্দ্রিয়গুলি যে প্রমাণ তার সমক্ষে উপস্থাপিত করে, তাকে সে অস্বীকার করতে পারে না।'

ভক্তটি উত্তর দিলেন: যাকে দেখি, যাকে জানি, তাকে না মানাই বা যায় কি ক'রে? প্রত্যক্ষকে তো আর উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

মহর্ষি বললেন: দেখার কথা বলছো, জানার কথা বলছো! কিন্তু নিজেকে যতক্ষণ না জানো, ততক্ষণ কার দেখার, কার জানার কথা তুমি বলছো? যে দেখে বা যে জানে, তাকে বাদ দিয়ে সেই দেখা বা জানার আসল স্বরূপ তোমার কাছে ধরা পড়তেই পারে না। স্বীকার করি যে তোমার দেহ ও ইন্দ্রিয় বস্তুজগতের সংস্পর্শ লাভ করে। কিন্তু মানার প্রশ্ন, সত্য বলে স্বীকার করার প্রশ্ন যখন ওঠে, তখন কি তোমার দেহ করে সেই প্রশ্ন? দেহ কি বলে, 'যে বস্তুর বোধ পেয়েছি, এ বস্তু কি সত্য?' অথবা জগৎ কি তোমাকে ডাক দিয়ে বলে, 'আমি জগৎ, আমি সত্য?'

ভক্ত: আপনি বলবেন জগৎ স্বপ্নের মত অলীক। জাগ্রত অবস্থায় যে জগতের অস্তিত্বের প্রমাণ পাচ্ছি, তাকে স্বপ্ন বলে উড়িয়ে দিই কেমন ক'রে? স্বপ্ন হ'লে, এখনকার দৃশ্য পরক্ষণে দেখতে পেতাম না; একজনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে আর একজনের অভিজ্ঞতা মিলে যেতো না। স্বপ্ন হ'লে অসঙ্গতি থাকতো।

মহর্ষি: এখন জেগে আছো বলেই তোমার মনে হচ্ছে স্বপ্নের অসঙ্গতির কথা। যখন স্বপ্ন দেখছিলে, তখন স্বপ্ন-জগতের সমস্তটাই

মনে হয়েছিল সুসঙ্গত। স্বপ্নের মাঝেই হ'লে তৃষ্ণার্ত, স্বপ্নের মাঝেই পান করলে জল এবং স্বপ্নের মাঝেই মিটলো তোমার তৃষ্ণা। যতক্ষণ স্বপ্ন ছিলো ততক্ষণ এ সবই মনে হয়েছে যথার্থ। জেগে উঠে তবে বুঝতে পারছো যে তখন যা দেখেছিলে, যা বোধ করেছিলে, যা হয়েছিলে সে সবই ছিলো মিথ্যা স্বপ্নের ব্যাপার। ঠিক তেমনি ক'রে, জাগ্রত অবস্থায় যতক্ষণ রয়েছ পারিপার্শ্বিক সব কিছুকে যথাযথ সত্য বলে তোমার মনে হচ্ছে, তার মধ্যেও কোন অসঙ্গতি তুমি বুঝতে পারছো না। তাই তোমার ধারণা হচ্ছে যে জগৎ সত্য। কিন্তু জগৎ যদি স্বতঃসিদ্ধ সত্য হ'ত, তাহলে স্বপ্নের মধ্যেই বা তার প্রমাণ পাওয়া যাবে না কেন? তোমার অস্তিত্ব যে নিদ্রিত অবস্থাতেও ছিল এ তো তুমি অস্বীকার করতে পার না!

ভক্ত: আমার নিদ্রাকালে জগৎ ছিল না তাও তো আমি বলি না। জগৎ বরাবরই ছিলো। যতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম আমার দেখায় ছেদ পড়েছিল, কিন্তু যারা তখন জেগেছিল তারা দেখেছে।

মহর্ষি: তোমার নিদ্রিত অবস্থায় জগৎ ছিলো প্রমাণ করতে হ'লে তোমাকে নিতে হয় অন্য লোকের সাক্ষ্য, কিন্তু নিদ্রাকালে তোমার নিজের অস্তিত্বেও ব্যাপারটা তো কই সাক্ষ্য প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। তা ছাড়া, ভুলে যাচ্ছো কেন যে অপরের দেওয়া এই সাক্ষ্য তুমি গ্রহণ করছো জেগে উঠে। তোমার নিজের বেলায় ব্যাপারটা হচ্ছে অন্যরূপ। ঘুম থেকে উঠেও তুমি বেশ বলতে পারো তোমার ঘুম কেমন হয়েছিল। ঘুমন্ত অবস্থাতেও তুমি যে নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন ছিলে এই ঘটনাতেই তার প্রমাণ বিদ্যমান। অথচ নিদ্রাকালে জগৎ সম্বন্ধে তোমার কোন চেতনাই ছিল না। এখনও, তোমার সজাগ অবস্থাতেও জগৎ যে সত্য, সে কথা জগৎ বলছে না—বলছো তুমিই।

ভক্ত ঃ আমি বলছি—তা ঠিক, কিন্তু জগতের সম্বন্ধেই তো আমি এ কথা বলছি।

মহর্ষি ঃ বেশ তাই যদি হয়, তবে তো এই কথাটাই দাঁড়ায় যে তুমি নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ হ'য়েও, জগতের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লেগেছো। এটা কি জগতের তরফ থেকে একটা হাসির ব্যাপার নয়? যেমন ক'রে হোক তুমি প্রমাণ করতে চাও যে জগৎ সত্য। সত্যের মানদণ্ড কি? সত্য একমাত্র সেই বস্তু যার অস্তিত্ব স্বয়ংসিদ্ধ—যা স্ব-প্রকাশ যা অনন্ত যা অপরিবর্তনশীল। এইবারে বিচার ক'রে দেখো—

জগৎ কি স্বয়ংসিদ্ধ? মনের সাহায্য ছাড়া একে কি দেখা যায়? সুষুপ্তির কালে মনও থাকে না, জগৎও থাকে না। জেগে উঠলে মনও আসে, জগৎও আসে। এই ঘটনা পারম্পর্যের অর্থ কি?

ভক্ত ঃ আপনিই বলুন এর অর্থ?

মহর্ষি ঃ নিদ্রাকালে যেমন স্বপ্নজগৎ তোমার কাছে সত্য বলে প্রতিভাত হয়, জাগ্রত অবস্থায় তেমনি সত্য বলে প্রতিভাত হয় এই জগৎ। নিদ্রিত অবস্থায় মন ও অহঙ্কারের সঙ্গে একযোগে এই দৃশ্যজগৎও আত্মসত্তায় বিলীন হ'য়ে বীজাকারে অবস্থান করে। জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আত্মসত্তা আড়ালে সরে গিয়ে অহঙ্কার দেহরূপ ধারন করে আর জগৎকে দেখে মোহিত হয়। সুষুপ্তি ও জাগ্রত অবস্থায় সমভাবে জগৎকে প্রত্যক্ষ করে এমন তো কাউকে দেখি না। যদি কেউ থাকে—সে কি দেহ?

ভক্ত ঃ অসম্ভব!

মহর্ষি ঃ তবে সে কি মন?

ভক্ত ঃ নিশ্চয়ই তাই।

মহর্ষি ঃ তাই বা কি ক'রে হয়? সুষুপ্তি কালে তোমার অস্তিত্ব আছে, কিন্তু তখন তোমার মন তো নেই।

ভক্ত : বুঝতে পারছি না। তবে হয়তো সুষুপ্তিকালে আমার অস্তিত্বই লুপ্ত হয়ে যায়।

মহর্ষি : তাই যদি হ'ত—তাহ'লে গত কালের কোন অভিজ্ঞতা আজ তুমি স্মরণে আনতে কি ক'রে? তবে কি তুমি সত্যি সত্যিই বলতে চাও যে তোমার আত্মসত্তার ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়ে আসছে?

ভক্ত : অসম্ভব কি?

মহর্ষি : 'তা হলে তো জন্‌সন্ ঘুমিয়ে জেগে উঠতো বেন্‌সন্ হয়ে! কিন্তু তা তো হয় না। ঘুম থেকে উঠেও তোমার ঘুমের আগেকার পরিচয়টি অবিকৃত থাকে কি ক'রে? তুমি বলো 'আমি ঘুমিয়েছিলাম'—'আমি জেগেছি' অর্থাৎ তুমি হচ্ছো সেই একই ব্যক্তি যে ঘুমের মধ্যে এবং জাগার মধ্যে এক এবং অদ্বিতীয় রূপে বিরাজ করেছে। ঘুম থেকে উঠে তুমি যখন বলো—'আরামে ঘুমিয়েছিলাম'—তখন তার একটিমাত্র অর্থই হয় যে, ঘুমের সম্বন্ধে তোমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা ছিলো। সেই সুখকর অভিজ্ঞতা যার স্মরণে আছে সে নিশ্চয়ই অভিজ্ঞতার মালিক যে—তার সঙ্গে এক এবং অভিন্ন। এইবার তুমি কি বলবে?'

ভক্ত : কি বলবো বুঝতে পারছি না।

মহর্ষি : যদি ঘুমের মধ্যেও জগতের অস্তিত্ব ছিলো, এমন হয়—তাহলে জিজ্ঞাসা করবো জগৎ কি তোমাকে সে কথা তখন বলেছিলো'?

ভক্ত : না, তা বলেনি। কিন্তু জগৎ তো সে কথা আমাকে এখন বলছে। চলতে চলতে পায়ে যখনি পাথর ঠুকে যায় তখনই তো প্রমাণিত হয় যে জগতের অস্তিত্ব কাল্পনিক নয়। আঘাতেই পাই পাথরের প্রমাণ—সঙ্গে সঙ্গে পাই জগতের প্রমাণ, কারণ পাথর তো আর জগৎ-ছাড়া নয়।

মহর্ষি : পাথর যে আছে সে কথা কি পা বলে দেয় ?

ভক্ত : পা বলে না। এ কথা বলি আমি।

মহর্ষি : কে এই আমি ? এ নিশ্চয়ই শরীর নয়, মনও এ হ'তে পারে না। এ হ'ল সেই সাক্ষী—জাগরণ, স্বপ্ন, সুষুপ্তির মধ্যে যে সমভাবে বিদ্যমান আছে। সেই 'আমি,' যে সর্ব অবস্থায় থাকে অপরিবর্তিত। অবস্থা তিনটি আসে আর যায়, কিন্তু এদের মাঝখানে অচল অটল হ'য়ে থাকে এই 'আমি'। এই আমি বা আত্মসত্ত্বাকে উপলব্ধি করলে অসন্তোষের হয় নির্বাণ এবং পরিপূর্ণ আনন্দ হয় করতলগত।'

ভক্ত : কেউ যদি এই অবস্থায় উপনীত হ'য়ে পরিপূর্ণ আনন্দ লাভ করে এবং তার পরে জগৎকে এই লাভের অংশ দিতে না চায়, তাহ'লে কি সেটা স্বার্থপরতা হয় না ?

মহর্ষি : 'এই অবস্থার কথা শুনে তুমিও তো এই অবস্থা নিজেই লাভ করতে পার। তখন তুমিও উপলব্ধি করবে যে আত্মসত্ত্বার বাইরে কোনরূপ বস্তুজগতের অস্তিত্ব নেই। এই উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে তোমারও জ্ঞান হবে যে তোমার ব্যবহৃত এই স্বার্থপরতা কথাটির কোন অর্থ নেই, কারণ তখন তুমি দেখবে যে জগত আত্ম-সত্ত্বায় বিলীন হ'য়ে গেছে।'

ভক্ত : কিন্তু যিনি ঋষি তিনিও তো জানেন যে পৃথিবীতে যুদ্ধ আছে, মৃত্যু আছে, ব্যথা বেদনা আছে। এ জেনেও তিনি আনন্দে থাকেন কি ক'রে ?

মহর্ষি : 'ছায়াচিত্রের পর্দার উপরে কত বন্যার, কত অগ্নিকাণ্ডের দৃশ্য প্রতিফলিত হয়। তাতে কি পর্দার কোন ক্ষতি হয় ? আত্মসত্ত্বা হ'ল ঠিক এমন একটি পর্দা ! জাগতিক ঘটনায় সে বিচলিত হয় না। দুঃখ ততক্ষণই সম্ভব যতক্ষণ দ্রষ্টা ও দৃশ্যের পার্থক্য আছে। অহঙ্কার-মুক্ত অবস্থায় এই পার্থক্যের বোধ থাকে না। এ অবস্থায় আত্মসত্ত্বা

ছাড়া আর কিছুই থাকে না। ঋষি-জনোচিত এই অবস্থাটি কেবল আত্মসত্তারই অবস্থা।'

এই কথাবার্তা এই খানেই শেষ। অনুমান ক'রে নিতে বাধা নেই যে মহর্ষির শেষ উক্তির উত্তরে বলার মত কিছু না পেয়ে ভক্তটি নিরুত্তর হ'য়ে ছিলেন। হয়তো বা বুদ্ধির রাজ্যের শেষ সীমান্তে পৌঁছে, বোঝবার চেষ্টায় ক্ষান্ত দেওয়া ছাড়া তাঁর আর গত্যন্তর ছিল না বলেই এই আলোচনা এর পরে আর স্বভাবতই অগ্রসর হয় নি। কিন্তু তবু এরই মধ্যে যতটুকু আমরা পেয়েছি তাতেই মহর্ষির বিশেষ বক্তব্য ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয়টি হ'য়ে আছে সুস্পষ্ট। আমরা, যারা মহর্ষির এই পাশ্চাত্য ভক্তের মত, বুদ্ধি নিয়েই কারবার করি এবং বস্তুনিরপেক্ষ, ব্যক্তিনিরপেক্ষ, স্বতঃসিদ্ধ সত্য আত্মবস্তুর গভীরতম রহস্যে যাদের অনধিকার—এর পরে আমাদেরও আর বলার কিছু থাকে না।

অতএব মহর্ষি-বর্ণিত আত্মোপলব্ধির মহাকাব্য, অর্থহীন ও অক্ষম টীকাভাষ্যে কণ্টকিত না ক'রে, সময়ান্তরে কথিত মহর্ষির নিজের উক্তি আরও একটু উদ্ধৃত ক'রে, এই প্রসঙ্গের শেষ করি।

'এক এবং অদ্বিতীয় যে সত্তা তার অংশও নেই, সীমাও নেই। আংশিক সত্তায় সৃষ্টিরূপে যা কিছু প্রতীয়মান হয়, তা নিছক মনেরই কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। অখণ্ড অরূপকে মোহের দ্বারা খণ্ডিত ক'রে মন বহুত্বের বিভাগ সৃষ্টি ক'রে। অথচ, সত্তাকে বাদ দিয়ে মনেরও কোন অস্তিত্ব নেই। সোনার একটি অলঙ্কার ঠিক যে সোনা তা নয়—কারণ বিশেষ একটা উপাধি ও বিশেষ একটা রূপ পরিগ্রহ ক'রে সেটি যেন স্বতন্ত্র আর একটি বস্তুরূপে প্রতিভাত হয়। কিন্তু তবু বিচার করলেই বোঝা যায় যে আসলে এই স্বাতন্ত্র্য-মোহিত বস্তুটি সোনা ছাড়া আর কিছুই নয়। মন হ'ল আত্মসত্তারই এমনি একটি রহস্যময় শক্তি যার প্রভাবে এক সত্তা বহুরূপে আত্মপ্রকাশ

করে। মনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর, আত্মা ও জগৎ-রূপী ত্রয়ীর ঘটে আবির্ভাব। সুষুপ্তির মাঝে এই তিনটি বিভিন্ন বস্তু মিলে একাকার হ'য়ে যায়।'

উপরের উদ্ধৃতিগুলি থেকে মহর্ষি রমণের সাধনা ও সিদ্ধির যে পরিচয়টি পাওয়া যাবে, সেটি প্রধানতঃ তাঁর মতবাদের দিক। সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে মহর্ষি দার্শনিক নন এবং কোনরকম মতবাদের গণ্ডী দিয়ে তাঁর উপলব্ধির পরম সত্যকে সীমাবদ্ধ ক'রে রাখা যায় না। তাঁর প্রাত্যহিক জীবনের ধরনধারন লক্ষ্য করে দেখলে একথা একবারও মনে হয় না যে কারুর প্রতি বা কিছুর প্রতি তাঁর কিছুমাত্র টান আছে। অবশ্য টান যে নেই—সে কথাও মনে হবার বিশেষ কোন কারণ ঘটে না, তা ঠিক। কিছুতেই তিনি লিপ্ত নন, একথা যেমন ঠিক, কিছুর প্রতি তিনি বিরূপ নন, একথাও ঠিক তেমনিতরই সত্য। গুরুগিরি তিনি করেন না অথচ তিনি পরম গুরু। যাকে তিনি নিজের জীবনে সত্য বলে জেনেছেন, সেই তাঁর নিজস্ব উপলব্ধির সত্যটিকে সবাইকে দিয়েই মানিয়ে নিতে হবে—এমন কোন প্রচেষ্টাও তাঁর নেই। অথচ যার মানবার সে ঠিকই মানে। প্রশ্ন করলে কখনো উত্তর দেন কখনো বা তাও দেন না। কিন্তু প্রশ্ন যার আন্তরিক, সে উত্তর পায়। বিশেষ ভাবে কোন আগন্তুক বা স্থানীয় ভক্তের প্রতি তাঁর বিশেষ কোনরূপ প্রীতি বা আকর্ষণের নিদর্শনও বড় একটা পাওয়া যায় না। তথাপি সকলের জন্যই অবারিত তাঁর কৃপার দ্বার অলৌকিক বলতে সচরাচর আমরা যা বুঝি তেমনতর ঘটনা রমণাশ্রমের আশেপাশে নিয়ত ঘটেছে বলেও শোনা যায় না। আবার, মহর্ষির সমস্ত জীবনটাই তো আগাগোড়া অলৌকিক। মহর্ষির কাছে পৃথিবীর দেশ-দেশান্তর থেকে এত লোক কিসের প্রয়োজনে ছুটে আসে? কি তারা চায়, কি-ই বা তারা পায়? এ প্রশ্নের উত্তর যে জানে, সে জানে। বুদ্ধি দিয়ে কিছুই বোঝা যায় না।

মহর্ষির ভক্ত মেজর স্যাড্‌উইক্‌কে ঠিক এই প্রশ্নটিই করেছিলেন জনৈক অস্ট্রেলিয়াবাসী সাংবাদিক। প্রসঙ্গক্রমে এখানে বলে রাখা উচিত যে মেজর স্যাড্‌উইক্‌ মহর্ষির দুর্বোধ্য আকর্ষণে জড়িয়ে গিয়ে, পূর্বাশ্রমের নাম এবং পরিচয় ত্যাগ ক'রে 'সাধু অরুণাচল' বলেই এখন পরিচিত। রমণাশ্রমে এসে সাংবাদিক সাহেবটি, যথারীতি যা কিছু দর্শনীয় সব চটপট দেখে নিয়ে, মেজর স্যাড্‌ইকের ঘরে এসে উপস্থিত হলেন। মেজরকে একান্তে পেয়ে তিনি বললেন, 'আমার নাম শুনে থাকবেন। আশ্রম দেখতে এসেছিলাম। দেখলাম মহর্ষিকে, দেখলাম দ্রষ্টব্য যা কিছু এখানে আছে। যেমন যেমনটি ভেবেছিলাম সবই ঠিক ঠিক মিলে গেছে। কিন্তু সমস্যায় পড়েছি আপনাকে নিয়ে। আপনি এখানে করেন কি? কিসের জন্যই বা এখানে পড়ে আছেন? এই ঘর, এই বিছানা, এই সস্তা নোংরা আসবাব পত্র—এর মাঝখানে আপনার দরের একজনকে স্বেচ্ছায় বন্দী হ'য়ে থাকতে দেখবো—এ আমি স্বপ্নেও মনে করতে পারি না। মহর্ষিকে এরা সাধু মহাত্মা মনে করে—বেশ কথা। ইণ্ডিয়ায় এমনিতর আশ্রম, এমন মহাত্মা অনেক আছে, তাও জানি। কিন্তু আপনার সঙ্গে এখানকার সম্বন্ধ কি?'

মেজর স্যাড্‌উইক্‌কে চুপ ক'রে থাকতে দেখে, সাংবাদিক-প্রবর আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'রহস্যটা একটু পরিষ্কার ক'রে দিলে দোষ কি? আপনি সভ্য য়ুরোপের একজন বিশিষ্ট প্রতিনিধি বলেই আমি জানতে চাইছি—এদের ব্যাপার কিছু লিখছেন বুঝি?'

উত্তরে মেজর বললেন, 'এখানে থাকি ভালো লাগে বলে। লেখা পড়া কিছুই আমি এখানে করি না।'

অনেকক্ষণ ধরে হাঁ ক'রে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে অস্ট্রেলিয়াবাসী সাংবাদিক, বোধ করি বিস্ময়ে হতবাক হ'য়েই, একান্ত নিরাশায় মাথা নাড়লেন। অর্থাৎ—'বুঝেছি; আর বলতে হবে না। মাথাটি বেচারার একেবারে খারাপ হ'য়ে গেছে, তাতে আর সন্দেহ নেই!'

উপরোক্ত ঘটনাটির উল্লেখ ক'রে মেজর স্যাড্‌উইক্‌ লিখেছেন: 'সাংবাদিকের প্রশ্নের আশানুরূপ কোন উত্তর আমি দিতে পারি নি। বলবার মত আমার ছিলই বা কি? সত্যি কথা বললে তাকে কোন মতেই বিশ্বাস করান যেত না। বললাম, ভালো লাগে, এখানে আমি মনে শান্তি পাই। পুরোপুরি উত্তর এতে হয় না তাও আমি জানি। আমার কথা শুনে আমার দিকে একান্ত করুণার দৃষ্টিতে চেয়ে অনুকম্পার সুরে সে বললো—'শান্তি পাও? তা ভাল। তবে কিনা, আমি কখনো এ ধরনের দুশ্চিন্তায় পীড়িত হই নি!' বুঝলাম তার ধারণা হ'ল যে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

এই প্রসঙ্গে মেজর স্যাড্‌উইক্‌ আরও লিখেছেন: 'আমি তাকে একটুও দোষ দিই না। আমাকে পাগল মনে করলে সেই ধারণা ভুল বলি কেমন ক'রে? পুরো আধখানা জীবন আমি কাটিয়ে দিলাম এমন একটি বস্তুর অনুসন্ধানে যা আমার আছে। সে বস্তুটি যে আছে তা আমি মনে-প্রাণে জানি। মুস্কিল হয়েছে এইখানেই। বলার মত কিছুই আমার নেই। কিন্তু তবু যদি প্রশ্ন ওঠে আমি এখানে পড়ে আছি কেন, তার উত্তরে আমি বলতে বাধ্য হবো যে ভগবান রমণকে ছেড়ে আমি যেতে পারি না। চুম্বকের আকর্ষণে যেমন ক'রে লোহা বাঁধা পড়ে, ঠিক তেমনি ক'রেই আমি বাঁধা পড়ে আছি। চলে যাবার ক্ষমতা আমার নেই।'

'একথা সত্য যে অধিকাংশ লোকই ভগবানের কাছে আসে পার্থিব অথবা আধ্যাত্মিক কোন না কোন সম্পদের কামনা নিয়ে। লোকের মুখে শুনি কত রকমের অলৌকিক অভিজ্ঞতার কথা। তাদের একটিকেও আমি অসম্ভব বলে মনে করি না।...বড় ঘরের একপ্রান্তে আমি তাঁকে উপবিষ্ট দেখি। দেখি তিনি পরিপূর্ণভাবে নির্লিপ্ত। আমাদের কাছে যেসব ঘটনা বৃহৎ বলে প্রতীয়মান হয়, দেখি সেগুলি যেন তাঁকে একেবারেই স্পর্শ করে না। আমি দেখি তাঁর

মুখের অনুপম সুন্দর হাসিটির কোন তুলনা নেই। এমন একটি পরম সৌম্য প্রশান্তি—যার বর্ণনা হয় না, স্বচক্ষে না দেখলে যা বিশ্বাস করাও যায় না। এতেই আমার মনে আসে অনন্ত আশা, অপরিসীম উৎসাহের উদ্দীপনা। অতীতের কত মহাপুরুষের কথাই তো পড়েছি। কিন্তু তাদের অপ্রত্যক্ষ প্রেরণা আমার কাছে এতখানি সত্য হ'য়ে উঠবে কি করে! এখানকার যে বস্তুটি, সেটি এমন একটি অভ্রান্ত সত্য যে হাজার ইচ্ছা করলেও একে সংশয়ের দৃষ্টিতে দেখা যায় না। আমার বিশ্বাস—এই জন্যই এখানে লোক আসে আর রয়ে যায়। এই পরিবর্তনশীল ও অনিশ্চিত জগতে আমরা যেন নিশ্চয়তার ধ্রুব কেন্দ্রে নিশ্চিত হ'য়ে বসে আছি।'

প্রসঙ্গক্রমে আরও একজন পাশ্চাত্য ভক্তের নিজের মুখে বলা অভিজ্ঞতার বিবরণ এখানে দেওয়া যায়। অধ্যাপক ডানকান গ্রীনলিস নিছক কৌতূহলের বশেই মহর্ষিকে দেখতে আসেন নি। অধ্যাত্মতৃষ্ণার ব্যাকুলতায় অনেক পথ ঘুরে তিনি যখন রমণাশ্রমের সন্ধান পেয়ে মহর্ষির সাক্ষাতে এসে উপস্থিত হলেন, তখনকার মনোভাব তিনি এই ভাবে ব্যক্ত করেছেন: 'মহর্ষিকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে জাগলো গভীর প্রতীতি যে এই মানুষটি জীবন সমস্যার চরম সমাধানটি খুঁজে পেয়েছেন। এমন একটি শান্তির দ্যুতি তাঁকে ঘিরে আছে যে তাঁর সান্নিধ্যে আসা মাত্রই চিত্ত হ'য়ে যায় দ্বিধাহীন। সে শান্তি যেন মধ্য রাত্রির নভতলের নিঃসংশয় প্রশান্তি! আমার মনে হ'ল, আমি যা চেয়েছিলাম তাই এখানে পেলাম! এই সেই জীবন্মুক্ত পুরুষ, সেই দৈব-মানব। কেন আমার এ কথা মনে হ'ল তা আমি বুঝিয়ে বলতে পারবো না। যে প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করবো মনে করেছিলাম সেগুলি যে কোথায় মিলিয়ে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেল, তাদের আর খুঁজে পেলাম না। মনে হ'ল, এখানে এসে জিজ্ঞাসার আর কোথাও কিছু থাকে না।'

'এসেছিলাম মাত্র চারদিন থাকবার কড়ারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত

রয়ে গেলাম। নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া যেন অসম্ভব ব'লে মনে হতে লাগলো। ভিতরে ভিতরে আমার উদ্দাম প্রকৃতি দিনে দিনে শান্ত, পুলকিত হ'য়ে উঠতে লাগলো। কোন্ গভীরের নিস্তরঙ্গ প্রশান্তি যেন আমার অন্তরলোকে অপরূপ মহিমায় বিকশিত হ'য়ে উঠতে লাগলো। আমার মনে হতে লাগলো যেন সেই অপরিবর্তনীয় অনন্ত সত্তার উৎসমুখে আমি পৌঁছে গেছি।'

'বিদায়ের ম্লান ক্ষণটি যখন এলো—আমার মনে হ'ল যেন আমার দেহটি হ'য়ে উঠেছে ভারি একটা বোঝা। কর্মক্ষেত্রে ফিরে গিয়ে বোধ হ'তে লাগলো যে আমার মনটা সমগ্রভাবে পিছনে ফেলে এসেছি, আর আমার দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি আপনা আপনি যন্ত্রের মত তাদের অভ্যস্ত কাজগুলি ক'রে যাচ্ছে। এমন আর একটি মানুষের কথা আমি জানি না যাঁর সান্নিধ্যে এসে ব্যক্তিত্বটি এভাবে শূন্যতার গভীরতম কেন্দ্রে গিয়ে শূন্যময় হ'য়ে যায়। মহর্ষি যে আত্ম-বিচারের কথা বলেন, অনেকেই হয়তো সে পথে চলে কৃতকৃতার্থ হয়েছেন। কিন্তু আমার কথা আমি বলতে পারি। আমি চেষ্টা ক'রেও সে পথে চলতে পারি নি। কিন্তু মহর্ষির সান্নিধ্যে এসে আমি কোনরূপ প্রচেষ্টা বা পন্থারই প্রয়োজন বোধ করিনি। মহর্ষির অনুগ্রহরশ্মিতে স্নাত হ'য়ে আমি পেয়েছি অসীমের সাক্ষাৎ ও সুস্পষ্ট অনুভূতি। বুঝেছি যে সেই আশ্চর্য অভিজ্ঞতা স্বয়ং তাঁরই অনুগ্রহ।'

'আশ্রমে অবস্থান কালে দু'টি ঘটনা ঘটেছিল যা আমার মনে গভীর ভাবে মুদ্রিত হ'য়ে আছে। ঘটনা হিসাবে তারা এমন কিছুই নয়—কিন্তু তবু এই সামান্য দু'টি ঘটনাকে আমি কখনো ভুলতে পারবো না। প্রথম ঘটনাটি আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে মহর্ষি এর আগে আর কখনো স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে আমাকে কিছু বলেন নি। সেদিন মহর্ষির বড় ঘরটির একপাশে, একখানি যোগের বই হাতে নিয়ে

অলস ভাবে পাতা উল্টে যাচ্ছিলাম। দ্বিপ্রহরের উত্তাপে হয়তো বা একটু তন্দ্রার মত আসছিল। সহসা আমাকেই উদ্দেশ ক'রে মহর্ষি ইংরাজিতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওটা কি বই?' আমি বললাম। মহর্ষি বললেন, 'মিলারেপা পড়ো!' তখনই উঠে পড়লাম। আশ্রমের গ্রন্থাগারে খোঁজ ক'রে, তিব্বতীয় মহাযোগী মিলারেপার জীবনীখানি সংগ্রহ ক'রে তখুনি পড়তে শুরু ক'রে দিলাম। মনে হ'ল যেন আমার অন্তর কানায় কানায় ভ'রে উঠেছে অনুভূতির গভীরতায়। আমার বিশ্বাস ভগবান রমণ জেনেশুনেই আমাকে এই অপূর্ব বইখানি পড়তে বলেছিলেন।' কত বেদনা, কত ত্যাগ, কত কঠিন তপস্যার মূল্যে আত্মবস্তুকে লাভ করতে হয়—তা আমার জানার প্রয়োজন ছিল বলেই এই পরমাশ্চর্য জীবনকাহিনী আমাকে এতখানি বিহ্বল করেছিল।' (এই লেখকের রচিত 'মিলারেপা—তিব্বতের প্রাণপুরুষ' সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। শেফালিকা প্রকাশনী বইখানি প্রকাশ করেছে।)

'এইবার দ্বিতীয় ঘটনাটি বলবো। আশ্রমে অবস্থান কালে উত্তর ভারতের জনৈক উকিল ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিলো। তিনি ছিলেন কৃষ্ণভক্ত। ভাবাবেগের প্রেরণায় তিনি তৃষ্ণার জল খুঁজতে খুঁজতে রমণাশ্রমে এসে পৌঁছেছিলেন। রাত্রে উন্মুক্ত আকাশের তলে আমার পাশাপাশি শুয়ে তিনি আমাকে তাঁর অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার কথা প্রত্যহই শোনাতেন। তাঁর মনে শান্তি ছিল না। যে পক্ষকাল তিনি আশ্রমে ছিলেন তার প্রত্যেক দিনটি তাঁর কাছে অসহনীয় বলে মনে হ'তো। তিনি বলতেন, 'এখানে আমার অন্তরের তৃষ্ণা মিটবে কিসে? রাধাকৃষ্ণের প্রেমমধুর লীলাপ্রসঙ্গে যে রস, মীরার বিরহ-বেদনায় যে মাধুরী—এখানকার এই অদ্বৈত ভাবে তার মূল পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে গেল। আমি কালই চলে যাবো। মিথ্যে আশায় এতদূর ছুটে এসেছি: যা চেয়েছিলাম তা পেলাম না।

এখানকার এই বেদীতে উপবিষ্ট প্রাণহীন মর্মরমূর্তির মধ্যে সেই প্রেম-নির্ঝরিণী কোথায় পাবো ?'

'কিন্তু কি জানি কেন রাত্রের প্রতিজ্ঞা প্রভাতে পূর্ণ হ'ত না। দিনের পর দিন একই ভাবে কাটতে লাগলো। তাঁর মনের অশান্তি রয়েই গেল। প্রায় এক পক্ষকাল আশা-নিরাশায় যখন কেটে গেল, তখন তিনি বললেন, 'আর না! এখানে আমার প্রাপ্য কিছু থাকলে এতদিনে পেতাম। কালই আমি সোজা বৃন্দাবনে চলে যাবো—গিরিধারী গোপালের চরণে নিজেকে সমর্পণ করে দেবো! এখানকার এই শুষ্ক জ্ঞান অসহ্য হয়ে উঠেছে আমার কাছে। অহং-তত্ত্ব যারা জানতে চায়, জানুক। আমি চাই লীলারসের আস্বাদন। সে বস্তু এখানে নেই।'

'তাঁর বিদায়ের দিনটির কথা আমি ভুলতে পারি না। বিদায়ের আয়োজন সেরে, বন্ধু কতকগুলি ফল মহর্ষির চরণে দেবার জন্য নিয়ে এসেছেন। মহর্ষি মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য উঠে দাঁড়িয়েছেন। বন্ধুটি ফলের বোঝা হাতে নিয়ে সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। মহর্ষি স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছেন। বন্ধুর মুখেও কথা নেই। সহসা বন্ধুটির মধ্যে কি যেন একটা ঘটে গেল। মহর্ষির পায়ে মাথা গুঁজে তিনি অকস্মাৎ ভূমিতলে গড়িয়ে পড়লেন। তাঁর দুটি চোখ বেয়ে বাঁধনহারা অশ্রুধারা ঝর্‌ঝর্ করে পড়লো ঝরে। ফলগুলি ছড়িয়ে গেল ঘরের চারিপাশে। ভগবান তখনো চিত্রার্পিতের মত স্থির হ'য়ে আছেন দাঁড়িয়ে। তাঁর মুখেচোখে জড়িয়ে আছে কি এক রহস্যময় হাসি। বন্ধুটি অনেকক্ষণ পরে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। অবশ দেহ থরথর ক'রে কাঁপছে। দু-চোখ দিয়ে ঝরছে অবিরাম অশ্রুধারা। মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না। বিদায়ের কথাটি পর্যন্ত উচ্চারণ করতে পারছেন না। প্রসন্ন মৃদু হাস্যে অবর্ণনীয় কোমলতার ভঙ্গিতে মৃদুস্বরে মহর্ষি বললেন, 'সারি পো!' (ঠিক আছে: যাও)

'দ্বারপ্রান্তে অপেক্ষমান গাড়িতে যখন আমি বন্ধুটিকে তুলে দিলাম, তখনো তিনি ভাবের ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। তাঁর ভক্তি-বিহ্বল কথাগুলি শুনে আমার মনে হ'ল—তিনি মহর্ষি'র মধ্যে সহসা তাঁর আরাধ্য দেবতাকে প্রত্যক্ষ করেছেন। আমি যেন সেই মুহূর্তে আমার নিজের মধ্যেও সেই উত্তাল তরঙ্গের একটুখানি ছোঁয়াচ পেলাম। আর সেই থেকে এই অত্যাশ্চর্য ঘটনাটি আমার চিত্তে গভীরভাবে চিরদিনের জন্য মুদ্রিত হ'য়ে রয়েছে। চোখ বুজলেই এখনো আমি আগাগোড়া সমগ্র দৃশ্যটি চোখের সামনে দেখতে পাই। মহর্ষি'র সেই স্নিগ্ধোজ্জ্বল মৃদু মধুর স্মিত হাস্যরেখা মানসলোকে অপরূপ হ'য়ে ফুটে ওঠে।'

আর একটি বিদেশিনী মহিলার কাহিনী এখানে না বললে অন্যায় হবে। মহিলাটির নাম শ্রীমতী এলিয়েনর পলিন্ নয়ে—আমেরিক্যান, ক্যালিফর্নিয়ার অধিবাসিনী। কোন্ নিদারুণ বেদনার সংঘাতে ইনি গৃহ-সংসার পরিত্যাগ ক'রে ভবঘুরের জীবন বরণ ক'রে নিয়েছিলেন—সে কথা জানবার উপায় নেই। কিন্তু তাঁর নিজের মুখের উক্তি থেকে জানা যায় যে এই সংঘাতের ফলে তাঁর দেহ-মন এককালে বিধ্বস্ত হ'য়ে গিয়েছিল। মনে হয় যেন ভাঙা মনটার অপরিহার্য বাহন হিসাবে কঙ্কালসার নির্জীব দেহটাকে দূর দূরান্তে সরিয়ে নিয়ে যাওয়াই ছিল তাঁর এই নিরুদ্দেশ যাত্রার একমাত্র উদ্দেশ্য। জাহাজে উঠলেন চোরের মত, পাছে তাঁর স্বাস্থ্যের অবস্থা দেখে কর্তৃপক্ষ তাঁকে স্থান দিতে ভয় পান। কিন্তু তাঁর নিজের জন্য কোন ভয় ছিল না, ভাবনা ছিল না, বর্ত্তমান ভবিষ্যতের কোনরকম আশঙ্কাই ছিল না। সমস্ত ছাপিয়ে কেবল এই বোধটি ছিল যে, যেমন ক'রে হোক, যেখানেই হোক, যতদূরেই হোক, তাঁকে যেতে হবে; এবং সেখানে, দৃষ্টিসীমার বাইরে, তাঁর জন্য যে পরিণতি অপেক্ষা ক'রে আছে তাঁকে পেতে হবে। কোন রকমে নিজেকে ক্ষয় ক'রে ফেলাই যার একমাত্র কাম্য, সে আর

কিসের ভয় করবে! নিজের কি হবে সে ভাবনা তাঁর ছিল না। অশরীরী প্রেতের মত কি যেন একটা মর্মপীড়া ছিল তাঁর চেতনাকে গ্রাস ক'রে।

যাত্রাকালে, ভারতবর্ষে আসার কথা এলিয়েনর ভাবেন নি। দক্ষিণ আফ্রিকা-যাত্রী জাহাজখানিতে যখন তিনি চেপে বসলেন, তখনকার মনের ভাব ছিল, যেখানে হোক একটা কোথাও যাওয়া চাই। জাহাজের মধ্যে রোগশয্যায় পড়ে কেঁদে কেঁদে তাঁর সারারাত্রি কেটে যেতো। রাজ্যের যত অসংলগ্ন ভয় ভাবনা, নামহীন, কারণহীন আতঙ্ক বুকের মধ্যে বোঝা হ'য়ে থাকতো চেপে। প্রার্থনা করতে চেষ্টা করতেন, প্রার্থনা আসতো না। শারীরিক ও মানসিক অশান্তি যখন চরমে পৌঁছেছে, তখন অকস্মাৎ এক নিশিভোরে জাহাজ এসে পৌঁছালো ডার্বান বন্দরে।

ডার্বান থেকে কেন যে তিনি সহসা একদিন একখানি ভারতবর্ষ-গামী জাহাজে চেপে বসলেন এবং কলকাতার টিকেট থাকা সত্ত্বেও কেন যে বিনা কারণে মাদ্রাজে অবতরণ করলেন এই প্রশ্নের উত্তরে এলিয়েনর বলেছেন, 'এ ইঙ্গিত নিয়তির, নইলে মহর্ষির দেখা পাবো কি ক'রে?' মাদ্রাজ থেকে কোদাইকানালের গিরিনিবাসে যেদিন পৌঁছালেন, সেইদিনই পথে একজন হিন্দু ভদ্রলোকের সঙ্গে কেমন ক'রে হ'ল আলাপ। প্রথম আলাপের ব্যবধান তখনো কাটে নি—এলিয়েনর কিছু না ভেবেই, অতি অপ্রত্যাশিতভাবে জিজ্ঞাসা ক'রে বসলেন, 'এদিকে কোন সাধু আছেন, আপনি জানেন?' কেন তিনি একথা জিজ্ঞাসা করলেন; যে সাধুদের সম্বন্ধে তাঁর প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা ধারণা কিছুই ছিল না—হঠাৎ তাঁদের সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহল এমন অসংবরণীয়ভাবে আত্মপ্রকাশ করলো কেন, এর উত্তর তিনি নিজেই দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এ ঘটনায় তাঁর নিজের কোন হাত ছিল না; অতএব এ সমস্যার সমাধানও তাঁর কাছে নেই।

প্রথম দর্শনের এইরূপ বিবরণ এলিয়েনর নিজেই লিখেছেন: 'ঘরে প্রবেশ করছি আর মনে হচ্ছে যেন আমার বুকের মধ্যে তোল-পাড় করছে। চারিদিকের বাতাসে পূত প্রসন্নতার দিব্য অনুভূতি সৌরভের মত জড়িয়ে আছে। কৌপীন মাত্র পরিধানে তিনি গদীর উপরে বসে,—চারিদিকে ভক্তেরা আছে বেষ্টন ক'রে। যখন তিনি মৃদু হাস্যে আমার পানে দৃষ্টিপাত করলেন, মনে হ'ল যেন স্বর্গের দ্বার খুলে গেল। এমনতর দিব্য জ্যোতি কারুর চোখে কখনো আমি দেখিনি। এমন কোমল কণ্ঠে তিনি আমাকে আপ্যায়িত করলেন যে এক মুহূর্তে আমার মনের সমস্ত আড়ষ্টতা ঘুচে গেল। তাঁর আয়ত দুটি চোখে কি গভীর প্রেম, কি অতল-স্পর্শ করুণা। তিনি নিঃশব্দে মৌন হ'য়ে থাকলেও এ প্রেম, এ করুণা স্পষ্ট অনুভব করতে কোন বাধা হ'ল না। কি দেখবো, কিছুই আমি জানতাম না। দেখার পরে মনে হ'ল—'এ অপূর্ব! এমনটি আর হয় না।' আমার মনে হয় না যে পৃথিবীতে এমন আর একটি কোথাও বর্তমান আছে। মহর্ষিকে দেখলে ভাল না বেসে পারা যায় না। আমার মনে হ'ল তাঁর দৃষ্টি অন্তর্যামীর মত আমার হৃদয়ের অন্তস্থল পর্যন্ত দেখে নিয়েছে; —তিনি জেনে নিয়েছেন আমার তাঁকে কতখানি প্রয়োজন। তাঁর কাছে যে আসে সেই ধন্য হ'য়ে যায়—সকলের মধ্যে সংক্রামিত হয় তাঁর শান্তিরাজ্যের প্রভাব। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাঁর কাছে এসে নতজানু হ'য়ে প্রণাম করে। তিনি মধুর হাস্যে করেন তাদের সম্বর্ধনা। কখনো বা শিশুদের দু'হাত বাড়িয়ে বুকে টেনে নেন। আমার চোখে জল ভ'রে আসে—মনে পড়ে যায় শিশুমণ্ডলি পরিবৃত যিশুখ্রীষ্টের আলেখ্য।'

'প্রথম দর্শনে মহর্ষির প্রতি যে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আমার মনে জন্মেছিল, কয়েকটি দিনের মধ্যেই তা গভীর প্রীতিতে হ'ল পরিণত। আমার অন্তর উদ্বেল হ'য়ে উঠলো শান্তিসুধায় এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার

মনের ভাব আমূল পরিবর্তিত হ'য়ে গেল। আগে যা কিছু আমার কাছে পরম প্রয়োজনীয় বলে বোধ হ'ত, এখন যেন সেগুলির কোন মূল্যই আমার কাছে রইলো না। গতকালের যে চিন্তাগুলিতে ছিল ব্যথা, আগামীকালের যে ভাবনাগুলিতে ছিল আশঙ্কা—সে সমস্তই যেন ধুয়ে মুছে একাকার হ'য়ে গেল। আমার বহু বৎসরের অনিদ্রা রোগ ও হজমের গোলমাল যেন কোন মন্ত্রবলে চিরদিনের জন্য ভালো হ'য়ে গেল। মহর্ষির সান্নিধ্য লাভে আমি যেন নবজন্ম লাভ ক'রে নব প্রভাতের নূতন আলোকে জেগে উঠলাম।'

দীর্ঘ দুইমাস কাল আশ্রমে অবস্থানের পর এলিয়েনর যেদিন আশ্রম ছেড়ে গেলেন, সেদিন তাঁর মনে হয়েছিল যেন নিজের প্রাণকে ছেড়ে যাওয়া এর চেয়ে অনেক সহজ। যাত্রার দিন সকাল থেকে, নিভৃতে বসে, তিনি সারাদিন শিশুর মত কেঁদেছিলেন। পাছে মহর্ষির সমক্ষে আত্মসম্বরণ করতে না পারেন, সেই ভয়ে সারাদিন তিনি মহর্ষির ঘরে গেলেন না। অপরাহ্ণে মহর্ষির ঘরে যখন লোকের ভিড় জমে উঠেছে, তখন তিনি অশ্রুভারাক্রান্ত হৃদয়ে বড় ঘরের একটি প্রান্তে গিয়ে বসলেন। হাস্যোজ্জ্বল স্মিত মুখে মহর্ষি তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করলেন, বললেন, 'বেচারি সারাদিন কেবল কেঁদেছে। এখান ছেড়ে কিছুতেই যেতে ওর মন সরে না!' বিদায়ের ক্ষণে বললেন, 'আমার কাছে আবার ফিরে এসো। যেখানেই তুমি যাও, আমি সর্বদাই তোমার সঙ্গে থাকবো।'

মহর্ষির এই আশ্বাস ইষ্ট-কবজের মত বক্ষে ধারন ক'রে এলিয়েনর আশ্রম ছেড়ে গেলেন। কিন্তু অচিরকাল মধ্যেই তাঁর মনে হ'তে লাগলো মহর্ষিকে বাদ দিয়ে তাঁর জীবনের কোন অর্থ নেই। মনে পড়তে লাগলো তাঁর নিঃশব্দ প্রীতির, মৌন সহানুভূতির দুরতিক্রম্য আকর্ষণ। আপন হতে আপন যিনি, তাঁকে ছেড়ে বহু-বিচিত্র পৃথিবীর কোনখানে গিয়ে সুখ নেই। এই কথাটি মনে হওয়ার

সঙ্গে সঙ্গে মধ্য পথ থেকে এলিয়েনর আবার রমণাশ্রমে ফিরে এলেন এবং একাদিক্রমে আটমাস কাল সেখানেই রয়ে গেলেন। এই সময়কার যে সমস্ত ছোটখাটো ঘটনা তিনি নিজে লিপিবদ্ধ করেছেন, সেগুলির মধ্যে অলৌকিক হয়তো কিছু নেই, কিন্তু যা আছে তার মূল্য মাধুর্যের দিক দিয়ে বড় কম নয়।

অলৌকিক বলতে সচরাচর আমরা যেসব অদ্ভুত বা বিস্ময়কর সংঘটনকে বুঝি, তেমনতর ব্যাপার মহর্ষি'র জীবনে আপাতদৃষ্টিতে বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করা না গেলেও, ভালো ক'রে দেখলে বোঝা যায় যে মহর্ষি'র জীবনযাত্রার আশে পাশে চারিদিকেই অলৌকিকের ভিড়। এ অলৌকিক প্রতিদিনের আকাশে প্রাচীন সূর্যোদয়ের মতই সহজ এবং স্বাভাবিক। তাই এ অলৌকিক অতিমানবীয় অত্যাশ্চর্য প্রভাবকে, সহজে অলৌকিক বলে চেনা যায় না। দেশদেশান্তরের মানুষ বহুদিনের দুঃখের বোঝা, বহুবিধ কামনা-প্রত্যাশার পাহাড় বয়ে নিয়ে মহর্ষি'র কাছে আসে। কেমন ক'রে কোন্ অভাবনীয় পন্থায়, তাদের বোঝাগুলি মহর্ষি'র দৃষ্টি প্রভাবে হাল্কা হ'য়ে যায় কে বলবে? যারা আসে আর চলে যায়, কি তারা নিয়ে যায়? যারা আসে আর রয়ে যায়, কিসের নেশায়, কোন্ আনন্দে, কোন্ মায়ায় তারা বিমোহিত হ'য়ে থাকে—সে কথা একমাত্র তারাই বলতে পারে।

সামান্য কিছুক্ষণের জন্যও যাঁরা মহর্ষির সান্নিধ্য লাভ করেছেন, তাঁরা বলেন মহর্ষির চোখদুটির কথা। মহর্ষির ব্যক্তিত্বের প্রধান আকর্ষণই তাঁর আয়ত সুন্দর জ্যোতির্ময় চোখদুটি। নানা জনে নানা ভাবে তাঁর দৃষ্টি-প্রদীপের বর্ণনা করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত বলেছেন যে এ বস্তুর বর্ণনা হয় না। কিন্তু সবাই বলেছেন যে সে দৃষ্টি করুণার নির্ঝরিণী—কোমল, গভীর, প্রেমসুন্দর ও মর্মস্পর্শী। দূর থেকে মহর্ষি'র কথা শুনে যাঁরা তাঁকে জ্ঞানীর পর্যায়ে ফেলেছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকে, কেবল তাঁর চোখদুটি দেখেই মুগ্ধ হ'য়ে বলেছেন,

এ চোখ ভক্তের চোখ, প্রেমসুন্দরের চোখ ছাড়া হতেই পারে না।

কিন্তু মহর্ষির অনুপম ব্যক্তিত্বের মূলসূত্রটি রয়ে গেছে তাঁর অনাড়ম্বর সরলতায়, সহজ মহত্বের পরিপূর্ণ ব্যঞ্জনায়। সর্ব মানবতার ঊর্ধ্বে যাঁর স্থান, তিনি সবার কাজে, সবার মাঝে, সাধারণের সমতলে কেমন ক'রে নেমে আসেন—তার প্রত্যক্ষ আলেখ্য হিসাবে শ্রীযুক্ত দিলীপ কুমার রায়ের পরবর্তী বর্ণনাটি হৃদয়গ্রাহী :

'আহারের সময়ে মহর্ষির সন্নিকটে বসে, আর সবাইকার সঙ্গে তাঁর খাওয়া দেখতে দেখতে এই চিন্তাটিই আমার মনে ঘুরে ফিরে আসছিলো। মুগ্ধ হ'য়ে দেখছিলাম আহারকালে তাঁর মনের একটি দিক অন্তর্মুখী এবং আর একটি দিক হ'য়ে আছে সচেতন। ধীরে ধীরে, একান্ত পরিচ্ছন্নভাবে, প্রোজ্জ্বল স্থৈর্যের সঙ্গে তিনি আহার্য গ্রহণ করছেন। তাঁর নিজের ভোজন সাঙ্গ হওয়া পর্যন্ত কেউ যে তাঁর জন্য অপেক্ষা ক'রে থাকবে, তিনি তা পছন্দ করেন না। একবার এইভাবে আমাকে অপেক্ষা করতে দেখে তিনি অসহিষ্ণু হ'য়ে আমাকে উঠে যেতে ইঙ্গিত করেছিলেন। মহর্ষির এই অনাড়ম্বর ভাবটি আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছিলো। আর কি সুন্দর পরিচ্ছন্ন তাঁর খাওয়া! কলাপাতার বাইরে একটি ভাতও পড়তে পায় না। প্রয়োজনের অতিরিক্ত এতটুকুও তিনি নেবেন না। খাওয়া শেষ হ'য়ে গেলে পাতাখানি আঙ্গুল দিয়ে চেঁচে চেটেপুটে সমস্তটুকু আহার্য গ্রহণ ক'রে ছাড়বেন। পাতাটি আয়নার মত উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলে তিনি আর সবাইকার সঙ্গে ধীরে ধীরে হাত ধুতে যাবেন,—কিন্তু কেউ যে তাঁর প্রতি সম্ভ্রম দেখিয়ে, একটু সরে গিয়ে, তাঁর জন্য বিশেষভাবে একটু স্থান ক'রে দেবে তাও তিনি কিছুতেই হতে দেবেন না।

'তাঁর এই আত্মবিস্মৃত নিরভিমানের ভাবটি আমার ভারি ভাল

লেগেছিল। তাঁর নড়াচড়ার মধ্যে কোনখানে নেই এতটুকু ইচ্ছাকৃত আতিশয্য। সহজাত মহত্বের রাজটীকা তাঁর ললাটে, সন্ধ্যামেঘের সীমন্তে সৌন্দর্য্যরেখার মত উজ্জ্বল হয়ে আছে।'

এই বর্ণনার পাশাপাশি যে দু-একটি ছোটখাটো কথাবার্তার দৃষ্টান্ত দিলীপবাবুর বিবরণে পাওয়া যায়, সেগুলিও কম সুন্দর নয়। জনৈক ভক্ত জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'সকলেই যদি এক শিব, তবে আপনি অপরের প্রণাম গ্রহণ করেন কেন?' মহর্ষি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'তা কেন নেব না? কারুর প্রণাম নেবার আগে, আমি নিজেই যে মনে মনে তার মধ্যে যে শিব আছেন, তার পায়ে আমার প্রণতি নিবেদন করে দিই।'

আর একবার জনৈক ভক্ত মহর্ষিকে অনুযোগ ক'রে বলেছিলেন, 'আপনার কাছে এতদিন থেকেও আমার কোন লাভই হল না।' উত্তরে মহর্ষি বললেন, 'তার কারণ এই যে, তোমার কখনো কোন ক্ষতি হয় নি। ক্ষতির বোধ না থাকলে, লাভের কথা উঠে না।'

দিলীপবাবুর বন্ধু আশ্রমসান্নিধ্য-বাসী ডাক্তার হাফিজ মহর্ষিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আচ্ছা বলুন তো, এ ব্যাপারটা কি? ঈশ্বর মানুষের অন্যায় প্রার্থনার উত্তর দেন না—তার মর্ম বুঝি। কিন্তু ন্যায্য প্রার্থনা যে তিনি কেন কানে তোলেন না, সে এক রহস্য। এই তো আমি—অন্যায় কিছু চাই নি—কেবল এইটুকুই বারংবার প্রার্থনা করেছি যে আমি যেন তাঁর সত্যিকারের দাস হতে পারি। এটুকুও তিনি কেন শোনেন না?' নির্দোষ এই প্রার্থনাটুকু তিনি পূরণ করেন না কেন?'

শিশুর মত সরল হাস্যে মহর্ষির মুখ উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো। তিনি বললেন, 'কারণ, তা হলে যে তুমি আর প্রার্থনা করতে না!'

শীতের দিনে মহর্ষিকে একবার দুখানি জামা গায়ে দিতে বলা হয়েছিল। উত্তরে মহর্ষি বললেন, 'একেই তো আমাদের আত্মা

বেচারী পাঁচটি স্থূল আবরণ পরে হাঁপিয়ে উঠেছে। অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময়—এই পাঁচটি জামার উপরে আরও ছুটি চাপিয়ে দিতে চাও কোন প্রাণে?'

মহর্ষির প্রসঙ্গে আর একটি ছোটখাটো কাহিনী বলে এই অধ্যায়ের শেষ করবো।

প্রাতঃকৃত্য সমাপন ক'রে মহর্ষি যখন একদা পাহাড়ের পাদদেশে শিলাশনে উপবিষ্ট ছিলেন, তখন বহুদিনের অনুগত একটি বানর তাঁর সাদর স্পর্শ লাভের আশায় তাঁর সম্মুখে এসে বসেছিল। বানরটির হাবভাব দেখে জনৈক ভক্ত নিছক কৌতূহল বশে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার মুখে সর্বদাই শুনি সাম্যের কথা। তবে কি মনে করবো যে এই বানরের মধ্যে যে আত্মা, আমাদের মধ্যেও তাই?'

স্নেহার্দ্র দৃষ্টিতে বানরটির দিকে চেয়ে মহর্ষি শুধু বললেন, 'যে যেমন দেখে!'

মহর্ষির এই উক্তির অর্থ ভক্তটির কাছে পরিস্ফুট হ'ল না। কিন্তু মহর্ষির তূষ্ণীভাব দেখে তিনিও আর কিছু না বলে চুপ ক'রেই রইলেন। কিন্তু প্রশ্নটি তাঁর মনে রয়েই গেল।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে অনুরূপ আর একটি দৃশ্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ ক'রে মহর্ষির পূর্বোক্ত উক্তিটির মর্মার্থ ভক্তটি বুঝতে পারলেন। ঘটনাটি এইরূপ : প্রাতঃকৃত্য উপলক্ষে সেদিনও মহর্ষি আশ্রম সীমানার বহির্দেশে বিচরণ করছিলেন। এই সময়ে, মহর্ষির নিভৃত সঙ্গ পাবার লোভে পূর্বোক্ত ভক্তটি মহর্ষির অনুসন্ধানে বেরিয়েছিলেন। পার্বত্য পথে কিছুদূর গিয়ে ভক্তটি মহর্ষির কণ্ঠধ্বনি শুনতে পেলেন। তিনি ভাবলেন তাঁর পূর্বেই আর কোন ভক্ত মহর্ষির সঙ্গে সম্মিলিত হ'য়ে থাকবেন। মহর্ষির কণ্ঠস্বর অনুসরণ ক'রে অগ্রসর হ'য়ে পথের বাঁকে অনতিদূরে মহর্ষিকে তিনি

দেখতে পেলেন। তিনি দেখলেন মহর্ষির সঙ্গে দ্বিতীয় ব্যক্তি কেউ নেই। মহর্ষি একা ধূলিমলিন পথ-প্রান্তে বসে আছেন আর তাঁর কোলের উপরে পা রেখে একটি রুগ্ন কদাকার কুকুর মহর্ষির মুখ চাটছে। মহর্ষি পুলকিত প্রসন্ন মুখে তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন আর হেসে হেসে বলছেন, 'সন্তোষম্ ? সন্তোষম্ ?'

ভক্তটি দেখলেন কুকুরটির সর্বাঙ্গে ঘা—পুঁজরক্ত গড়িয়ে পড়ছে। এই ঘৃণ্য কুদর্শন প্রাণীটির প্রতি মহর্ষির সদয় প্রসন্নতার অভিব্যক্তি স্বচক্ষে দেখে ভক্তটি বুঝতে পারলেন মহর্ষির পূর্বদিনের কথাটির মর্মার্থ।

মহর্ষির সম্বন্ধে তাঁর প্রতিদিনের জীবনযাত্রার সঙ্গে জড়ানো এমনিতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা, সেবকবৃন্দের অভিজ্ঞতায় কত যে সঞ্চিত হ'য়ে আছে তার অন্ত নেই। বহিরাগত ব্যক্তির কাছে প্রত্যহের পায়ে চলা পথে এরা যেন ঘাসের ফুল। চোখের কাছে তুলে দেখলে তবে হয়তো তাদের চোখে এদের অলৌকিক সৌন্দর্য চোখে পড়ে। সাধারণ নিয়মে, সর্বদাই যারা দেখে তারা বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে ভুলে যায়। অতিপরিচয়ের আড়ালে বহু অলৌকিক মহিমার বৈশিষ্ট্য যায় ঢেকে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সে কথা খাটে না, কারণ প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি কথাও মহর্ষি কখনো বলেন নি। বিশেষ একটি পরিস্থিতিতে, বিশেষ একটি কারণে, যা যখন বলেছেন তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যটি সঙ্গে সঙ্গে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির অন্তরের অন্তস্থলে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে। মুখের কথায় যেটুকু বলেছেন তার চেয়ে অনেক বলেছেন চোখের ভাষায়, মৌনতার অনুপম অভিব্যক্তিতে। তাই, তাঁর প্রত্যেকটি কথা, প্রত্যেকটি ইঙ্গিত, প্রত্যেকটি দৃষ্টিপাত তাঁর ভক্তবৃন্দের মনের মণিকোঠায় অমূল্য ঐশ্বর্যের মত ক'রে, চিরদিনের পাথেয় রূপে সঞ্চিত হ'য়ে আছে।

মহর্ষির জীবনকাহিনীকে উপলক্ষ করে যা কিছু ইতিপূর্বে বলা

হয়েছে, তার মধ্যে খণ্ড খণ্ড ভাবে তাঁর যৎসামান্য একটু পরিচয় মাত্র পাওয়া গেছে। দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর কাল ধরে এই যে পরম পুরুষ অরুণাচল পর্বতের সানুদেশে একভাবে অবস্থান করেছিলেন এবং লক্ষ লক্ষ বিপন্ন, বিষণ্ণ, নরনারীর অন্তরে বিশ্বাস, ভক্তি, শান্তি ও আনন্দের অমর জ্যোতি বিকীরণ করেছিলেন, দৈনন্দিন জীবনের পটভূমিকায় তাঁর শেষ জীবনের দিনচর্যার স্বরূপটি না দেখলে মন ভরে না।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে সহাসমারোহে পঞ্চাশত্তম বৎসরের উৎসব যখন শেষ হল, তখন রমণাশ্রমের মহর্ষির চলাফেরায় বার্ধক্যের অনুশাসন বেশ স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। নির্বিকার মহর্ষির দৈহিক অপটুতার প্রতি দৃষ্টি রেখে আশ্রম-কর্তৃপক্ষ তাঁর শয়ন কক্ষেই প্রাত্যহিক দর্শনের ব্যবস্থা করেছেন। ভোর পাঁচটায় ভক্তেরা একে একে এসে সেখানে সমবেত হন। নিঃশব্দে সবাই এসে একে একে আসন গ্রহণ করেন। ধূপের সৌরভে মেশে আশ্রমবাসী ব্রাহ্মণগণের বেদপাঠের মধুর ধ্বনি। বেলা ছটার কাছাকাছি বেদপাঠ সাঙ্গ হ'লে, ভগবান রমণ স্বহস্তে লাঠিতে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে গোশালার পাশ দিয়ে শৌচাগারের দিকে চলে যান। তাঁর দেহযন্ত্র যে কতখানি বিকল হয়ে এসেছে সে কথা তাঁর মুখের অনির্বচনীয় হাসিটি দেখলে কিছুমাত্র বোঝা যায় না। এতটুকু বিরক্তি, এতটুকু কাতরোক্তি নেই দৈহিক অক্ষমতার জন্য। দুঃসহ যন্ত্রণায় কখনো মুখের হাসিটি মলিন হয় না। সেই অভয় হাসি যেন স্নেহময়ী মায়ের মত ক'রে সবাইকে জড়িয়ে ধরে, নিমেষের মধ্যে পরকে আপন ক'রে নেয়, ব্যথিতকে ব্যথা ভুলিয়ে দেয়, চিন্তিতকে নিশ্চিন্ত করে তোলে, নিরানন্দকে করে আনন্দিত, মুমূর্ষুকে ফিরে দেয় প্রাণ।

ঠিক সাতটার সময়ে সবাইকার সঙ্গে বসে প্রাতঃরাশ সমাধা ক'রে ভগবান রমণ সামান্য একটু বেড়িয়ে আসেন। বেশ বোঝা যায় যে অক্ষম দেহযন্ত্রটা নিতান্ত মনের জোরে চলা-ফেরা করছে। রোগযন্ত্রণার

আভাস মাত্র নেই মুখের অম্লান হাসিটিতে। সাধারণতঃ মাথা নিচু ক'রেই হাঁটেন : কিন্তু তখনও দৃষ্টি থাকে সজাগ : যার যেখানে ব্যথা সেখানেই তাঁর দৃষ্টিপ্রসাদ ঝ'রে পড়ে। সেই অনুপম সহাস্য দৃষ্টিটুকু যখন যার উপরে এসে পড়ে সেই কৃতার্থ হয়ে যায়।

প্রায় আটটা নাগাদ মহর্ষি বড় ঘরখানিতে ফিরে এসে আসন গ্রহণ করেন। একে একে নিঃশব্দে দর্শনার্থী ভক্তেরা সেই ঘরে এসে বসেন। মহর্ষির দিকে মুখ ক'রে, পূর্বাস্য হয়ে তাঁরা সবাই নিঃশব্দে বসে থাকেন ; কেউ বা চোখ বুজে ধ্যান করেন, কেউ বা দু-চোখ ভরে জীবন্মুক্ত মহাপুরুষকে একদৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন। নবাগতেরা কেউ কিছু নৈবেদ্য নিয়ে এসে তাঁর সামনে রাখেন : সঙ্গে সঙ্গে সে-বস্তু মহর্ষির নির্দেশে প্রসাদ রূপে বিতরিত হয়ে যায়। নিজের জন্য তিনি কিছুই গ্রহণ করেন না, অনন্ত করুণায় অনন্ত মমতায় অজস্র প্রসন্নতায় সকলের সব দাবী স্বীকার ক'রে নিয়ে অনন্ত ভাবে নিজেকে সকলের মধ্যে অকাতরে ছড়িয়ে দেন। কোথাও এতটুকু আড়ালের ব্যবধান থাকে না ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে। অসঙ্কোচে যে যার প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নের উত্তর পায়, কখনো কথায়, কখনো দৃষ্টিতে, কখনো মৌনতায়। হয়তো বা মায়ের কোল ছেড়ে ছোট একটি শিশু তার হাতের পুতুলটি ভগবানকে দেখাবার জন্য তাঁর হাতে এনে তুলে দেয় : মহর্ষি হাসিমুখে সেটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে আবার তার হাতে ফিরিয়ে দেন। তারই মাঝখানে মহর্ষির দৃষ্টি ঘরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত সঞ্চরণ করে ফেরে। একটি দীপের আলো যে কত দীপে কত ভাবে আলো হয়ে জ্বলে ওঠে, তার রহস্য একমাত্র সর্বান্তর্যামী ছাড়া আর কে জানবে ?

সাড়ে আটটা নাগাদ খবরের কাগজের বোঝা এসে পড়ে। কথা বলতে বলতে, তার ফাঁকে ফাঁকে, ভগবান সেগুলির উপরে একটু চোখ বুলিয়ে দেখে নেন, এবং হয়তো বা ক্বচিৎ দু'-একটা মন্তব্য করেন।

বেশিক্ষণ একভাবে বসে থাকলে বাতাক্রান্ত পা দুটি ভারি হ'য়ে ওঠে বলে প্রায় দশটার কাছাকাছি কয়েক মিনিটের জন্য ভগবান আসন ছেড়ে উঠে অঙ্গনে একটু পদাচারণা ক'রে আসেন। তার পরেই চিঠি-পত্রের স্তূপ এসে পড়ে। ভগবান প্রত্যেকটি চিঠি আগাগোড়া পড়েন এবং প্রত্যেক চিঠির উত্তর নিজের মুখে বলে দেন। উত্তরগুলি ডাকযোগে প্রেরিত হবার আগে আবার সেগুলি তিনি দেখে দেন—কিছু অদল-বদলের প্রয়োজন থাকলে তাও বলে দেন। এরই মাঝখানে সমানে চলে লোকের আসা-যাওয়া। প্রণাম ক'রে, চোখের জল ফেলে, যারা বিদায় নিয়ে যায় তাদের প্রত্যেকটি সুখ-দুঃখের বোঝা ভগবান নিজে গ্রহণ করেন। অব্যক্ত অকথিত প্রত্যেকটি নিভৃত বেদনার দোলা লাগে তাঁর বিশ্বাতীত অন্তরে।

বেলা এগারোটার সময়ে মধ্যাহ্ন-ভোজনের ঘণ্টা বাজে। ধীরে ধীরে আসন ছেড়ে উঠে সকলের সঙ্গে সমভাবে মহর্ষি ভোজন-কক্ষে কলাপাতায় আহার্য গ্রহণ করেন। সকলকে সমভাবে পরিবেশন করা হলে তবে মহর্ষি খাদ্য মুখে তোলেন। কিন্তু তাঁর নিজের আহার সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত কারুর অপেক্ষা করার তিনি পক্ষপাতী নন। এখানেও সেই সাম্য ঃ যার যখন খাওয়া হয়ে যাবে সেই আসন ছেড়ে উঠে যাবে। এই নিয়মের ব্যতিক্রম তিনি সইতে পারেন না।

মধ্যাহ্ন-ভোজনের পরে ভগবান আবার সেই বড় ঘরখানিতে যথা-স্থানে ফিরে যান এবং দর্শনার্থীরা ইচ্ছামত একে একে এসে জমায়েৎ হয়। চিরদিনের এই নিয়মটি আশ্রম কর্তৃপক্ষ ভগবানের স্বাস্থ্যহানির ভয়ে, তাঁর অগোচরে তাঁকে একটু বিশ্রামের অবসর দেবার জন্য, যখন প্রথম পরিবর্তনের প্রয়াস করেছিলেন, ভগবান তাতে ব্যথা পেয়েছিলেন। মুখে কিছু না বলে, তিনি মধ্যাহ্ন-ভোজনের পরে উপবেশন কক্ষে প্রবেশ না ক'রে তার দ্বারপ্রান্তে সিঁড়ির উপরে

বসে রইলেন। জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি বললেন, 'বেলা দুটো বাজবার আগে ও-ঘরে কারুর যাবার অধিকার যদি না থাকে—আমিই বা ও ঘরে তার আগে যাবো কেন?' শশব্যস্ত আশ্রম কর্তৃপক্ষ ছুটে এসে বললেন, 'কিন্তু ভগবান, আপনার বিশ্রামের প্রয়োজন: তাই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে।' ভগবান নির্বিকার ভাবে বললেন, 'কার প্রয়োজন? দেহের প্রয়োজন থাকে সে ভাবনা দেহের; আমার নিজের কোন প্রয়োজনই নেই—কারণ দেহ তো আমি নই। তোমাদের নিয়ম তোমাদেরই থাক। আমি এ নিয়ম মানি না: দেহের কোন প্রয়োজনও স্বীকার করি না।' শেষ পর্যন্ত বহু অনুনয় বিনয়ে নিতান্ত অনিচ্ছায় তিনি এই ব্যবস্থায় সম্মত হয়েছিলেন।

বেলা দুটো থেকে পাঁচটা পর্যন্ত ভগবান সমভাবে উপবিষ্ট থেকে সকলের সব প্রশ্নের জবাব দেন: আসা যাওয়া সমভাবে চলতে থাকে। প্রায় পাঁচটার কাছাকাছি, লাঠিতে ভর দিয়ে সামান্য কিছুক্ষণের জন্য উঠে যান। তিনি ফিরে এলেই বেদপাঠ শুরু হয়, আবার ধূপধূনার গন্ধে চারিদিক ভরে যায়। পাথরের মূর্তির মত ভগবান স্থির হয়ে বসে থাকেন, দৃষ্টি যে কোন গহনে তলিয়ে গিয়ে রহস্যময় হয়ে ওঠে তা কেউ জানে না। কখনো মনে হয় তিনি যেন লোকাতীত—সুদূর; কখনো মনে হয় তিনি যেন নিকট হতে নিকট—অতি আপনার জন, আত্মার একান্ত আত্মীয়। সে মুখের বর্ণনা নেই—সে কমনীয়তা অব্যক্ত। কখনো বহু দূর থেকে নিকটে সরে আসেন, কখনো বা অতি নিকটের মানুষটিকে আর নিকটের বলে মনে হয় না। যখন প্রাণ খুলে হাসেন, তখন মনে হয় সে হাসির তুলনা নেই। আবার যখন অকস্মাৎ গম্ভীর হয়ে যান, মনে হয় যেন সেই গাম্ভীর্যে লেগেছে অনন্তের কি এক আশ্চর্য স্পর্শ।

ঠিক সাড়ে ছটার সময়ে মহিলারা আশ্রম ছেড়ে চলে যান এবং তারই ঘণ্টাখানেক পরে নৈশভোজনের ঘণ্টা বাজে। তারপরে কখনো

বা একটু গান, কখনো বা স্তোত্রপাঠ, কখনো বা সামান্য দু-চারটি কথাবার্তার পরে সে দিনের পর্ব শেষ হয়।

ঘড়ির কাঁটা ধ'রে, দিনের পরে দিন, যে জীবনযাত্রার ধারাটি বাইরে থেকে চোখে পড়ে—তার অতল স্পর্শ গভীরে যাঁরা অবগাহন করেছেন, তাঁরা সবাই অখণ্ড মৌনতায় ডুবে গিয়ে চুপ হয়ে গেছেন। ভগবানের কথা জিজ্ঞাসা করলে তাঁদের দৃষ্টি স্থির হয়ে যায়, দু-চোখ বেয়ে নামে অশ্রুধারা। তাঁরা বলেন, 'দু-চোখ ভরে তাঁকে দেখেছি : অমূর্ত অরূপকে করেছি প্রত্যক্ষ ; প্রাণ ভরে শুনেছি তার কণ্ঠে অপৌরুষের বাণীর ঝঙ্কার ; অভিষিক্ত হয়েছি তাঁর পূণ্যদৃষ্টির অলৌকিক ঝর্ণাধারায়। কৃতার্থ হয়েছি, ধন্য হয়েছি চিরদিনের জন্য—এইটুকুই কেবল বলতে পারি। কি তিনি, কেমন তিনি, সে বিচারের সাধ্য আমাদের নেই। বাক্য দিয়ে তাঁকে বলা যায় না কারণ তিনি অব্যক্ত, বুদ্ধি দিয়ে তাঁকে বোঝা যায় না কারণ তিনি অবোধ্য, অপরিমেয়। ছাপার অক্ষরে তাঁর যে কথাগুলি লিপিবদ্ধ হয়েছে তার মধ্যে তিনি নেই : আছে কেবল তাঁর ক্ষীণ একটি প্রতিধ্বনি। তবু তাঁর মুখের কথাগুলি এই বেদনার্ত সংসারের পরমতম সম্পদ—অতি অভ্রান্ত পথপ্রদর্শক। দ্বিধাহীন চিত্তে তাঁর নির্দিষ্ট পথ ধরে চলবার যে প্রয়াস করবে, চিরদিনের ভগবান স্বয়ং তার পরিচালনার ভার নেবেন।'

মহর্ষি রমণের এক প্রাচীন ভক্ত, স্বামী রমণানন্দ সরস্বতী ঐকান্তিক শ্রদ্ধায় ১৯৩৫ সাল থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত তাঁর সান্নিধ্যে থেকে দৈনন্দিন কথাবার্তার ধারাবাহিক বিবরণ লিখে রেখে ছিলেন বলেই তাঁর মুখের কথার যথাযথ প্রতিধ্বনি কিছুটা পাওয়া যায়। প্রায় সাড়ে সাত-শত পৃষ্ঠার এই গ্রন্থখানিতে যে সমস্ত প্রশ্নোত্তর লিপিবদ্ধ হয়েছে, তার প্রত্যেকটি কথা প্রামান্য বলে স্বীকৃত হওয়ায়, তত্ত্বজিজ্ঞাসুর কাছে এখানি অমূল্য। কত দেশের, কত বয়সের, কত স্তরের, কত ভাবের কত নরনারী, কথিত অকথিত কত প্রশ্ন, কত জিজ্ঞাসা, কত আবেদন

নিবেদন, কত সমস্যা, কত কৌতুহল নিয়ে এই কয়েক বৎসরে ভগবানের কাছে এসেছে, থেকেছে, অঞ্জলি ভরে পান করেছে তৃষ্ণার জল, যার পাত্রে যতখানি ধরে, ভরে নিয়ে গেছে অনন্ত পথের পরম পাথেয়।

ভগবান রমণের কাছে যারা যখন এসেছে তারা সকলেই যে আধ্যাত্মিক পিপাসায় জিজ্ঞাসুর দৈন্য নিয়ে এসেছে তা বলা চলে না। স্বভাবতঃ যারা সংশয়াত্মা, তারা হয়তো এসেছে নিজেদের সাড়ম্বরে জাহির করবার অভিপ্রায়ে, কিংবা যাচাই ক'রে দেখবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু এই অন্তর্যামীর অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে কোন ছদ্মবেশই টেকে নি।

একবার এলো এক প্রচণ্ড জ্ঞানগর্বী—আত্মশ্লাঘার জীবন্ত বিগ্রহ। সামান্য ক্ষণের মধ্যেই জ্ঞানবাদ, ভক্তিবাদ, কর্মবাদ ইত্যাদির বিস্তারিত ব্যাখ্যানা ক'রে বেশ বুঝিয়ে দিল যে তার কোন কিছুই জানতে বাকি নেই। সাড়ম্বরে তারস্বরে প্রাচ্যপাশ্চাত্য দর্শনের যাবতীয় বাঁধাবুলি আউড়ে, বিস্তর ভনিতা ক'রে বললো, 'যেদিকে তাকাই সমস্যার বেড়াজাল ; ইনি বলেন এক কথা, উনি বলেন আর এক কথা। কারুর সঙ্গে কারুর মতের ঐক্য নেই। কার কথা যে ঠিক, কার কথা যে বেঠিক, কিছুই বোঝবার উপায় নেই বলে হতাশ হ'য়ে হাতড়ে বেড়াতে হয়। সেই সমস্যার সমাধানের জন্যই এসেছি আপনার কাছে। আপনি বলুন দেখি কোন পথে আমার যাওয়া উচিত।'

মৃদু হেসে ভগবান চুপ ক'রে রইলেন দেখে আগন্তুক একটু অধীর হ'য়ে বললেন, 'বলুন না দয়া ক'রে কোন পথে আমি চলি।'

আসন ছেড়ে উঠতে উঠতে ভগবান নিস্পৃহ ভাবে বললেন, 'যে পথে এসেছো সেই পথেই যাও'। দ্বিতীয় কথা না বলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। তাঁর ভাবে মনে হ'ল আর কিছুই তাঁর বলবার নেই।

স্তম্ভিত প্রশ্নকর্তা উপস্থিত ভক্তমণ্ডলির উদ্দেশে জিজ্ঞাসা করলো—'এ কেমন উত্তর হ'ল ? আমার এতগুলি প্রশ্নের কি এই উত্তর ?'

মহর্ষি কি আমাকে এখান থেকে বিদায় ক'রে দেবার ইঙ্গিত ক'রে গেলেন ?'

প্রশান্ত মুখে ভক্তেরা বললেন, 'ভগবানের উত্তর ঠিকই হয়েছে ; একটু প্রণিধান ক'রে দেখলেই আপনি বুঝতে পারবেন। যেখান থেকে আমিত্বের উদ্ভব সেই কেন্দ্রেই আপনাকে ফিরে যেতে বলেছেন। শিক্ষণীয় যা কিছু সে তো আপনার শেখা হয়ে গেছে : বাকি আছে হওয়ার। সেই হওয়ার পথের ইঙ্গিত আছে এই কথায় : ভগবানের কথাটি সেই অর্থে গ্রহণ করাই আপনার পক্ষে সমীচীন হবে।'

স্ত্রীবিয়োগ বেদনায় মুহ্যমান হয়ে এলেন এক রাজকর্মচারি। কোন কিছুই জিজ্ঞাস্য তাঁর ছিল না। ব্যাথাহত প্রাণে প্রহরের পর প্রহর তিনি সবাইকার মাঝখানে চুপ ক'রে বসে ছিলেন। কিন্তু তাঁর মৌনবেদনা মহাপ্রাণের অগোচর রইলো না। তাঁরই দিকে করুণার দৃষ্টি মেলে মহর্ষি আপন মনে বলতে লাগলেন, 'আহা বিচ্ছেদের এই বেদনায় জ্ঞানীরাও বিহ্বল হ'য়ে পড়েন, কারণ স্ত্রী যে অর্ধাঙ্গিনী। বহির্দৃষ্টিতে দেখলেই যত বেদনা। কিন্তু আত্মস্থ হ'লে আর বেদনা থাকে না, কারণ আত্মবস্তুর সঙ্গে স্ত্রী বা অন্য প্রিয়জনকে মিলিয়ে দেখলে আর বিয়োগ ব্যথার অস্তিত্ব থাকবে কোথায় ? আত্মকে দেহ বলে ভুল করলেই আসে মৃত্যুর ব্যবধান : বেদনার বোধ আসে এই ভ্রান্তি থেকে। যা অসত্য তার অস্তিত্ব নেই ; যা সত্য তার বিনাশ নেই। জন্ম যেমন মিথ্যা, মৃত্যুও তেমনি মিথ্যা। তোমার গৃহ হতে অনুপস্থিত কালে বা তোমার সুসুপ্তি কালে তোমার স্ত্রীর অস্তিত্ব তোমার কাছে ছিল না। যতক্ষণ তিনি তোমার চোখের আড়ালে থাকতেন, তুমি জানতে যে তিনি আছেন : এখন তাঁর দেহ নেই বলে ভাবছো তিনি নেই। 'আছে' বোধটিও যেমন ছিল মনের সৃষ্টি, 'নেই' বোধটিও তেমনি মনেরই সৃষ্টি। তা ছাড়া মৃত্যুতে শোকের কি আছে ? দেহ বন্ধন থেকে মুক্তির রূপ হ'ল মৃত্যু।'

যাকে উদ্দেশ্য ক'রে ভগবান এই কথাগুলি বললেন, তিনিই

কেবল বুঝলেন। বহুদিনের পুঞ্জীভূত শোকের গ্লানি এই কয়েকটি মুহূর্তের মধ্যেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। সেদিনকার অধিবেশন শেষ হয়ে যাবার পরে তিনি একান্তে গিয়ে জনৈক বন্ধুর কাছে তাঁর অভিজ্ঞতা এইভাবে বর্ণনা ক'রেছিলেন—'ভগবান আমার দিকে দৃষ্টিপাত করার সঙ্গে সঙ্গে আমার মধ্যে কি যেন এক আশ্চর্য ভাবান্তর শুরু হয়ে গেল। আমার অন্তরের বিষাদ-ভার যে কোথায় মিলিয়ে গেল, আমি জানি না। আমার বোধ হ'তে লাগলো যেন আমার অন্তরের সমস্ত তমসা ভগবান স্বয়ং করুণার দৃষ্টি দিয়ে আকর্ষণ ক'রে নিলেন। যে নিদারুণ শোক ভুলতে না পেরে ছুটির পরে ছুটি নিয়ে দেশে-দেশান্তরে পাগলের মত ছুটোছুটি ক'রে বেড়িয়েছি, কোন কিছুতে মন বসাতে পারি নি, নিজেকে ভোলাবার চেষ্টায় তীর্থে তীর্থে মাথা কুটে বেড়িয়েছি এবং শেষ পর্যন্ত নিরাশ হ'য়ে, জীবনে বীতরাগ হ'য়ে, চিরদিনের জন্য সংসার ছেড়ে, চাকরি ছেড়ে পালিয়ে যাবার চিন্তা করেছি—অকস্মাৎ ভগবানের সান্নিধ্যে এসে আমি তার দুঃসহ পীড়ন থেকে কেমন ক'রে এত সহজে নিষ্কৃতি পেলাম জানি না। অনেকবার শোনা, অনেক দিনের জানা কথাগুলিই শুনলাম তাঁর মুখে। কাজেই, কেবল কথায় যে কিছু হয় নি তা আমি বুঝি। কথাগুলি কিছু নয়ঃ যেখান থেকে কথাগুলি এলো, সেইখানে আমার বেদনার বিষ ভগবানের দৃষ্টিপথ ধরে চলে গিয়ে নিঃশেষে মিশিয়ে গেল। নীলকণ্ঠের মত তিনি স্বয়ং আকর্ষণ ক'রে নিলেন আমার প্রাণের অগ্নিদাহন। আমাকে কিছুই করতে হয় নি। যা করবার তিনিই করেছেন তাঁর অনন্ত কৃপায়। কেউ না জানুক—এ সত্য আমি অন্তরে অন্তরে টের পেয়েছি।'

ঐশ্বরিক দর্শণের প্রসঙ্গে একজন জিজ্ঞাসা করলেন; 'শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন ক'রে ঈশ্বরের দেখা পেয়েছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলেন তা কি আমাদের হতে পারে না?'

মহর্ষি বললেনঃ 'কেন হবে না? খুব হতে পারে। পরস্পরের

সঙ্গে যখন আমরা কথা বলতে পারি, তখন ঈশ্বরের সঙ্গেই বা কথা বলা যাবে না কেন? কিন্তু তাতেই বা লাভ কি? স্থূল দেহে যেমন স্থূল বস্তু দেখা যায়, স্বপ্নে যেমন স্বপ্নগোচর সূক্ষ্মবস্তু দেখা যায়—তেমনি দ্রষ্টার মানসিক অবস্থার অনুকূল মূর্তি স্বপ্নে, এমন কি জাগ্রত অবস্থাতেও দেখা পাওয়া সম্ভব। ঐশ্বরীয় মূর্তি সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। এরূপ দর্শণের মাঝেও দ্রষ্টা ও দৃশ্য সমভাবে বিদ্যমান থাকে। আত্মজ্ঞের অবস্থা এরও অনেক উপরে। এখানে দ্রষ্টাই থাকেন এক এবং অদ্বিতীয় রূপে: যে দেখে সেও থাকে না, দেখবারও কিছু থাকে না। ধ্যেয় বস্তুকে পিছনে ফেলে ধ্যান যখন নিজের গভীরে তলিয়ে যায়, তখন আর কে কাকে দেখবে, কে কার সঙ্গে কথা বলবে? নামদেবের গল্প বলি শোন। অনেক বছর আগেকার একটি সত্য কাহিনী।

'নামদেব ছিলেন পরম ভক্ত, পরম সাধক। গৃহদেবতা বিঠোবার সঙ্গে ছিল তার সখ্যতার বন্ধন। বিঠোবা প্রত্যক্ষরূপে তাঁর সঙ্গে খেলা করতেন। তিনিও সারাদিন সেই খেলায় মশগুল হয়ে থাকতেন। যাঁরা এই গোপন রহস্যের কিছু কিছু জানতেন তাঁরা নামদেবকে সিদ্ধপুরুষ বলে ভক্তি শ্রদ্ধা করতেন।

'নামদেবের অসামান্য মহত্বের সৌরভ যখন দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে গেছে, তখন মহামুনি জ্ঞানদেবের সভাপতিত্বে এক ধর্মমণ্ডলির অধিবেশনে তিনি আমন্ত্রণ পেলেন। দেশ-দেশান্তরের বহু সিদ্ধপুরুষ সেই সভায় সমবেত হয়েছিলেন। ঋষি গোরা কুম্ভকারও ছিলেন সেই সভায়। জ্ঞানদেব বললেন: 'এখানে যাঁরা উপস্থিত, সকলেই সিদ্ধপুরুষ, সন্দেহ নেই। কিন্তু সবাই সমান স্তরের নন। কে কোন স্তরের নির্ণয় করা প্রয়োজন। মুনি গোরা এ কর্মের উপযুক্ত কারণ তিনি ছিলেন কুম্ভকার, এবং হাঁড়ি কলসী পরীক্ষা ক'রে ক'রে, কি ক'রে একটু বাজিয়ে দেখে তাদের উৎকর্ষ ধরা যায়—এ বিদ্যা তিনি আয়ত্ত

করেছেন। সমবেত সমস্ত সিদ্ধপুরুষেরা এই প্রস্তাবে সহাস্যে সম্মতি দিলেন। গোরা কুম্ভকারও হাসতে হাসতে একে একে প্রত্যেকটি সিদ্ধপুরুষের মাথায় তার হাতের দণ্ডটি মৃদুভাবে ঠুকে ঠুকে নির্ণয় করতে লাগলেন কে কতটা সিদ্ধপুরুষ।

'নামদেব গোড়া থেকেই মনে মনে এই কার্যক্রম পছন্দ করেন নি। সবাইকার বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারেন নি, কিন্তু গোরা কুম্ভকার যেই দণ্ডহস্তে তাঁর সমক্ষে এসে দাঁড়ালেন, তখন হঠাৎ উত্তেজিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে উঠে তিনি বললেন, 'এ পরীক্ষা হাস্যকর, এ আমি মানি না। আমার মাথায় দণ্ডাঘাত করিয়ে আমার সিদ্ধত্বের প্রমাণ আমি দেব না। এ সম্মেলনের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই। বিঠোবার চেয়ে বড় ত্রিসংসারে আর কেউ নেই। স্বয়ং তিনি আমাকে বন্ধুত্বের মর্যাদা দিয়েছেন। তাঁর দরবারেই আমি চললাম। এখানকার এই ছেলেখেলায় আমার কিছুমাত্র সম্মতি নেই।'

'সামান্য ব্যাপারে নামদেবের এই আকস্মিক উত্তেজনা ও উষ্মা দেখে সভাস্থ সকলে হেসে গড়িয়ে পড়লো। নামদেব ভ্রূকুটিভঙ্গে সেই উপহাস অগ্রাহ্য ক'রে বীরদর্পে বিঠোবার মন্দিরে চলে গেলেন।

'বিঠোবা নিস্পৃহভাবে তাঁর কথা শুনে বললেন, 'তাই তো! ঋষিদের নির্দেশ অমান্য ক'রে চলে আসা তোমার উচিত হয় নি। তাঁদের অভিমতের উপরে তো আর কিছুই বলা চলে না। বরং তুমি তাঁদের কাছে ফিরে গিয়ে অপরাধ স্বীকার ক'রে মার্জনা ভিক্ষা করো। তাঁদের নির্দেশ মানতেই বা আপত্তি কি?'

'ক্রোধে অভিমানে ফেটে পড়ে নামদেব বললেন, 'বলো কি তুমি? আমাকে তুমি বন্ধু বলে স্বীকার করেছো। স্বয়ং ঈশ্বরের সঙ্গে আমি খেলি, কথা বলি। সেই আমারও মাথায় দণ্ডাঘাত ক'রে পরীক্ষা করবে গোরা কুম্ভকার—আর তাই আমাকে মেনে নিতে বলছো তুমি নিজে?'

'বিরস বদনে বিঠোবা বললেন, 'বলছিই তো! ঋষিদের নির্দেশ যে অমোঘ। তাঁদের জানার উপরে যে আর কথা চলে না।'

'নামদেব হতবুদ্ধি হয়ে বললেন, 'এ তোমার কেমন কথা? তোমার চেয়ে বড়, তোমার চেয়ে সত্য—আর কিছু হওয়া কি সম্ভব। আমি তোমার নিজের মুখে শুনতে চাই, তুমি আমাকে বলো, তোমার উপরে কি আর কিছু কোথাও আছে?'

'বিঠোবা গম্ভীর মুখে বললেন, 'শোন নামদেব, তোমাতে আমাতে এতদিন ধরে এত ঘনিষ্টভাবে মিশেছি যে সেই ঘনিষ্টতার ফলে, আমি কিছু বললে তুমি আমার কথা সর্বান্তঃকরণে মেনে নিতে পারবে না। আমার কথায় তোমার মনের দ্বিধা ঘুচবে না। তাই বলছি, এ কথার উত্তর আমার কাছে না চেয়ে, তুমি বরং বনে গিয়ে ভিক্ষাজীবি মহর্ষির কাছে তোমার প্রশ্নের উত্তর প্রার্থনা করো। তাঁর কথা হয়তো বা তুমি অবিশ্বাস করবে না।'

'অভিমানক্ষুণ্ণ স্বরে নামদেব বললেন, 'তুমি যাঁকে নির্দেশ করলে, নিশ্চয়ই উপযুক্ত মনে করেই তা করেছো। তুমি যখন কিছু বলবে না, অগত্যা তাঁর কাছেই আমি চললাম। এ আমার দুর্ভাগ্য যে তোমার বন্ধুত্বের অধিকারী হয়েও আমাকে কোন এক অজ্ঞাতকুলশীল নরদেহধারীর দ্বারস্থ হতে হবে।'

'বহু অনুসন্ধানে যে যতিপ্রবরের তিনি সাক্ষাৎ পেলেন, তাঁকে নামদেব শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতে পারলেন না। জীর্ণ শিবমন্দিরের অপরিচ্ছন্ন নোংরাভূমিতে ক্লেদাক্ত-দেহ উলঙ্গ এক সাধু শিবলিঙ্গের উপরে পা রেখে শুয়ে আছেন দেখে তিনি অবজ্ঞা-ভরা দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে ভাবলেন—এ আবার কোনদেশী সাধুপুরুষ? সাধু হাসিমুখে তাঁর দিকে চেয়ে যখন বললেন, 'বোসো নামদেব, বিঠোবা তোমাকে পাঠিয়েছেন, আমি জানি।' তখন বুঝি নামদেব সামান্য একটু অভিভূত হলেন। কিন্তু তবু দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে বললেন, 'তুমি জ্ঞানী-

পুরুষ হয়ে শিবলিঙ্গের উপরে পা রেখে শুয়ে আছো কেন?' সাধু বললেন, 'তাই তো! বয়স হয়েছে অনেক, দেহ হয়েছে অশক্ত, না বুঝে ক'রে ফেলেছি অনাচার। শরীরে এমন জোর নেই যে পা সরিয়ে রাখি। তুমি যখন ত্রুটি দেখিয়েই দিলে, তখন কৃপা ক'রে আমার পা দুটি এমন স্থানে সরিয়ে দাও যেখানে এ অপরাধ আর ঘটবে না।'

'নামদেব তৎপরতার সঙ্গে পা দুটি সরিয়ে অন্যত্র রাখলেন। কিন্তু যেখানে পা সরালেন সেইখানেই দৃশ্যমান হয়ে উঠলো আর একটি শিবলিঙ্গ; আবার অন্যত্র পা সরালেন, সেখানেও দেখা গেল সেই একই ব্যাপার। শেষে আর কোন স্থান না পেয়ে ভূতলশায়ী মহাত্মার চরণদুটি নিজের বক্ষে ধারন করার সঙ্গে সঙ্গে আত্মসমাহিত স্থানুর মত হ'য়ে গেলেন। চৈতন্যের গভীরতায় ডুবে গিয়ে, মহাসমাধিতে নিমগ্ন হয়ে রইলেন। অবশেষে জাগতিক চেতনায় ফিরে এসে, স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন ক'রে, নিজের কুটিরে দ্বার বন্ধ ক'রে অবস্থান করতে লাগলেন।'

'ওদিকে খেলার সাথীর দীর্ঘ অদর্শণে বিঠোবার খেলাটি আর তেমন জমছিলো না। নামদেবের ফেরার নাম নেই দেখে তিনি মন্দির ছেড়ে বেরিয়ে এসে নামদেবের কুটিরে হাজির হ'য়ে বললেন, 'ব্যাপার কি তোমার? আমাকে একা ফেলে নিজের ঘরে এসে লুকিয়ে আছো যে বড়? নামদেবের মুখে হাসি, দু-চোখে অশ্রুধারা। তিনি বললেন, 'কেন ছলনা করো প্রভু? যেখানে যখন আছি, তোমাকে নিয়েই তো আছি। আমার মধ্যে বসেই তো এতক্ষণ খেলছিলে; এখন আবার বাইরে থেকে এসে কি খেলা খেলতে চাও? এখন থেকে আমার এই ঘরে আর তোমার মন্দিরে ব্যবধান রইলো না। আমার বাহির তুমি ঘুচিয়ে দিয়েছো: বাহিরে অন্তরে প্রভেদ তুমি রাখতে দাও নি। আমার প্রাণের মন্দির হবে তোমার এখানকার খেলাঘর। তোমার পাথরের মন্দিরে তোমাকে আর আমি খুঁজতে যাবো না।'

নামদেবের এই আখ্যায়িকাটি প্রাচীন, কিন্তু তথাপি ভগবান রমণের বাচনভঙ্গির যথাযথ অনুসরণ ক'রে সেই অনুপম কাহিনীটি বিবৃত করা হ'ল। এই ক্ষুদ্র কাহিনীর মাধ্যমে এই প্রেমময় পুরুষের প্রাত্যহিক কথকতার খানিকটা আভাস পাওয়া যাবে বলেই তাঁর জীবনকাহিনীর পরিপ্রেক্ষিতে এর সার্থকতা।

গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত সারাজীবন ধরে ভগবান রমণ যে চরমতম সত্যের পরমতম উপলব্ধির কথা বলেছেন তার ভাব মাত্র একটি, কিন্তু বৈচিত্র অনন্ত। অসীম মমতায়, অপরিসীম ধৈর্যে তিনি গূঢ়তম, গোপনতম আত্মতত্ত্বকে বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন ভাষায় উদ্ঘাটিত ক'রে দিয়েছেন। ভাষায় যা বলা যায় না, তা বলেছেন মৌনতায়; জিজ্ঞাসুর অক্ষমতা পূরণ করেছেন গুরুশক্তির অনুপ্রাণনায়, জটিল বিষয়কে সহজ ক'রে দিয়েছেন নব নব কথিকার সাহায্যে। অথচ, কোন দিন কোন ছলে নিজের অলৌকিক মহত্ব কথায় বা কাজে স্বীকার করেন নি। তাঁর কৃপার সমুদ্রে অবগাহন ক'রে জনৈক য়ুরোপীয় ভক্ত তাঁর অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে বলেছিলেন, 'আমার জীবনে তুমি দেবদূতের মত আবির্ভূত হয়েছ। আমার মত সামান্য, নগন্য প্রাণীও তোমার দৃষ্টিপ্রসাদ লাভে যে এমন ক'রে ধন্য হতে পারে সে ধারণা আমার ছিল না। তুমি যে সাধনা দিয়েছ তা আমি যথাযথ ভাবে নিতে পারি নি বলে আমার মনে কুণ্ঠা ছিল। কিন্তু তোমার সমক্ষে এসে যখনই বসেছি, দেখেছি কি অচিন্ত্যনীয়ভাবে আমার অন্তর কানায় কানায় ভরে গেছে। সে সাধনার সাধ্য আমার ছিল না, তারই পরিপূর্ণ ফলটির আস্বাদ আমি পেয়েছি তোমার কৃপায়। ঈশ্বর বলতে কি বোঝায় আমি জানি না, কিন্তু ঐশ্বরিক মহিমার এর চেয়ে পরিপূর্ণ প্রকাশ আমি কল্পনা করতে পারি না।'

ভগবান রমণ অতিষ্ঠ হয়ে বলেছিলেন; 'এসব কি কথা তুমি

পাগলের মত বলছো! আমার সান্নিধ্যে আবার কি এমন আছে যে তার কথা এত ক'রে বলা যায়? আরে না না, এ সব তোমার মনের ভুল। পরম শান্তির আস্বাদ তুমি পেয়েছো—সে হ'ল আত্মবস্তুর ঐশ্বর্য। যা তোমার নিজের মধ্যে আছে, তাই তুমি বোধ করেছ; যা একান্তভাবে তোমার নিজস্ব বস্তু—এ আস্বাদন তারই। বাইরে থেকে কে, কাকে কি দিতে পারে? এখানও যা, অন্য যে-কোন স্থানও তাই। নিছক কল্পনায় তুমি ভাবছো স্থান কাল পাত্রের কাছে তুমি ঋণী। এসব ধারণার কোন ভিত্তি নেই।'

আত্মনিবেদনের প্রসঙ্গে জনৈক ভক্ত ভগবানকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'এক আত্মবস্তু ছাড়া দ্বিতীয় কোন বস্তু যখন নেই, তখন আত্মসমর্পণের কথা ওঠে কি ক'রে? সমর্পণ করতে হলেই তো দুইয়ের নিরপেক্ষ অস্তিত্ব মেনে নিতে হয়। যদি পরমাত্মা এক এবং অদ্বিতীয় হন—তাহ'লে কে কাকে করবে আত্মসমর্পণ? অথচ শাস্ত্রে আছে—গুরুর কাছে, ঈশ্বরের কাছে, আত্মসমর্পণের কথা: এক পক্ষ নিজেকে নিঃশেষে নৈবেদ্যের মত ক'রে উৎসর্গ ক'রে দিলে তবে অপর পক্ষ তাকে গ্রহণ ক'রে ধন্য করবেন।'

একঘর লোক উৎকর্ণ হ'য়ে রইলো ভগবানের উত্তর শোনবার জন্য। কিন্তু মনে হ'ল যেন তিনি প্রশ্নটি শুনেও শুনলেন না।

একটু পরে, কথা প্রসঙ্গে ভগবান বললেন, 'এ অঞ্চলের লোকের মধ্যে গণপতি-পূজার রীতি প্রচলিত আছে। গণেশ পূজা না ক'রে এ অঞ্চলের অনেকেই কোন আহার্য গ্রহণ করে না। এমন অনেক আছে যারা গণেশের প্রসাদ না পেলে উপবাস ক'রে থাকতেও প্রস্তুত। এমনি এক গণেশ-ভক্ত পথচারী দেশান্তরে যেতে যেতে গণেশ মন্দির খুঁজে খুঁজে হায়রান হয়ে গেল। ক্ষুধার আগুন জ্বলছে উদরে, খাদ্য আছে সঙ্গে: কিন্তু গণেশ-পূজার প্রসাদ না পেলে কিছু খাওয়া চলে না। তখন এক ঝর্ণার ধারে বসে, পুঁটুলি থেকে গুড়

আর ময়দা মিশিয়ে নিজেই এক গণেশমূর্তি গড়ে, ফুল-বিল্বপত্রে তার পূজা করলো। কিন্তু সঙ্গে যে গুড়টুকু ছিল তা বিগ্রহ গড়তেই ব্যয় হয়ে গেছে। এখন তার সমস্যা হ'ল নৈবেদ্যের উপকরণ নিয়ে। কেবল ময়দা দিয়ে তো আর দেবতার ভোগ নিবেদন করা যায় না। আবার বিনা নৈবেদ্যে পূজারও থাকে না সার্থকতা। তখন বেচারা আর কি করে। শেষ পর্যন্ত অতি সন্তর্পণে তার নিজের গড়া গণেশ-বিগ্রহের একাংশ ভেঙে নিয়ে, তাই দিয়েই ময়দা সহযোগে দেবতাকে নৈবেদ্য প্রদান করলো। সে যে তার দেবতারই অঙ্গহানি ক'রে, দেববিগ্রহের একাংশ দিয়েই তাঁর ভোগ দিচ্ছে, এবং এমনতর পূজার যে অর্থ হয় না—এই সামান্য কথাটা তার মনে হ'ল না।'

'মানুষটি ছিল সরল ঃ তাই এই দ্বিবিধ অপকর্ম ক'রেও তার বিবেক পীড়িত হয় নি। কিন্তু জ্ঞান বুদ্ধি বিচার সব থাকা সত্ত্বেও, তোমরা যে আত্মসমর্পণের কথা বলো, এও কি সেই জাতীয় নয়? সর্ব্বভূতমহেশ্বর একমাত্র পরমসত্ত্বা থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন পৃথক সত্ত্বা বলে বা স্বতন্ত্র অহংরূপে কল্পনা ক'রে যে আত্মসমর্পণের ভাণ তোমরা করো, তার মধ্যে আগাগোড়া ভ্রান্তি জড়িয়ে আছে। আত্মসমর্পণ করো বা না করো একই কথা, কারণ বিনা-সমর্পণেও তোমরা সমর্পিত হ'য়েই আছো। এক অখণ্ড চৈতন্যবস্তুর বিভিন্ন স্ফুলিঙ্গগুলি নিজেদের স্বাতন্ত্র্য কল্পনা ক'রে বিভিন্নতা ও বিশিষ্টতার বোধ খাড়া ক'রে রাখে বলেই আত্মসমর্পণের ছলে, মন ভোলানো দ্বৈতবাদের সৃষ্টি হয়। একমাত্র যিনি অনাদি অনন্ত ভাবে স্থান কালের বিভেদ অতিক্রম ক'রে অদ্বিতীয় রূপে বিরাজ করছেন—তিনিই একক সত্য ঃ আর সমস্ত কিছুই ভ্রান্তি। আমি যে আছি এর চেয়ে বড় সত্য আর নেই। কে আমি, কোথা থেকে এলো এই 'আমির' বোধ, এই রহস্য-ভেদ চিন্তা দিয়ে হবে না, চিন্তার নিবৃত্তি হলে তবে হবে। ভুলে-যাওয়া কোন কথা স্মরণ করতে হলে যেমন মনকে চিন্তাবিমুক্ত করতে হয়, ঠিক তেমনি ভাবেই অহংচিন্তার

উৎসমুখে তলিয়ে যাওয়ার নামই প্রকৃত আত্মসমর্পণ। অহংচিন্তার উৎসপথে নিমজ্জিত হলেই এই সমর্পণ পূর্ণ হয়। সংস্কারে জড়িয়ে আছে চিন্তা : তারা তো মাথা তুলে উঠবেই, পথ আগলে দাঁড়াবেই। কিন্তু জিজ্ঞাসাটি জাগিয়ে রাখতে পারলে ধীরে ধীরে এ বাধা সরে যাবে। এরই নাম আত্মসমর্পণের সাধনা। প্রতিনিয়ত অভ্যাস করতে করতে এই সাধনায় অহংকেন্দ্রিক জীব আত্মকেন্দ্রিক শিবে পরিণত হয়ে যায়।'

সারাজীবন ধরে মহর্ষি বলেছেন এই একটি কথা : অধিকারী-ভেদে প্রত্যেকবার বিভিন্নভাবে। এই মহাবাণীর কিছু বা লোকে বুঝেছে কিছু বা বোঝেনি। কিন্তু রিক্ত হস্তে কেউ ফিরে যায় নি। অনেক সময়ে এমনও হয়েছে যে একজনকে উপলক্ষ্য ক'রে দেওয়া উপদেশ আর একজনের অন্তরে জাগিয়েছে অপ্রত্যাশিত ঝঙ্কার। আবার এমনও হয়েছে যে ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে মৌনতার ভাষায় কি যে আদানপ্রদান হয়েছে, তার কোন ইঙ্গিত তৃতীয় ব্যক্তির কাছে কিছুমাত্র ধরা পড়েনি। ছাপার অক্ষরে যতটুকু বিবরণ পাওয়া যায়, তার সমস্তটাই এই মহাজীবনের সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ ভাষ্য-বিশেষ হ'লেও, সে যে সত্যের আলোকে সমুজ্জ্বল তার প্রমাণ পাওয়া যায় ছত্রে ছত্রে। পড়তে পড়তে ক্ষণে ক্ষণে মনে চমক লাগে : মনে হয় যেন, একটুখানি হাত বাড়ালেই আকাশ ছোঁয়া যায়; হয়তো বা সেটুকু আয়াসও না করলে চলে, কারণ—এই তো সত্যস্বরূপ, এই তো আত্মা, এই তো পরমসত্তা দিকদিগন্ত আবৃত আচ্ছাদিত ক'রে ঘিরে আছে : এই তো রয়েছি তারই সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে একাকার হয়ে মিশিয়ে। জানি বা না জানি, চাই বা না চাই, আমরা যে পেয়েই আছি, হয়েই আছি—বিদ্যুৎচমকের মত এই চেতনার স্ফুরণ যেন চোখের সামনে দপ্ দপ্ ক'রে জ্বলে আর নেভে, নেভে আর জ্বলে।

কত বিচিত্র মানুষ কত বিস্ময়কর ভাবে যে মহর্ষির কাছে এসে

দাঁড়িয়েছে, দু-হাত ভ'রে কি সম্পদ নিয়ে গেছে সে রহস্য লোকাতীত। প্রসঙ্গক্রমে সমারসেট মমের কথা উল্লেখ করা যায়। বিশ্ববিখ্যাত এই ইংরাজ সাহিত্যিক ভগবানের সান্নিধ্যে কিছুক্ষণ অবস্থান ক'রে, অস্থির হ'য়ে উঠে গেলেন আশ্রমবাসী ভক্ত স্যাড্উইকের কক্ষে। সেখানে গিয়েই তিনি অচৈতন্য হয়ে গেলেন। স্যাড্উইক দেখলেন তাঁর দৃষ্টি বিস্ফারিত, দু-চোখ দিয়ে জল পড়ছে, মুখে কথা নেই, চেতনা আচ্ছন্ন। উদ্বিগ্ন হ'য়ে তিনি ভগবানকে সমস্ত কথা জানালেন। তাঁর অনুরোধে ভগবান নিজে সেই ঘরে এসে আসন গ্রহণ ক'রে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন শয্যাশায়িত ব্যক্তিটির দিকে। সামান্য ক্ষণের মধ্যেই মমের চেতনা ফিরে এলো। তিনি উঠে বসে ভগবানকে নমস্কার ক'রে স্থির দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন। দুজনেই চুপ। মম্ দু'একবার প্রশ্ন করবার উদ্যোগ করলেন, কিন্তু কিছুই বললেন না। স্যাড্উইক বারংবার তাঁকে প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করলেন, কিন্তু মম কিছুই জিজ্ঞাসা করলেন না। প্রায় ঘণ্টাখানেক কাটলো এমনি অখণ্ড নিস্তব্ধতায়। শেষে ভগবান বললেন, 'অন্তরের কথা মৌনতায় হয়ে গেছে। ওঁর কথা আমি শুনেছি ঃ আমার উত্তরও উনি পেয়েছেন। যা কিছু কথা ছিল সব বলা হয়ে গেছে ঃ কিছুই বলার বাকি নেই।' এই পর্যন্ত বলে ভগবান আসন ছেড়ে উঠে স্বস্থানে ফিরে গেলেন।

ভগবান রমণের কথা বলতে গেলে পদে পদে মনে হয় তাঁর প্রত্যেকটি কথা যেমন অর্থপূর্ণ তেমনি রহস্যময়। পরিচিত কোন সংজ্ঞা দিয়ে যাঁকে নিরূপণ করা যায় না, তার আগাগোড়া সমস্তটাই মনে হয় অলোকসামান্য। তবু কথাগুলি শুনতে ভালো লাগে, বুঝলেও ভালো লাগে, না বুঝলেও ভালো লাগে। তাঁর প্রসঙ্গে যা কিছু বলা যায়, যা কিছু ভাবা যায়, তাতেই যেন মনের মুক্তিস্নান হয়। দেহমনের সমস্ত মালিন্য ধুয়ে মুছে আত্মসত্ত্বা পবিত্র হ'য়ে যায় তাঁর নামে। কেবল সেই কারণেই আছে এই আলোচনার সার্থকতা। যে

কাহিনীর আদি-অন্ত নেই, যে মহাজীবনের সীমা-সংজ্ঞা নেই, তারই একটি অতি সংক্ষিপ্ত, অতি অসম্পূর্ণ ও অতি অক্ষম দিগদর্শন মাত্র এখানে পাওয়া যাবে। শ্রী ভগবানের অনুধ্যান বা অনুস্মৃতি হিসাবেই এর একমাত্র সার্থকতা।

দূরের মানুষ, কাছের মানুষ, ভগবান রমণকে কে চিনবে? তিনি বলেছেন, 'নিজেকে যে জেনেছে তার তো কোথাও কোন বাধা নেই; অপরের কান্নায় সে কাঁদে, অপরের হাসি-খেলায় সে যোগ দেয়, সবাইকার গানের সুরে নিজের কণ্ঠ সে মিলিয়ে দেয়। কেন দেবে না? কেউ তো তার পর নয়, কেউ তো তার বাইরে নয়। দর্পণের মত স্বচ্ছ তার অস্তিত্বে ছায়ার মত খেলা করে বিশ্ব-সংসারের বহুবিচিত্র ছবি। চিত্রের পরে চিত্র আসে যায় সেই দর্পণের বুকে। দর্পণ অসংশ্লিষ্ট, উদাসীন, নির্বিকার। তার কিছুতেই কিছু এসে যায় না। দ্রষ্টার মত সে দেখে যায়। আনন্দ-বেদনার সুরে সুরে সে সাড়া দেয় এই পর্যন্ত। তার করার কিছু না থাকলেও, সে যন্ত্রের মত সব কিছু ক'রে যায়, সবাইকার সঙ্গে হাত মিলিয়ে।'

ভগবানের মুখের এই কথাগুলি শুনতে শুনতে ভক্ত ভাবে—'তবে আমরা কেন এমন হতে পারি না? আমরা কেন পদে পদে নিজেকে ভুলে গিয়ে দুঃখ-সুখের পাকে পাকে এমন ক'রে জড়িয়ে পড়ি?'

অন্তর্যামী ভগবান ভক্তের মনের কথা জেনে নিজে নিজেই অকথিত প্রশ্নের উত্তর দেন। 'এ তো অতি সোজা কথা। আমরা যে নিজের স্বরূপ ভুলে যাই, তাই মনে করি নিজেদের দেহধারী জীব। এই মিথ্যা জীবভাবে আচ্ছন্ন হ'য়ে থাকি বলেই, ঈশ্বরকে মনে করি আমাদের থেকে আলাদা একটা কিছু। জীবদেহে যিনি অধিষ্ঠিত তিনিই যে সাক্ষাৎ শিব, এই কথাটি ভুলে যাই বলেই আমাদের ভাগ্যে ঘটে এত দেহবোধের বিড়ম্বনা।'

এ আবার কি কথা? ভ্রান্তি নিয়েই যাদের জন্ম, তারা ভুলবে

না তো কি? দেহবোধকে অতিক্রম করা কি সহজ ব্যাপার? সবাই কি আর ভগবান হ'য়ে যাবে? মনে করলেই হ'ল যে জীবের জীবত্ব শিবত্বে রূপান্তরিত হয়ে গেছে? ভগবানের কাছে যে ভাবটি সহজ এবং স্বাভাবিক হ'য়ে গেছে, তা কি সকলের হয়? কত কঠিন এই আত্মজ্ঞানের পথ, সে কথা পুরোপুরি জেনেও ভগবান এমনভাবে কথা বলছেন যেন এ বস্তু মনে করলেই সবাই পেতে পারে। ভক্ত উৎসুক দৃষ্টিতে ভগবানের মুখের পানে তাকিয়ে আছে দেখে ভগবান একটু হেসে মাথা নাড়লেন। বললেন, 'সহজে তো হয় না; এর জন্য চাই অনন্ত তপস্যা। মিথ্যা দেহবোধকে ছাড়িয়ে উঠতে হবে। তবেই চৈতন্যশক্তির কেন্দ্রে গিয়ে স্থিতি লাভ করা সম্ভব হবে।'

এবারে আর আত্মসম্বরণ করতে না পেরে ভক্ত আকুল আর্তকণ্ঠে বলে উঠলো, 'ভগবান, তাই যদি হয়, তবে সেই চৈতন্যশক্তির অধিকার আমরা পাই না কেন? প্রাণপণে চেষ্টা ক'রেও তার নাগাল পাই না কেন? তোমার কাছে শরণ নিয়েছি, কারণ জেনেছি যে তুমিই সেই চৈতন্যশক্তি, বা ঈশ্বর। তবু কেন নিজেকে জানতে পারি না; তবু কেন এমন বাইরে বাইরে ভেসে বেড়াই?'

ভক্তের চোখে জল দেখে ভগবান আর নির্বিকার হ'য়ে থাকতে পারলেন না। তাঁরও দু-চোখ সজল হয়ে উঠলো। তিনি সমবেদনার স্বরে বললেন, 'কি করবো বলো? প্রারব্ধ ক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত চৈতন্যশক্তি অধিগত হবে না; দেহবোধও যাবে না। তবু সাধনার শিখাটি জ্বালিয়ে রাখতে হবে। যা কিছু ঘটে সবই তো কর্মফল কিনা, তাই কৃপারূপ ফলটিও তারই অন্তর্গত। এই যে সমস্ত ছেড়ে এখানে এসে পড়ে আছো, এর কি কোন তাৎপর্য নেই? ঈশ্বরের শক্তিতে কর্ম নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। তিনি যেমন চালাচ্ছেন তেমনি ভাবেই চলেছে কর্ম, আবার এই কর্ম তাঁরই নির্দেশে সফল বা বিফল হচ্ছে।

সময়টি হলেই, কর্মফল অনুসারে, কোন এক শুভলগ্নে আত্মস্ফুরণ ঘটে যায়। তারই জন্য অপেক্ষা ক'রে থাকতে হয়।'

ভগবান রমণের সান্নিধ্যে এসে যাঁরা তাঁর নির্বিকার জ্ঞানময় রূপটিই কেবল দেখেছেন, তাঁরা দেখেছেন কেবল তাঁর বহিরাবরণ। অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত যে মহাকরুণার স্রোতটি তাঁর চারিপাশে ছড়িয়ে পড়তো—তাতেই ধরা পড়তো এই পুরুষোত্তমের আসল পরিচয়। চেনা অচেনা যে যখন যে-কোন মনোবেদনা নিয়ে তাঁর কাছে এসেছে, আশ্চর্য সহানুভূতিতে তিনি তার বেদনায় ব্যথিত হয়েছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই বেদনার অংশ নিজে নিয়ে তাকে হাল্কা ক'রে দিয়েছেন। পশু-পাখি, গাছপালা পেয়েছে তাঁর অনন্ত মমতার স্পর্শ। গাছের ফুলটি পাতাটি পর্যন্ত কেউ অকারণে ছিঁড়লে তিনি ব্যথা পেয়েছেন। প্রতিবাদ ক'রে বলেছেন, 'গাছের পাতা ফুল ছিঁড়ে নিয়ে তোমাদের এই নিষ্ঠুর পূজা অর্থহীন। ওরা না হয় কিছু বলতে পারে না ; কিন্তু প্রাণ যেখানে আছে সেখানেই আছে বেদনার বোধ। তোমাদের যেমন লাগে, তেমনি ওদেরও লাগে। জীবিত বস্তুর গা থেকে কিছু ছিঁড়ে না দিলে যদি পূজা না হয়, নিজের দেহ থেকে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-গুলি ছিঁড়ে নৈবেদ্য সাজিয়ে দিতে পারো তো না হয় বুঝি। কিন্তু তা তো তোমরা পারো না। পারো কেবল অসহায়কে অকারণে নির্যাতন করতে।'

পশু-পাখিরা যে কেমন ক'রে টের পেতো যে তাদের সমস্ত নালিশ এই মানুষটির কাছে নিবেদন করা যায়—সে এক অতি নিগূঢ় রহস্য। পারিপার্শ্বিকের সমস্ত বাধা অগ্রাহ্য ক'রে তারা ভগবানের কাছে এসে নির্ভয়ে আশ্রয় নিয়েছে ; ভগবানও অনন্ত করুণায় তাদের অব্যক্ত বেদনা কান পেতে শুনেছেন, বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করেছেন। ভগবানের স্পর্শ পেয়ে যেন কোন মন্ত্রবলে পায়রাগুলি তাঁর কোলে শুয়ে প্রহরের পর প্রহর ধরে স্থির হয়ে ঘুমিয়ে থেকেছে ; কাঠ-বিড়ালেরা

তাঁর সান্নিধ্য ছেড়ে নড়তে চায় নি ; লক্ষ্মী নামে যে বাছুরটি দূর থেকে একবার মাত্র তাঁকে দেখেছে, সে আর তাঁকে ভুলতে পারে নি। দূর-দূরান্তর থেকে, গলার দড়ি ছিঁড়ে, ছুটে ছুটে চলে এসেছে আশ্রমে ভগবানের আদর পাবার জন্য। শেষ পর্যন্ত, বহুবিধ অসুবিধা ও বাধা সত্ত্বেও স্থায়ীভাবে ভগবানের কাছাকাছি রয়ে গেছে। জীবনের মেয়াদ তার যখন শেষ হ'ল, স্বয়ং ভগবান তার অন্তিমকালে, শিয়রে বসে তার মুক্তি বিধান করেছিলেন।

নিজের মালিকের কাছে দুর্ব্যবহার পেয়ে বিমর্ষ একটি কুকুর সোজা ভগবানের কাছে এসে নিঃশব্দে জানিয়েছে তার অভিযোগ, আর আশ্রম ছেড়ে যেতে চায় নি। ভগবান তাকে সমাদরে আশ্রয় দিয়েছেন। এমন ঘটনা আশ্রমে বহুবার বহুভাবে ঘটেছে।

ভগবান যখন যেখানে থাকতেন, তাঁর চারিপাশে আনন্দের মেলা বসে যেতো। হাস্যে পরিহাসে রসিকতায় সবাই পুলকিত হয়ে উঠতো। তাঁর প্রথম জীবনের প্রসঙ্গে কেউ প্রশ্ন করলে বলতেন, 'স্কুল-পালানো ছেলে আমি, পড়াশুনা হবে কোথা থেকে ? ঘুমের মত একটা ভাব এসে যেতো ক্লাশে গিয়ে বসলেই। ভয়ে ভয়ে তাই দেয়ালের গা ঘেঁসে বসে, দড়ি দিয়ে মাথার চুল একটা পেরেকের সঙ্গে বেঁধে রাখতাম। ঢুলুনি এলেই চুলে টান পড়তো আর তন্দ্রা ছুটে যেতো। কিন্তু তাতেও সবসময়ে কাজ হত না ; চমকে জেগে উঠে দেখতাম কানে টান পড়েছে, আর কান দুটি শিক্ষকের বজ্রমুষ্টিতে ধৃত। এইভাবেই কেটেছে আমার ছাত্রজীবন। তারপরে যখন এখানে চলে এলাম, আর আমাকে পায় কে ? দিবারাত্রির বোধ থাকতো না এমন আচ্ছন্ন হয়ে থাকতাম অখণ্ড তন্ময়তায়। কোথায় বা খাওয়া কোথায় বা ঘুম ! কে যে কখন কি বস্তু আমার মুখে তুলে দিয়ে যেতো আমি টেরই পেতাম না। কখনো বা কিছুটা পেটে গেছে, কখনো বা মুখেই রয়ে গেছে অথবা মুখ থেকে পড়ে গেছে।'

'বেশ ছিল সে দিনগুলি। আহারে এতটুকু বাহুল্য ছিল না। একমুঠো ভেজান ভাত আর একটু চাটনি মাত্র। কিন্তু সে যেন অমৃতের মত মনে হয়েছে। এখনকার এই সব মেঠাই মণ্ডা খেয়ে কিছুমাত্র সুখ নেই। সাধু মনে ক'রে লোকে স্বেচ্ছায় কিছু কিছু খাদ্য এনে দিতো। হাতের তিনটি আঙুলে যতটুকু ধরে তাই আমি তুলে নিতাম। কোন পাত্রের প্রয়োজন হ'ত না। হাত পেতে ভিক্ষা নিয়ে মনের আনন্দে খেতে খেতে পথ ধরে চলতাম। খাওয়া হ'য়ে গেলে জিব দিয়ে চেটে হাত পরিষ্কার ক'রে ফেলতাম। লোকে চেয়ে চেয়ে দেখতো আর হাসতো। তাদের হাসি দেখে আমারও খুব মজা লাগতো। লোকের দ্বারে গিয়ে একটুখানি দাঁড়াতাম। কিন্তু চাইতে পারতাম না। তা ছাড়া তখন আমি ছিলাম মৌন। একটিবার হাততালি দিয়ে জানিয়ে দিতাম যে আমি এসেছি। গরীব যে সে ভিক্ষাবৃত্তি নিতে সঙ্কোচ বোধ করে। কিন্তু নিজেকে যে জয় করেছে তার আর কার কাছে কি লজ্জা থাকবে? যারা আমাকে চিনতো, তারা খুশি হয়েই কিছু না কিছু দিতো। যারা চিনতো না তারা বিদ্রূপ ক'রে কত কথা বলতো। আমার ভারি মজা লাগতো তাদের কথা শুনে। 'যোয়ান শরীর তোমার, অথর্ব নও অক্ষম নও, খেটে খেতে পার না! মোট বইলেই তো পারো। তা নয়; খাটতে হবে না ব'লে এই ভিক্ষাবৃত্তি বেছে নিয়েছো।' এমনি ক'রে যতই তারা বিদ্রূপ ক'রে কথা বলতো, ততই আমার ভারি আনন্দ হ'ত। তাদের এই সব উপদেশ, তিরস্কার শুনতে আমার ভারি ভালো লাগতো।'

ভক্তেরা জিজ্ঞাসা করলো—'আমাদের তো এমন কথা শুনলে রাগ হয়। গালাগালি, নিন্দা শুনতে লোকের ভালো লাগে কি ক'রে? আমাদের যদি কেউ অপমান করে আমরা তো কই আনন্দ পাই না। তখন আমাদের কি করা উচিত?'

ভগবান বললেন, 'তার আর কি? যারা তোমাকে গালাগালি দেয় তাদের স্বরে স্বর মিলিয়ে তুমিও চুটিয়ে নিজেকে গালাগালি দেওয়ার অভ্যাস করো—তা হলেই আর ক্ষোভের কিছু থাকবে না। গালাগালি দিচ্ছে কাকে—সেই কথাটা ভোলো বলেই কষ্ট পাও। তোমার দেহকেই তারা অপমান করছে—তোমাকে নয়। দেহের চেয়ে বড় শত্রু তোমার আর কে আছে? রাগ দ্বেষ সব কিছুই তো আছে তোমার দেহকে আশ্রয় ক'রে। সমস্ত রোগের মূল যে দেহ, তাকে ঘৃণা করাই তো উচিত। যা উচিত তা আমরা করতে পারি না বলেই বাইরে থেকে এসে লাগে আঘাত। সেই আঘাত আসে আমাদের জাগিয়ে দেবার জন্য। ইঙ্গিতটি ধরতে পারি না বলেই, আমরা আঘাতের বদলে প্রতিঘাত করতে চাই। বন্ধুরূপে যে আসে, সে ব্যর্থ হ'য়ে ফিরে যায় বলেই তার শিক্ষাটি গ্রহণ করতে পারি না। প্রশংসা যারা করে তারা আমাদের ক্ষতি করে; অথচ তাদের সঙ্গই আমরা নিত্য কামনা করি। মনে রাখতে হয়—যে যা দেয়, প্রিয় হোক অপ্রিয় হোক সবই শান্ত মনে নিতে হয়। ভাল জিনিসটি যেভাবে নিই, খারাপটিও সেই একই ভাবেই গ্রহণ করতে হয়।'

'আমার কথা যদি বলো, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কোনরকম অভাব-বোধই আমার ছিল না। একটি মাত্র কৌপীন আর একটি জীর্ণ তোয়ালে মাত্র ছিল আমার সম্বল। সে অনেকদিনের কথা: পলনীস্বামী আমার খবরদারী করে। রান্না কখনো সে করে, কখনো আমি করি। এখনকার মত রান্নার ব্যাপার তখন কিছুই ছিল না। ভিক্ষান্ন একটু ফুটিয়ে নিয়ে কোনরকমে দু-এক গ্রাস হলেই চলে যেতো। তোয়ালেটি কে যে কবে দিয়েছিল মনে নেই। কিন্তু সেটাকে আর তোয়ালে বলে চেনবার উপায় ছিল না, কারণ কাপড়ের চেয়ে তাতে ছিদ্রই ছিল বেশি। তাই দিয়েই সন্তর্পণে গা হাত পা মুছতাম। পাছে কারুর চোখে পড়ে সেই ভয়ে সযত্নে সেটিকে একটি

গাছের কোটরে লুকিয়ে রাখতাম। কিন্তু ভিজে তোয়ালে রৌদ্রে মেলে না দিলে চলে না। তাতেই হ'ল বিপদ। দুষ্টু ছেলেগুলোর চোখ পড়লো একদিন তার দিকে। তারা আমাকে এই নিয়ে খ্যাপাতে ছাড়বে কেন? গম্ভীর মুখ ক'রে যখন-তখন এসে বলে, 'স্বামীজি তোমার তোয়ালেখানা বার ক'রে দাও। লাটসাহেব ওখানা চেয়ে পাঠিয়েছেন। তুমি লুকিয়ে রাখলে কি হবে? তোমার এই ঐশ্বর্যের খবর মুখে মুখে ছড়িয়ে গিয়ে তাঁর কানে পৌঁছে গেছে। কথাটি না বলে তাড়াতাড়ি সেখানি বার ক'রে দাও।' আমি রাগ দেখিয়ে বলি—'ভাগ, এ তোয়ালে আমি দিতে পারবো না।' তারা হাসতে হাসতে চলে যায়। কিন্তু আমার ভয় থেকেই যায়, পাছে আমার কাছে যারা আসে তাদের কারুর চোখ পড়ে আমার তোয়ালে-খানির দিকে। আমার সাধ্যমত আমি আমার গোপনের ধনটিকে সবাইকার দৃষ্টির আড়ালেই রেখেছিলাম। কিন্তু শেষ রক্ষা আর হ'ল না। বামাল সমেত একদিন ধরা পড়ে গেলাম। যাদের কাছে ধরা পড়লাম তারা কাঁদো-কাঁদো হ'য়ে বললো, 'এ জন্য আমরাই দায়ী। এই আমাদের শ্রদ্ধাভক্তির নমুনা। এই সহস্রছিদ্র তোয়ালে তুমি নিত্য ব্যবহার করো। এমনই অন্ধ আমরা যে সেটুকুও দেখতে পাই না।' তাদের আক্ষেপ শুনে আমিই আবার মর্মপীড়া বোধ করি।

'কৌপীনের ব্যাপারটিও প্রায় এই সময়ের। সেও ভারি মজার কাহিনী। একটির বেশি দুটি কৌপীন আমার ছিল না। দুর্ভাগ্যক্রমে তাও গেল ছিঁড়ে। কার কাছে কি চাইবো? চাওয়ার অভ্যাসই যে আমার ছিল না। তথাপি লজ্জানিবারণ তো করতে হবে। কোথায় পাই ছুঁচসুতো? কাঁটাগাছ থেকে একটা লম্বাটে কাঁটা জোগাড় ক'রে তার একপ্রান্তে করলাম এক ছিদ্র, সুতা সংগ্রহ করলাম সেই কৌপীনেরই একাংশ থেকে। পরিপাটি ক'রে ছিন্ন কৌপীন নিজের হাতে মেরামত ক'রে নিলাম। এর পরেও বহুদিন

চলেছিল সেই কৌপীনটি। কিছুমাত্র অসুবিধা বোধ করিনি। সুন্দর-ভাবে দিন কেটে গেছে—আমার সবচেয়ে আনন্দের দিন। সেদিনকার সেই অবাধ স্বাধীনতা এখন তো আর নেই। এখন আমি পরাধীন। সংসার ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলাম যখন, তখন কি জানি কত বড় আর একটা সংসারে আমাকে জড়িয়ে পড়তে হবে?'

ভগবানের নিজের মুখ থেকে অতীত কাহিনী শোনবার লোভে ভক্তেরা সুযোগ পেলেই নানা কথা জিজ্ঞাসা করতেন। ভগবানও মহোৎসাহে পুরানো কথা সবিস্তারে বর্ণনা করতেন। একদিন তিনি বললেন, বিরুপাক্ষ-গুহার আশেপাশে প্রায়ই জঙ্গল থেকে বাঘ আসতো নিকটের ঝর্ণায় জল খেতে। এসেই একটা হুঙ্কার ছেড়ে তার আসার খবর জানিয়ে দিতো। একটু পরেই, যাবার আগে আর একটি হাঁক দিয়ে জানাতো যে সে চলে যাচ্ছে। ব্যবধান অতি সামান্যই। কিন্তু ভয়ের কথা আমার কোনদিন মনে হয় নি। তাদেরও তো জানানো চাই যে আমরা এখানে আছি, তাই জ্বালানো লণ্ঠনটি গুহার সামনে রেখে দেওয়া হ'ত। দিনের বেলাতেও কতদিন আমার কয়েক হাত দূরে বাঘেদের খেলা করতে দেখেছি। আমার মনে ভয় ছিলো না বলেই ওদেরও ভয়ের কথা মনে হ'ত না। মনে যার হিংসা নেই, তাকে কে হিংসা করবে? তাই আমার কোন দুশ্চিন্তা ছিল না। বাঘেরা খুশিমত আসতো আবার চলে যেতো। কিন্তু আমার সঙ্গে তখন থাকতো বাসুদেব শাস্ত্রী। আমার হাজার আশ্বাসেও সে বেচারা ভারি অস্বস্তি বোধ করতো। সে মাথা নেড়ে বলতো 'আপনার না হয় হিংসা ভয় কিছুই নেই, তাই আপনি নিশ্চিন্ত; কিন্তু আমাকে ওরা ছাড়বে কেন? আমি তো আর আপনার মত নই। বাঘের হাতে মরতে আমার ঘোরতর আপত্তি আছে।' এই বলে সে গুহার ঘরে ছুটে চলে গিয়ে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ ক'রে দিতো—অবশ্য আমাকে সঙ্গে নেবার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হবার পরে।

নেহাত প্রাণভয়ে আমাকে ফেলে পালালে কি হবে : আমার জন্য উৎকণ্ঠা থাকতো তার অন্তরে। তাই ঘরের মধ্যে থেকেই আতঙ্কে, দুর্ভাবনায় উন্মাদের মত আস্ফালন শুরু করতো বনের বাঘের উদ্দেশে —'খবরদার বলছি এদিকে পা বাড়াবি না। প্রাণের মায়া নেই তোর ? দূর হ'য়ে যা এখান থেকে। মনে ভেবেছিস্ কি তুই ? তোর মরণ-বাড় বেড়েছে। এদিকে এলে কি করবো, দেখবি। জানিস এখানে ভগবান রয়েছেন ! তোর বেয়াদপি এখানে চলবে না।'

অভিনয়ের ভঙ্গিতে হাত নেড়ে, কাহিনীটি আগাগোড়া বলতে বলতে ভগবানও যত হাসেন, ভক্তরাও তত হাসে। নিজের বীরত্বের প্রসঙ্গ শুনতে শুনতে বাসুদেব শাস্ত্রী হেসে গড়িয়ে পড়ে। সে বলে, 'আমার কি তখন জ্ঞান থাকতো যে মনে থাকবে কি বলেছি আর না বলেছি ? জ্বলজ্যান্ত বনের বাঘ, মাত্র কয়েক হাত ব্যবধানে রয়েছে দেখে কার মাথার ঠিক থাকে ? কিন্তু একথা মানি না যে আমার চিৎকারে বাঘ একটুও ভয় পায় নি। আমার হাঁকডাকে সে আর কাছাকাছি আসতে সাহস করে নি —এ কথা তো আর মিথ্যা নয়।' ভগবান হেসে বলেন, 'ঠিক কথা ! বাঘেদের বহু পুণ্যে তারা আমাদের এই বাসুদেব শাস্ত্রীর অভিশাপে ভস্ম হয়ে যায় নি। প্রাণ নিয়ে যে ফিরে যেতে পেরেছে এও তাদের ভাগ্য বলতে হবে।'

বিদ্যা নামে ছোট একটি মেয়ে এসেছিল বাপ মায়ের সঙ্গে। তার মনে ছিল ভগবানের সম্বন্ধে অজস্র প্রশ্ন। জনে জনে সে জিজ্ঞাসা করতো—'ভগবান থাথা এই একটি স্থানে কেবলি থাকেন কেন ? এই এক যায়গায় থাকতে ওঁর ভালো লাগে কি ক'রে ? আমরা যেমন ক'রে এখানে ওখানে যাই, উনিও তো তাই করলে পারেন ;—তবে তা করেন না কেন ? লোকের উত্তরে খুশি না হয়ে, একদিন সুযোগ বুঝে সে সোজা ভগবানকে গিয়ে বললো তার মনের কথা। তার কথায় ভগবান খুশি হ'য়ে বললেন, 'আমাকে নিয়ে

যাবে সঙ্গে ক'রে তোমাদের বাড়ি? কিন্তু মুস্কিল আছে যে অনেক। আমি যদি সেখানে যাই, এই এত লোক সবাই সেখানে গিয়ে হাজির হবে। তোমাদের দু-চারখানি ঘরে এত লোককে থাকতে দেবে কোথায়? এত লোক সেখানে খাবেই বা কি? তোমার সঙ্গে আমি যদি একবার যাই, সবাই বলবে, 'আমাদের কাছেও চলো।' আমি যদি যাবো না বলি তারা তখন জোর-জবরদস্তি ক'রে আমাকে তাদের সঙ্গে টেনে নিয়ে যাবে। আমি একা মানুষ, এত লোকের টানাটানিতে কোন দিকে যাবো? এখান থেকে তুমি যদি আমাকে নিয়ে যেতে চাও, সবাই যেতে চাইবে। সারা অরুণাচল ভেঙে পড়বে। হয়তো বা এই পাহাড়টিও সঙ্গী হতে চাইবে। এত বড় ব্যাপার তুমি সামলাবে কেমন ক'রে? এই তো দেখছো, আমার এক পাও নড়বার উপায় নেই। এখানে রয়েছি জেলখানার কয়েদীর মত। যদি এখান ছাড়ি, আবার কে কোথায় ধ'রে নিয়ে পুরে রাখবে এমনি আর একটা কারাগারে। তুমি কি তাদের ঠেকাতে পারবে? লোকে যদি আমাকে যেতে না দেয়, আমিই বা কি করবো, তুমিই বা কি করবে? তার চেয়ে কিছুই ক'রে কাজ নেই, কি বলো? যেমন যেখানে আছি, সেই আমার ভালো। আমার কথা বুঝেছো তো?' বিদ্যা গম্ভীর মুখে মাথা হেলিয়ে বলে যে সে বুঝেছে।

সবাইকার দিকে চেয়ে ভগবান বললেন, 'শিশু হ'লে কি হয়, দেখো কেমন সহজে এ এই সোজা কথাটা বুঝে নিল। এমনি ক'রে সবাই বুঝলে কি আর আমার মৌন হয়ে থাকার কালে আমাকে সেই নিগ্রহ সইতে হয়?'

ভক্তেরা কৌতূহলী হ'য়ে বললো, 'কি নিগ্রহ, ভগবান?'

মুখভাব কাতর ক'রে ভগবান বললেন, 'সে এক ভারি করুণ ব্যাপার। হাসির ব্যাপারও বলতে পারো। আমাকে একবার

ডাকাতি ক'রে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, জানো? ডাকাতি ছাড়া তাকে আর কি বলবো? হয়েছিল কি বলি শোন। তখন আমি মৌন হয়ে থাকি। কারুর সঙ্গে কোন কথা বলি না। সকালবেলা পলনীস্বামীর সঙ্গে অরুণাচল প্রদক্ষিণে বেরিয়েছি। অনেকটা পথ ঘুরে ক্লান্ত দেহে সুব্রাহ্মন্য মন্দিরে এসে শুয়ে পড়েছি: পলনী আমাকে রেখে ছত্রে গেছে কিছু খাদ্যের সন্ধানে। এমন সময়ে জন দশেক যোয়ান লোক সঙ্গে নিয়ে মঠাধ্যক্ষ এসে হাজির। এসেই বলে, 'ওঠ, আমার সঙ্গে যেতে হবে'। কথা তো বলি না; হাত মুখ নেড়ে বুঝিয়ে দিলাম যে আমার কোথাও যাবার বাসনা নেই। কে কার কথা শোনে, মঠাধ্যক্ষ হুকুম দিলে তার সঙ্গীদের—'উঠতে না চায়, পাঁজাকোলা ক'রে ওকে তোল।' আদেশ পেয়ে দশজন লোক হাত বাড়িয়ে আমার দিকে ঝুঁকে পড়েছে দেখে ভয়ে ভয়ে আমি নিজেই উঠে পড়লাম। পথের ধারে একখানা গোযান দেখিয়ে মোহান্ত বললো, 'দেখছো কি, উঠে পড়ো।' প্রবল আপত্তি জানিয়ে আমি মাথা নাড়লাম। মোহান্ত তার সঙ্গীদের ধমক দিয়ে বললো, 'হাঁ ক'রে দেখছো কি? স্বামীকে টেনে তোল গাড়ির উপরে।' সঙ্গে সঙ্গে দশজনে জাপটে ধ'রে আমাকে গাড়িতে তুলে সোজা নিয়ে গেল মঠে। কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, কি তাদের উদ্দেশ্য কিছুই জানি না। কিন্তু নিরুপায়ের আর উপায় কি?

'মঠে নিয়ে গিয়ে পাতা পেতে বসিয়ে দিল। রাশীকৃত সুখাদ্য থরে থরে সাজিয়ে দিয়ে বললো, 'পেট ভরে খাও।' কি আর করি, ভয়ে ভয়ে যা পারলাম খেলাম। বলে, 'কোথায় যাবে? এইখানেই থাকো?' যা বলেছে খুব সম্ভ্রম ক'রেই বলেছে। কিন্তু বনের পাখির কি সোনার খাঁচায় মন ওঠে! ভাগ্যে আমার খোঁজ করতে করতে পলনী এসে সেখানে হাজির হ'ল। তার সাহায্যে কোনক্রমে সেখান থেকে পালিয়ে বাঁচি।'

'এর পরেও মোহান্তের আন্তরিক আমন্ত্রণের মর্যাদা রাখতে আমি কখনো কখনো মঠে গেছি, আহারও করেছি। কিন্তু পাতা পেতে আর কখনো খাইনি, কারণ প্রথমবারেই আমি লক্ষ্য করেছিলাম যে আমার উচ্ছিষ্ট খাদ্য সেখানকার ভক্তেরা প্রসাদের মত ক'রে সবাই মিলে ভাগ ক'রে খেতো। সেই থেকে, হাত পেতে যেটুকু নিয়েছি চেটেপুটে তাই খেয়েছি।'

কথায় কথায় একদিন ভক্তির অত্যাচারের প্রসঙ্গ উঠলো। ভগবান বললেন, 'লোকে আমার পায়ে ফুল দিতে চায়। এর যে কি অর্থ আমি ভেবে পাই না। আমার এই পা-দুটোর সঙ্গে আমার কিসের সম্বন্ধ? পা দুটো আমাকে ব'য়ে নিয়ে যায়, এই পর্যন্ত। আমার সত্ত্বার মূল কি আছে আমার পায়ে? প্রাণের বৃন্ত থেকে ছিঁড়ে আনা ফুল আমি ছুঁতেও চাই না। তবু ছলে বলে কৌশলে লোকে চায় পুষ্পাঞ্জলি দিতে। ফুলে গাছ আলো হ'য়ে আছে দেখলেই লোকে লুব্ধ হ'য়ে তাই ছিঁড়ে নেবে। এই প্রবৃত্তি যে ভালো নয়, তা বোঝালেও বুঝবে না। সৃষ্টির সৌন্দর্য এভাবে অপচয় করবার কার কি অধিকার আছে? কিন্তু তাদের ধারণা এতেই নাকি ভক্তি দেখানো হয়। কত লোক আসে আমার হাতের লেখার প্রার্থনা নিয়ে। আমাকে বলে তাদের খাতায় আমার নাম লিখে দিতে। কিন্তু আমার নাম কি, তাই যে আমি জানি না। কোন সময়ে কে যেন আমার নাম দিয়েছেন রমণ মহর্ষি। সবাই ডাকে আমায় সেই নামে। কিন্তু আমার নামই বা কি, আমার জন্মস্থানই বা কোথায়? নাম যদি আমার সত্যিই থাকতো, লিখে দিতে আর আপত্তি কি ছিল? অথচ এই নিয়ে আমাকে কত যে জবাবদিহি করতে হয় তার হিসাব নেই।

'বিরুপাক্ষ-গুহায় যখন ছিলাম, তখন তো আমি মৌনী। বিনা প্রতিবাদে তখন নানা রকমের ভক্তির অত্যাচার সয়েছি। তেঁতুল

গাছের তলায় ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছি। মাথার উপরে অকস্মাৎ দড়াম ক'রে আওয়াজ আর সঙ্গে সঙ্গে মাথা বেয়ে, বুক বেয়ে, নামলো জলের ধারা। চমকে চোখ চেয়ে বুঝলাম ডাবের জল দিয়ে আমার অভিষেক হ'ল। এক দল মহিলা আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে, আর একে একে আমার মাথায় ডাবের জল ঢালছে। ভেবে দেখো আমার তখনকার অবস্থা। পালাবার উপায় নেই। প্রতিবাদের ভাষা নেই। নিশ্চেষ্ট হয়ে ভিজে মাথায়, ভিজে গায়ে স্থির হ'য়ে বসে থাকা ছাড়া, গত্যন্তর নেই। তারপরে কর্পূর জ্বালানো, তীর্থবারি সিঞ্চন, ধূপ দীপ, পুষ্পাঞ্জলি ইত্যাদির যাবতীয় অনুষ্ঠান সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত আমার আর ছুটি নেই।'

মাঝে মাঝে, যখন এই ভক্তির অত্যাচার চরমে উঠেছে, নির্বিকার ভগবানও তাতে অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছেন। তাঁর উচ্ছিষ্ট কলাপাতাটির উপরে, তাঁর স্নানের জল, পা ধোয়া জলের উপরে যে আশ্রমের কোন কোন ব্যক্তির লুব্ধ দৃষ্টি থাকতো এই গোপন সংবাদটি জেনে তিনি ক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠেছিলেন। বলেছিলেন, 'সামান্য একটা উচ্ছিষ্ট পাতা নিয়ে তোমাদের এই কাড়াকাড়ি যে কত অর্থহীন তা যখন তোমরা বুঝবে না, আমি এখন থেকে কোন পাত্রেই আর খাবো না। হাত পেতে আহার্য নিয়ে, তাই খাবো। বেড়িয়ে এসে পা ধোয়ার আমার প্রয়োজন নেই। স্নানের ঘরে স্নান করাই ছেড়ে দেবো। এ পাগলামির প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। আমার স্নানের জলে, যা নর্দামা দিয়ে বাইরে গিয়ে পড়ে, তা যারা সংগ্রহ ক'রে নিজেদের মাথায় ছিটিয়ে পুণ্য অর্জন করতে চায়, তাদের সঙ্গে কিছুমাত্র আপোষ করতে আমি পারি না। নিজের কৌপীন আর তোয়ালে নিয়ে আমি খোলা যায়গায় কলের জলে চান ক'রবো। সেখানেও যদি এই জুলুম চলে, চলে যাবো পুকুরে কিংবা পাহাড়ের ঝর্ণায়। তোমরা আমাকে ভেবেছো কি? আমি এদিকে নজর দিই নি। কলঘরের

পিছনে লোকের কি এত কাজ থাকে সে কৌতূহল আমার ছিল না। এখন বুঝছি যে ক্রমেই যেন বাড়াবাড়ির সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। প্রতিবাদ না করলে এই উন্মত্ততা যে কোথায় গিয়ে থামবে কে জানে? আমার এই দেহটা যে আমি নই, এ তোমরা কিছুতেই বুঝবে না। দেবতা বানিয়ে আমাকে নিয়ে পুতুলখেলা খেলতে আমি দেবো না। এত কষ্ট ক'রে এখানে পড়ে আছো কি এই জন্য?'

ভক্তদের মনে পড়ে যায় যে প্রায় এই এক ধরনের কথাই ভগবান বলেছিলেন জননী আলগাম্মাকে। বিরুপাক্ষ-গুহায় মা এলেন ছেলের কাছে, ফিরে যেতে প্রাণ চাইলো না বলে সেখানেই স্থায়ী ভাবে র'য়ে গেলেন। পরম প্রীতির সঙ্গে অথচ স্বভাবসিদ্ধ নিরাসক্ত ভাবে ভগবান মাকে নিজের কাছে রেখে দিলেন। যেদিন যা জুটতো তাই যেমন সবাই খেতো, মাও খেতেন। রান্নাবান্নার পাট সেকালে আশ্রমে ছিল না। কিন্তু মায়ের প্রাণ তাতে তৃপ্তি পেতো না। ছেলের ভালো ক'রে খাওয়া হচ্ছে না—ভেবে তিনি মনে মনে অস্থির হ'য়ে উঠতেন। নিজের হাতে কোন সুখাদ্য রেঁধে ছেলেকে ও আশ্রমের সবাইকে খাওয়াবার জন্য আশ্রম জননী ব্যাকুল হয়ে একদিন গোপনে কিছু পাঁপর বা আপ্পালম তৈরি করবার ব্যবস্থা করলেন। অনেক রাত্রে বাইরের লোক যখন সবাই চলে গেছে, এবং ভগবান শয্যাগ্রহণ করেছেন তখন জননী নিঃশব্দে তাঁর সংগৃহীত তৈজসপত্র নিয়ে পাঁপর ভাজতে বসলেন।

এই প্রসঙ্গে ভগবান বললেন, 'নেপথ্যে যে তোড়জোড় চলছে তা আমি টের পেয়েছিলাম। কিন্তু ভান ক'রে ছিলাম যেন কিছু জানি না। মায়ের মনের গতি কোন দিকে যাচ্ছে তা আমি জানতাম। তাঁর কথা ভেবে মনে মনে উদ্বিগ্ন হতাম। অনেক দিন পর্যন্ত বাধা দেবার কোন চেষ্টা করিনি। কিন্তু এবারে আর চুপ করে থাকা সঙ্গত বলে মনে হ'ল না। ঘুমের ভাবে মায়ের দিকে পিছন করে শুয়ে-

ছিলাম। এমন সময়ে মা আমাকে ডেকে বললেন, 'তুমি যদি একটু হাত লাগাও তাহলে বড় ভাল হয়।' এমনি একটা সুযোগই আমি চাইছিলাম। আমি বললাম, 'এসব কি তুমি আরম্ভ করেছ? সর্বস্ব ছেড়ে এই গুহায় এসে রয়েছো। যে সংসারকে পিছনে ফেলে এসেছো, তা কি তুমি সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ফিরবে? যা যখন জোটে তাই খাওয়াই তো এখানকার রীতি। আমার কাছে কোন সাহায্যই তুমি পাবে না। তোমার তৈরি পাঁপরও আমি খাব না। এ ব্যাপারে প্রশ্রয় দিলে এই রকম চলতেই থাকবে। তাতে তোমারও ক্ষতি, আমারও ক্ষতি। এসব আমার ভাল লাগে না। তোমার তৈরি পাঁপর তুমিই খেয়ো; আমাকে এ ব্যাপারে জড়াতে তুমি পারবে না।

'এমনি ভাবে অনেক কঠিন কথাই আমি মাকে বলেছি। কিন্তু যা বলেছি নিতান্ত নিরুপায় হয়েই বলেছি। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নি। আমার কাছে বকুনি খেয়ে মা চোখের জল ফেলেছেন, কিন্তু পরক্ষণেই চোখের জল মুছে আমাকে নিজের হাতে রেঁধে কিছু খাওয়াবার জন্য উদ্যোগী হ'য়ে উঠেছেন। অপরূপ বস্তু কিছু নয়, কখনো একটু শাকশব্জী, কখনো একটু পায়স বা পিষ্টক। লোকের কাছে চেয়ে-চিন্তে সংগ্রহ করেছেন উপকরণ। আমার হাজার বারণ সত্ত্বেও, শাকপাতা তুলে এনে আমার জন্য রেঁধেছেন। পাঁচদিন প্রত্যাখ্যান ক'রে বাধ্য হ'য়ে এক-আধদিন আমি খেয়েছি। কিছুতেই তাঁকে নিরস্ত করতে পারি নি। কতদিন বনবাদাড়ে ফল-মূলের সন্ধানে গিয়ে শরীরের নানাস্থানে কাঁটার খোঁচা খেয়ে ফিরেছেন। ধরা পড়ে গিয়ে অপরাধীর মত মুখ ক'রে বলেছেন 'কি করি বল্ বাবা, আমি যে মা, সে কথা আমি কি ক'রে ভুলি? আমি যে জানি তোর কি খেতে ভাল লাগে। তুই বারণ করিস তা আমার মনে থাকে না। বকিস্, মারিস্ যা করিস সব আমি সইতে রাজি আছি। গ্রামের

বাড়িতে আমাকে যেতে তুই বলিস্ নি। তোর ছোট বোন অলমেলু হাজার বললেও তুই যেন আমাকে সেখানে যেতে দিস্ নি। বয়স তো আমার কম হ'ল না ; কবে ডাক আসবে কে জানে! শেষকালে কি মরবার সময় তোকে দেখতে পাবো না! তাই তো একটি দিনের জন্যও তোকে ছেড়ে কোথাও যেতে আমার প্রাণ চায় না। তারা বলে, 'দু-এক দিনে আর তোমার কি হবে! দু-একদিন আমাদের কাছে ঘুরে এসে তোমার ছেলের কাছে থাকলে ক্ষতি কি?' আমি বলি, 'কে জানে বাপু, যদি ওখানে অসুখে পড়ে যাই, সময়মত ট্রেন ধরে ফিরতে না পারি—তা হলে তোকে না দেখেই হয়তো মরে যাবো। সে কথা আমি ভাবতেও পারি না।' তারা আমার কথা শুনে হাসে। তা হাসুক। আমার মনের কথা লুকিয়ে কি করবো! তোর কোলে মাথা রেখে আমি মরবো, এই আমার একমাত্র সঙ্কল্প। তারপরে আমার মৃতদেহটা নিয়ে তুই যেখানে খুশি কাঁটা-বনে ফেলে দিস। তাতে আমার কি এসে যায়? মৃত্যুকালে তোকে আমার কাছে পেলেই আমি খুশি।'

মায়ের কথা বলতে বলতে ভগবান হঠাৎ চুপ হ'য়ে যান। সবাইকার চোখে জল দেখে তিনি তাড়াতাড়ি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেন।

ভগবান রমণের জানা অজানা অসংখ্য ভক্তের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলেন এচাম্মা। মাতৃসমা এই মহীয়সী মহিলা দীর্ঘ আটত্রিশ বৎসর ধ'রে যে অপরিসীম নিষ্ঠার সঙ্গে ভগবানের সেবা করেছিলেন তার তুলনা নেই। প্রথম দর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই এচাম্মা কায়মনোবাক্যে ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। নিজের হাতে রান্না ক'রে প্রতিদিন ভগবানের জন্য আহার্যবস্তু নিয়ে আশ্রমে আসা ছিল তাঁর নিত্যকর্ম। কোন কারণে একটি দিনের জন্যেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হবার উপায় ছিল না। এচাম্মার রান্নার হাত ভাল ছিল না। পরিমাণ-মত কিছুই থাকতো না তাতে।

অপটু দেহ, ক্ষীণ দৃষ্টি নিয়ে তিনি যা রান্না করতেন, তা সবাই বলতো অখাদ্য। নুনের বদলে চিনি, চিনির বদলে নুন পড়ে প্রায়ই তাঁর রান্না বিস্বাদ হ'য়ে উঠতো। কিন্তু ভক্তির স্বাদটি তাতে পেতেন বলেই ভগবান অতি আগ্রহের সঙ্গে তাঁর নৈবেদ্য প্রতিদিন গ্রহণ করতেন। আশ্রমের প্রথা অনুসারে এচাম্মার প্রেরিত খাদ্যের ভাগ সকলেই পেতেন। কিন্তু অনেকেরই তাতে আপত্তি ছিল—নিজেদের জন্য যত না হোক, ভগবানের জন্য তো বটেই। অনেকদিন পর্যন্ত কেউ সাহস ক'রে কথাটি ভগবানের কাছে বলতে পারেন নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কথাটি ভগবানের কানে এলো।

কয়েকটি ভক্ত এক সুযোগে ভগবানকে বললেন, 'এচাম্মার রান্না দিনে দিনে অখাদ্য হ'য়ে উঠছে। এতে আপনার স্বাস্থ্যহানি হবার খুবই সম্ভাবনা। তাই বলছি, এবার থেকে ওটা বন্ধ করলে কেমন হয়?'

ভগবান তখন আশ্রমের পাকশালায় নিবিষ্ট মনে তরকারির খোসা ছাড়াচ্ছিলেন। কারুর দিকে দৃকপাত মাত্র না ক'রে বললেন, 'তোমাদের স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা থাকলে তোমরা ও খাদ্য নাই বা খেলে। রান্নায় কোন খুঁত আমি তো পাই নি; আমার তো বেশ ভালোই লাগে। এচাম্মার দেওয়া খাদ্য আমি যেমন খাচ্ছি তেমনিই খাবো।'

ভগবানের এই কথার পরে আর কেউ কিছু বলতে পারে নি; কিন্তু এচাম্মাকে সবাই যেমন প্রীতির চোখে দেখতো, তাঁর আনীত খাদ্যের সম্বন্ধে সে প্রীতি একমাত্র ভগবান ছাড়া আর কারুরই ছিল না বলে, অনিচ্ছাকৃত ভাবে, খাদ্য পরিবেশনকালে এই বিশেষ খাদ্য-বস্তুটি প্রায়ই বাদ পড়ে যেতো। কিন্তু এমনটি যেদিনই হ'ত, খেতে বসে ভগবান হাত গুটিয়ে বসে থাকতেন—যতক্ষণ না ভুলটির সংশোধন হ'ত। নির্বিকার পরম পুরুষের আচরণের এই সামান্য ইঙ্গিতটুকু থেকেই বোঝা যায় এচাম্মার অভ্রান্ত পরিচয়।

অনেক বয়সে এই পুণ্যবতী যেদিন অকস্মাৎ অসুস্থ হ'য়ে পড়লেন, তখনো কেউ ভাবে নি তাঁর অন্তিমকাল এসে গেছে। কথা বন্ধ হ'য়ে গেছে, নির্জীবের মত পড়ে আছেন। চোখ মেলে চেয়ে দেখার শক্তিটুকুও প্রায় নেই। ভিতরে ভিতরে তখনো একটু জ্ঞান আছে কিনা পরীক্ষা করবার জন্য কে একজন বললেন, 'ভগবানের নৈবেদ্য বুঝি আজ আর পাঠানো হয় নি। সঙ্গে সঙ্গে প্রাণপণ শক্তিতে দু-চোখ বিস্ফারিত ক'রে এচাম্মা কি যেন একটা বলতে চাইলেন। জলে ভ'রে উঠলো মৃত্যুপথযাত্রীর চোখ দুটি। সেই দৃষ্টির প্রচ্ছন্ন আবেদনটি বেদনার মত বাজলো সকলের বুকে। সবাই সমস্বরে তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললো, 'পাঠানো হয়েছে, ভগবানের নৈবেদ্য।' অমনি একটি পরিতৃপ্তির হাসি ফুটে উঠলো এচাম্মার মুখে।

আগাগোড়া সমস্ত খবর পেয়েও ভগবান রইলেন নির্বিকার। আশ্রমের ডাক্তার বারংবার গিয়ে যথাসাধ্য চিকিৎসা করলো, ভক্তেরা অনেকেই তাঁকে ক্ষণে ক্ষণে জানিয়ে গেলো যে রোগিনী অবস্থা ক্রমেই অবনতির দিকে যাচ্ছে। ভগবান কান পেতে সকলের সব কথা শোনেন, কিন্তু কিছুই বলেন না। যে রাত্রে এচাম্মার মৃত্যু হ'ল সেদিন সন্ধ্যার আগে থেকেই ভগবানকে একেবারে নিস্তব্ধ ধ্যানে নিমজ্জিত দেখে কেউ আর তাঁর সামনে গিয়ে বেশিক্ষণ বসে নি। ভগবান পদ্মাসনে উপবিষ্ট। খোলা চোখ দুটি জ্যোতির্ময় হ'য়ে উঠেছে। সেই নিষ্পলক দৃষ্টির দিকে বেশিক্ষণ তাকানো যায় না। সেই চিরদিনের পরিচিত মানুষটির দেহাধারে যেন কি এক পরমাশ্চর্য বস্তুর অধিষ্ঠান হয়েছে—যা বিশ্বাতীত—যার তুলনা কোথাও কিছু নেই। এচাম্মার মহাপ্রয়াণের পরে জানা গেল যে যখন থেকে তাঁর মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হয়েছিল, ঠিক তখন থেকেই ভগবানের এই ভাবান্তর দেখা গিয়েছিল।

এচাম্মার মৃত্যুর পরের দিন, এচাম্মার কন্যাস্থানীয়া সুরী নাগাম্মা,

(যিনি দিনের পর দিন ভগবানের দৈনন্দিন জীবনের অনেক কথা চিঠির আকারে লিপিবদ্ধ করেছেন) ভগবানের কাছে যখন সমস্ত বিবরণ জানালেন, ভগবান প্রসন্ন মুখে বললেন, 'কতবার আমি এচাম্মাকে বলেছি, যেন প্রত্যেকদিন এই খাবার পাঠানো বন্ধ করে। কিন্তু সে-কথা সে কানেই তোলে নি। আমাকে খাবার না পাঠিয়ে সে কোনদিন কিছু খায়নি। তাই আমিও আর কিছু বলতে পারি নি। বেশি বাধা দিলে সে নিজেই খাওয়া বন্ধ করতো। সে আজ নেই : কিন্তু আজ পর্যন্ত তার ব্যবস্থামত আমার খাবার তার বাড়ি থেকে এসেছে।' এইটুকু বলেই ভগবান এই প্রসঙ্গের মোড় ফিরিয়ে অন্য কথায় সুরীকে ভুলিয়ে দিয়েছেন।

সম যে ব্রহ্মের আর এক নাম, ভগবানের প্রতিদিনের আচরণ দেখলেই তা বোঝা যেতো। রমণাশ্রমের যে কোন অতিথি অভ্যাগত, যে কোন জীবজন্তুর যে অধিকার, তার অতিরিক্ত কোন কিছুই তিনি স্বীকার করতে চাইতেন না। বিশেষভাবে তাঁর নিজের জন্য কোন রকমের ব্যবস্থাকেই তিনি খুশি মনে মেনে নেন নি। তাঁর ভাব দেখে মনে হ'ত, তিনিও যেন আর দশজন অতিথির মত আর একটি অতিথি মাত্র। ভক্তদের নির্বন্ধাতিশয্যে একান্ত অনিচ্ছায়, অশক্ত দেহে যেটুকু সেবা তিনি গ্রহণ করেছেন, তাতেই যেন তিনি সবাইকার কাছে কুণ্ঠিত বোধ করেছেন। প্রত্যেকের সুখ-সুবিধার দিকে ছিলো শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর সজাগ দৃষ্টি। অথচ নিরাসক্তির এতটুকু তারতম্য ছিল না।

আয়ুর্বেদ বিশারদ রামচন্দ্র রাও মস্ত একটি শ্রেষ্ঠ ভেষজের তালিকা নিয়ে ভগবানের কাছে এসে বসলেন। ভগবান তালিকাটি হাসি মুখে হাতে নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাদের গুণপনা শুনলেন। শেষে বললেন, 'ভেষজগুলি অমূল্য, তাতে আমার সন্দেহ নেই। কিন্তু এগুলি কার জন্য বলো তো?' রামচন্দ্র খুশি হয়ে বললেন, 'আপনার

জন্য, ভগবান।' ভগবান হেসে বললেন, 'তা ভালো। কিন্তু এ যা দেখছি এ তো বেশ খরচের ব্যাপার: অন্ততঃ দশ টাকা লাগবে এতে। আমি এত টাকা পাবো কোথায়, চাইবোই বা কার কাছে?' উপস্থিত এক ব্যক্তি অর্থপূর্ণভাবে চারিদিকে তাকিয়ে বললো, 'তবে এসব কার ভগবান?' ভগবান বললেন, 'তা জানি না; কিন্তু আমার কি আছে? একটা পয়সার দরকার হ'লে আমাকে চেয়ে নিতে হয় সর্বাধিকারীর কাছে। আমি কি তার কাছে গিয়ে এই প্রার্থনা জানাবো? খাবার ঘণ্টা বাজলে যদি আমি হাজির হই, দুটি খেতে পাই। সবাইকার সঙ্গে আমিও খাই। দেরি ক'রে গেলে খাওয়া না জুটতেও পারে। আমার পাতে খাবার পড়ে সবাইকার শেষে। এই তো আমার অবস্থা!'

ভগবানের কথার সুরে ভয়ে ভয়ে কবিরাজ বললো, 'ভগবান, এসব ভেষজ আমি নিজেই আনবো।' ভগবান বললেন, 'বটে? তুমিই আনবে? বেশ বেশ।' কিন্তু এই সব ভেষজে যদি আমার উপকার হয়, এখানকার সবাইকারই তো এতে উপকার হওয়ার কথা। আমার সঙ্গে সবাইকার মত ওষুধই কি তুমি যোগাতে পারবে?' আশ্রমের একজন বললে, 'আমাদের ওষুধের কি প্রয়োজন, ভগবান?' ভগবান বললেন, 'যারা শারীরিক পরিশ্রম করে তাদের যদি বলকর ওষুধের দরকার না থাকে, তবে আমারই বা কিসের প্রয়োজন? বসে থাকা আর খাওয়া ছাড়া আমি তো আর কিছুই করি না।'

ভগবানের ভাবে সবাই বুঝলো যে কোন তর্কযুক্তিতেই কোন কাজ হবে না: সবাই সমভাবে যা পাবে না, তা ভগবান কোনমতেই গ্রহণ করবেন না।

অসুখের সময়ে ভক্তেরা দেশ-দেশান্তর থেকে চিকিৎসক আনিয়েছেন। ভগবান নির্বিকার প্রসন্নতায় তাঁদের গ্রহণ করেছেন:

সম্মতি বা অসম্মতি কিছুই প্রকাশ করেন নি। কিন্তু যখনই তাঁরা তাঁর স্বাস্থ্যোন্নতিকল্পে উপযুক্ত বলকারক পথ্যের নির্দেশ দিয়েছেন, ভগবান বলেছেন, 'আমি এক দরিদ্রনারায়ণ। এই সব রাজভোগ আমার জুটবে কেমন ক'রে? একা যদি হতাম, সে ছিল আলাদা কথা। আমার পরিজন অসংখ্য। এত বড় একটা পরিবার আমার। এই সব দামি দামি ফল, দুধ, ছানা, মাখন যে আমরা সবাই মিলে খাবো, সে সঙ্গতি কোথায়?'

ভগবানের শরীর যখন একেবারে ভেঙে পড়েছে, তখন ভক্তদের নির্বন্ধাতিশয্যে, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি যখনই বিশেষ কোন খাদ্য গ্রহণ করেছেন, নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বলে উঠেছেন, 'আমাকে অসহায় বুঝে এরা আমার উপরে যদি এভাবে নির্যাতন করে, আমি কি করতে পারি? আমি পরমুখাপেক্ষী বলেই এসব আমাকে স্বীকার ক'রে নিতে হয়। ওরা যা বলে তাই আমাকে শুনতে হয়, যা আমাকে খেতে দেয় বাধ্য হ'য়ে আমাকে খেতে হয়। স্বামীত্বের বিড়ম্বনা একেই বলে। ওরা জেনে নিয়েছে যে আমি একান্ত অক্ষম : ওদের দয়ার প্রত্যাশী। অতএব ওদের মতেই আমাকে চলতে হবে।'

ভগবানের এই সহজ ও চিরন্তন সাম্যদৃষ্টি যাদের থাকবার কথা নয়, তারা ভক্তিভরে তাদের সচল দেববিগ্রহকে যখনই বিশেষ একটি মর্যাদার আসনে বসাবার চেষ্টা করেছে, তখনই ভগবান ব্যথিত হয়েছেন। তাঁর শরীরে বারংবার অস্ত্রোপচার হয়েছে ভক্তদের চোখের সামনে। ভগবান নির্বিকার হাসিমুখে সেই ছুরি চালানো চেয়ে চেয়ে দেখেছেন। শরীরটা যে কার সে বোধই তাঁর ছিল বলে মনে হ'ত না। ভক্তেরা এ দৃশ্য সইতে না পেরে চোখের জল মুছতে মুছতে সেখান থেকে সরে যেতো। অন্তর্যামী ভগবান তাদের মনোবেদনা টের পেয়ে বলতেন, 'কেমন ক'রে আমি ওদের বোঝাবো

যে আমি দেহ নই? দেহটাকে ওরা আমি বলে কেবলই ভুল করে। যে অঙ্গে ছুরি চালাচ্ছে তার সঙ্গে আমার কিসের সম্বন্ধ?' ভক্তেরা বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করেছে, 'শরীরের ব্যথা কি আপনি অনুভব করেন না?' ভগবান হেসে বলেছেন, 'কে বলে অনুভব করি না? দেহটাকে আমার বলে যতটুকু মনে করি ততটুকুই থাকে দেহের বেদনা। বেদনার অনুভূতি না থাকলে আর বাতের ব্যথায় মালিশ করি কেন? কিন্তু দেহকে স্বীকার করা-না-করা যার হাত, সে আমি তো আমার দেহ নয়। স্ব-স্বরূপে থাকলে আর দৈহিক বেদনার অস্তিত্ব থাকবে কোথায়?'

নিজের দেহটাকে পর্যন্ত যিনি আমল দিতে চাননি, তিনি কেমন ক'রে নিজের ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধার দিকে নজর দেবেন? বিশেষ ভাবে ভগবানের জন্য কিছু করতে গেলেই তিনি অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠতেন। ভগবানের রোগজীর্ণ অসুস্থ দেহে প্রখর রৌদ্রতাপ সহ্য হবে না ভেবে ভক্তেরা তাঁর দিকের পর্দাটি সযত্নে টেনে দিয়েছে দেখে, ভগবান ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিলেন, 'ছাখো এদের কাণ্ড। ঘরের মধ্যে সর্বত্র রোদ্দুর এসে পড়েছে: সকলের গায়েই লাগছে তাপ। কিন্তু পর্দা টেনে দিয়েছে কেবল আমার দিকটায়—আহা, স্বামীর সোনার অঙ্গে রোদ্দুর লাগবে! ওরা ভাবে, আমার দেহটাই মানুষের দেহ, আর সবাই মানুষ নয়। বিশেষ ব্যবস্থা আমার জন্য যদি না হয়, তাহ'লে আর আমার স্বামীত্বের মর্যাদা রইলো কোথায়। আর সবাইকার গায়ে রোদ্দুর লাগলে কার কি এসে যায়? কেবল স্বামীজীর গায়ে তা না লাগলেই হ'ল। তাদের ভাব—স্বামী একটি স্বতন্ত্র বস্তু। তার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হওয়া চাই। তার গায়ে হাওয়া, রোদ্দুর লাগানো চলবে না। নিশ্চল পুতুলের মত সে গদির উপরে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকবে। নড়া-চড়া, কথা বলা তার বারণ। তাই সবাইয়ের থেকে পৃথকভাবে তার জন্য আলাদা ব্যবস্থা না হ'লে তার মান থাকবে কেমন ক'রে!'

যে ভক্তেরা বুদ্ধি ক'রে ভগবানের দিকের পর্দাটি টেনে দিয়েছিল, তিরস্কৃত হ'য়ে তাড়াতাড়ি পর্দাটি টেনে সরিয়ে দিল। প্রখর রৌদ্রকর ঝাঁপিয়ে এসে পড়লো ভগবানের দেহে।

একবার আশ্রমে এলেন ভগবানের দর্শনে এক আমেরিকান মহিলা। আসন-পিঁড়ি হয়ে বসার অভ্যাস না থাকায়, তিনি অতি-কষ্টে সবাইকার পাশাপাশি বসে, সামনের দিকে পা দুটি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। ভগবানের দিকে তাঁর পদদ্বয় প্রসারিত রয়েছে দেখে কোন এক ভক্ত তাঁকে পা মুড়ে বসতে অনুরোধ করলেন। ভগবান বললেন, 'তাতে কি হয়েছে? দেখছো না, মাটিতে এমন ক'রে বসাই এর পক্ষে কষ্টকর, তার উপরে আবার এক-পা মুড়ে বসতে বলছো? ভাবছো বুঝি এতে আমার অসম্মান হচ্ছে? তাই যদি হয়, আমিই বা এমন ক'রে পা ছড়িয়ে বসে আছি কোন অধিকারে? এতেও তো সবাইকার অমর্যাদা হ'তে পারে।'

এই বলে তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁর বাতাক্রান্ত চরণ দুটি গুটিয়ে নিয়ে বসলেন। এভাবে বসলে তাঁর পায়ে অসহ্য যন্ত্রণা হয়—সে কথা সবাইকার জানা ছিল। কিন্তু ভগবান কারুর কথায় কর্ণপাত করলেন না। বললেন, 'তা কি ক'রে হয়? অন্যে যেভাবে বসলে অভদ্রতা হয়, আমার বেলাতেই বা তার ব্যতিক্রম হবে কেন?' দর্শনান্তে বিদেশী মহিলাটি চলে যাওয়ার পরেও বহুক্ষণ পর্যন্ত তিনি পা মুড়েই বসে রইলেন।

আর একবার এলো এক দীনহীনা বৃদ্ধা। সবাই একে একে প্রণাম ক'রে যথাস্থানে বসে পড়লো; কিন্তু বৃদ্ধাটি স্থানুর মত দাঁড়িয়ে রইলো। প্রণামও করে না, বসেও না—দেখে সবাই উত্যক্ত হ'য়ে উঠলো। যারা বৃদ্ধার সঙ্গে এসেছিলো তারা হাজার টানাটানি ক'রে তাকে সরাতে পারলো না। ভগবানের পার্শ্বচরেরা তাকে বারংবার অনুরোধ ক'রেও কিছুতেই বসাতে পারলো না। ভগবানের

ইঙ্গিতে সুরী নাগাম্মা বৃদ্ধাটিকে ধীরে ধীরে নিয়ে গেল ভগবানের কাছাকাছি। এবারে আর সে কোন বাধা দিল না। ভগবানের সম্মুখে দাঁড়িয়ে হাতের পাতা দিয়ে চোখের আলো বাঁচিয়ে একদৃষ্টে সে অনেকক্ষণ ধরে ভগবানের দিকে তাকিয়ে রইলো। বিষণ্ণ স্বরে বললো, 'আমার চোখে দৃষ্টি নেই; কিছুই দেখতে পাই না। যেটুকু আলো দেখি, তাও ঝাপসা। চোখে তো তোমাকে দেখতে পেলাম না, ভগবান। এই আশীর্বাদ করো যেন মনের চোখ দিয়ে তোমাকে দেখতে পাই।'

করুণাময় ভগবানের অন্তরের কথা কে জানবে? স্নিগ্ধ, কোমল দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে ভগবান বললেন, 'তাই হোক।' কৃত-কৃতার্থ হয়ে বৃদ্ধা খুশি মনে প্রণাম ক'রে চলে গেল। তার পরবর্তী ইতিহাস একমাত্র সে জানে আর জানে তার অন্তর্যামী।

নানান ধরনের প্রশ্নের মধ্যে যে প্রশ্নটি লোকে বারংবার ভগবানকে জিজ্ঞাসা করেছে, সেটি সাধকজীবনের প্রাথমিক প্রশ্ন—'গুরু মিলবে কোথায়? কে দেখাবে পথহারার পথ? কে খুলে দেবে অন্ধের চোখ? কে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে আলোর পথে, আত্মজ্ঞানের পথে? এই ধরনের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান বলেছেন, 'নিজেকে আগে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখো, সত্যিই কি তুমি জানতে চাও, সত্যিই কি অজ্ঞান তোমার কাছে অসহ্য হ'য়ে উঠেছে? তা যদি হ'য়ে থাকে, তোমাকে আর গুরু খুঁজে বেড়াতে হবে না। গুরু নিজেই তোমাকে খুঁজে নিয়ে তোমার কাছে এসে হাজির হবেন। যেমন ক'রে হোক তিনি হাত বাড়িয়ে টেনে নেবেন। সদাজাগ্রত তাঁর দৃষ্টি সমভাবে আছে সকলের উপরে। তোমার চাওয়ার মনটি হওয়ার যা অপেক্ষা। তিনি উৎকর্ণ হ'য়েই আছেন; গ্রহণে উন্মুখ হয়ে প্রতীক্ষায় আছেন। যখন যেখানে আছো, রয়েছো তাঁরই পক্ষছায়ায়। পক্ষীমাতার মত ক'রে তিনি ডানা মেলে আমাদের আগলে রেখেছেন। আমরা

আকুল আন্তরিকতায় বিশ্বাস ক'রে একটু চাইলেই গুরুরূপে তিনিই এসে হাজির হবেন তোমার জীবনে।'

ভক্তেরা জিজ্ঞাসা করেছেন, 'কিন্তু ভগবান, এই চাওয়াটি জাগাবার জন্যও তো গুরুর প্রয়োজন। সাধনা না হ'লে এমন অবস্থা আসবে কি ক'রে? সাধনার জন্যও তো চাই গুরুর কৃপা, গুরুর উপদেশ।' ভগবান বলেছেন: 'সে উপদেশ তো প্রতিদিনই শুনছো। উপদেশের অভাব কি? যার প্রয়োজন সে নিলেই তো পারে উপদেশ।' ভক্ত বলেছেন, 'ভগবান আশীর্বাদ করলেই তো সব হয়। উপদেশ গ্রহণ করবো কি ক'রে আশীর্বাদ ছাড়া?' হাসিমুখে ভগবান বলেছেন, 'আশীর্বাদ দেওয়াই আছে; কেবল নিতে পারলেই হয়। নিঃশব্দে ক্রিয়া করে এই আশীর্বাদ। গুরু যিনি, তিনি তো দেহ নন: তিনি দেহ থাকতেও বিদেহ, দেহাতীত। দেহে যদি তিনি না থাকেন তথাপি তিনি থাকেন: তখনো সমানভাবে ক্রিয়া করে তাঁর আশীর্বাদ। একবার যে এই কৃপায় অবগাহন করেছে তার আর ভাবনা কি? যেখানে যখনই সে থাকুক, এই কৃপারূপ আশীর্বাদ তাকে বেষ্টন ক'রে থাকবে। নিষ্ঠা ও বিশ্বাসের সঙ্গে চাওয়ার হাতটি পেতে রাখলেই সে প্রার্থিত অবস্থাটি পাবে। তবে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে না পারলে কি কোন বৃহৎ বস্তু পাওয়া যায়?'

ভগবানের ভক্তেরা যখন মহোৎসাহে সুবর্ণ-জয়ন্তী অনুষ্ঠানের উদ্যোগ করেছেন, তারই বিস্তারিত কর্মসূচী নিয়ে মাদ্রাজ থেকে এলেন ডোরাইস্বামী আয়ার। দূর-দূরান্তর থেকে যাঁরা শ্রদ্ধার্ঘ্য নিয়ে আসবেন তাঁদের দীর্ঘ তালিকার উপরে চোখ বুলিয়ে ভগবান হেসে বললেন, 'এ যে দেখছি এক সমারোহ ব্যাপার। তবে এ নিয়ে আমার দুশ্চিন্তার কি আছে? সময়মত একটু বেরুতে পেলেই আমার চলবে। এই সব বড় বড় লোক না কি বক্তৃতা করবেন! কি তাঁরা বলবেন কে জানে? বলার কথা আছেই বা কি? মৌনতা ছাড়া

আর কি আছে ? এই মৌনকে কথা দিয়ে কতটুকু বোঝানো যাবে ? ইংরাজি, সংস্কৃত, তামিল, তেলেগু কত ভাষায় বিশিষ্ট লোক ভাষণ দেবেন। তা দিন ; আমার তাতে কিসের মাথাব্যথা ? আমাকে কিছু বলতে না বললেই আমি খুশি।'

ডোরাইস্বামী সবিনয়ে নিবেদন করলেন, 'এই তালিকার কোন অংশ যদি বাদ দিতে বলেন, সেই রকমই ব্যবস্থা হবে।'

ভগবান বললেন, 'তাই না কি ? কিন্তু আমি তো এর কোনটাই চাই নি ; চেয়েছো তোমরা। এখন আপত্তিই বা আমি করতে যাব কেন ? যেমন যা খুশি তোমরা করতে পারো। হবে তো একরাশ বক্তৃতা। আমি যেমন এখন বসে আছি তেমনি ক'রে গদির আসনে আরাম ক'রে বসে থাকবো বই তো নয়।' এই কথা বলে ভগবান হাসতে লাগলেন।

১লা সেপ্টেম্বর ১৯৪৬ সালের সুবর্ণ-জয়ন্তী অনুষ্ঠান মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হ'ল। দেশ-দেশান্তরের গুণী, জ্ঞানী, মনীষীরা এসে সমবেত হলেন। সুসজ্জিত মণ্ডপের মধ্যে, সহস্র সহস্র দর্শনকামী নরনারীর সমক্ষে ভগবান বেদীর উপরে স্থির হ'য়ে সারাদিন বসে রইলেন ; সব কিছু দেখলেন, সব কিছু শুনলেন। কিন্তু কোন ব্যাপারে কোন কথাই বললেন না। নির্বিকার প্রসন্ন মৌনতায় একভাবে স্থির হ'য়ে বসে রইলেন। গান হ'ল, বক্তৃতা হ'ল, স্তোত্রপাঠ হ'ল, কত রকমের কত ছবি তোলা হ'ল ; কত লোক এলো কত লোক গেল ; কত প্রণতি, কত আরতি, কত শ্রদ্ধার্ঘ্য। কিন্তু যাঁকে কেন্দ্র ক'রে হ'ল এত বহুবিচিত্র সমারোহ, তিনি রয়ে গেলেন উদাসীন : সবাইকার মাঝখানে থেকেও কোন গ্রহান্তরের মানুষের মত সুদূর। পাছে একটানা এতক্ষণ ধ'রে একভাবে বসে থাকলে তাঁর কষ্ট হয়, সেই ভয়ে ভক্তেরা বারংবার তাঁকে বিশ্রাম নিতে বলেছিলেন। উত্তরে হাসিমুখে ভগবান বলেছিলেন, 'সে কেমন ক'রে হয় ? কত কষ্ট ক'রে এত লোক যদি এতদূরে

আমার জন্য আসতে পারে, তাদের বঞ্চিত ক'রে বিশ্রাম নেওয়া কি আমার সাজে ? যদি কেউ আমার দেখা না পেয়ে নিরাশ হ'য়ে ফিরে যায় ?'

সহজ মানুষ ভগবানকে কেবল ব্রহ্মবাদী মহর্ষিরূপে যারা কল্পনার দৃষ্টিতে দেখেছে, কাছাকাছি এসে তারা কেউ কেউ হয়তো বা প্রথমটা একটু হতাশই হয়েছে। ভেবে এসেছে এই বিশ্ববরেণ্য লোকোত্তর পুরুষকে দেখবে মহিমার আসনে সমাসীন মঠাধ্যক্ষের রূপে। এসে দেখেছে এক নেংটি-পরা সহজ মানুষ আপন মনে বসে বসে ছুরি দিয়ে তরকারির খোসা ছাড়াচ্ছেন, কিংবা কাঁচি হাতে প্রাত্যহিক সংবাদপত্রের সাদা অংশগুলি সযত্নে কেটে কেটে জমিয়ে রাখছেন। সমাগত দর্শনপ্রার্থীর অনুক্ত প্রশ্নের উত্তরে মৃদুহাস্যে বলেছেন, 'কত চিঠি আসে, এক পিঠে লেখা আর এক পিঠ সাদা। মিছে কেন কাগজ নষ্ট হবে ? ছোট ছোট এই কাগজের টুকরোগুলিতে মাঝে মাঝে আমি লিখি। ভালো কাগজে আমার কি দরকার ? একটু কাগজের জন্য লোকের কাছে হাত পাতবার প্রয়োজন কি ? আশ্রমে কত লোকের কাছে বইয়ের পার্শেল আসে। তার মোড়কগুলি জমিয়ে রাখলে আমার লেখার কাজ বেশ চলে যায়। সেগুলি দিয়ে বইয়ের মলাটও দেওয়া যায়। এই সব আলপিনগুলি কত কাজে লাগে। অপচয় করবার অধিকার আমাদের নেই।'

প্রথম প্রথম যারা এই সব ছোটখাটো ব্যাপারে কৌতুক বোধ করেছে, কয়েকদিনের মধ্যেই তারা এই ইঙ্গিতের অর্থ বুঝতে পেরে অভিভূত হ'য়ে গেছে। ভগবান নিজের হাতে নারকোলের মালা কেটে বাটি, চামচ তৈরি করেছেন; কমলালেবুর খোসাগুলি দিয়ে চাটনি তৈরি করেছেন, গোলাপ ফুলের ঝরা পাপড়িগুলি নিজের হাতে কুড়িয়ে এনে পায়সের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন, প্রাতঃভ্রমণকালে আগাছার জঙ্গল থেকে নানারকমের উদ্ভিজ সংগ্রহ ক'রে এনে স্বহস্তে বিচিত্র ব্যঞ্জন রেঁধে সকলকে খাইয়েছেন।

হয়তো বা সহজ মানুষটির এই সব সাধারণ কার্যকলাপ দেখে রীতিমত বিভ্রান্ত হ'য়ে, কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করেছেন, ভগবান, আমার কৌতূহল মার্জনা করুন। কোন সময়েই তো আমি আপনাকে সাধনা করতে দেখি না। কিন্তু সাধনা না ক'রে তো আর আপনার এই অবস্থা হয় নি; তাই, সেই সাধনার বিষয়ে কিছু শুনতে চাই।' উত্তরে, একমুখ হেসে, ভগবান বলেছেন, 'সাধনা? কিসের জন্য সাধনা? সাধনা করতে যাবো কিসের জন্য? এই যেমন ক'রে বসে আছি এই আমার সাধনা। চিরদিন এমনি ভাবেই বসে থেকেছি। আগে আগে চোখ বন্ধ থাকতো, এখন চোখ খোলা থাকে, এই মাত্র পার্থক্য। এখন যা যেমন আছে, তখনো তাই ছিল। সাধনার প্রয়োজন হয় যখন অনাত্মবস্তু থাকে। আত্মবস্তুর দিকে যার চোখ ফেরানো নেই তারই জন্য সাধনার নির্দেশ। চিরন্তন আত্মবস্তুকে ছেড়ে যার দৃষ্টি আচ্ছন্ন হ'য়ে আছে জাগতিক, পরিবর্তনশীল, মায়ার জালে, সাধনা কেবল তারই জন্য। আত্মবস্তু ছাড়া আর কোন কিছুই যার চোখে পড়ে না, সে আর কিসের জন্য সাধনা করবে? সদাসর্বদা যে সত্ত্বা সাক্ষাতে রয়েছে—তার বাহিরে আর কোথায় কি আছে? সেই সাক্ষাৎ নিত্যবস্তুকে অবহেলা ক'রে লোকে মনঃকল্পিত সাধনায় মিছেই তৎপর হ'য়ে ওঠে। কোথা থেকে কোন অন্তরীক্ষচারী ঈশ্বর অকস্মাৎ আবির্ভূত হ'য়ে সাধককে তার প্রার্থিত বরদানে কৃতকৃতার্থ ক'রে যাবেন? অতি-প্রত্যক্ষ-রূপে যিনি নিয়ত বিদ্যমান, তাঁকে বাদ দিয়ে লোকে সাধনার অর্থহীন ভান করে। তাতে কেবল বাড়ে মনের অশান্তি আর নিষ্ফল প্রয়াস। অথচ, কেবল একটু স্থির হ'য়ে নিজের মধ্যে অবগাহন করলেই সমস্ত দুঃখের নিরসন হ'য়ে যায়।'

এর পরেও প্রশ্ন উঠেছে—'কিন্তু ভগবান, সবাই কি এমনি ক'রে এত সহজে নিজের মধ্যে অবগাহন করতে পারে? আপনার পক্ষে

যা এত সহজ ও স্বাভাবিক, সবাইকার ক্ষেত্রে কি তাই? সাধনা ছাড়া কে কি করবে? সাধনার প্রয়োজন যে আছে, এ কথা তো অস্বীকার করা যায় না।'

ভগবান বলেছেন, 'সাধনার প্রয়োজন অবশ্যই আছে। কিন্তু তার উদ্দেশ্যটা ভুললে চলবে না। সর্বকালে, সর্বঘটে, সর্বত্র বিরাজমান যে চরম ও পরম বস্তু—তাঁর সন্ধান করবার জন্য সাধনা নয়। তাঁকে সন্ধান ক'রে পাওয়া যায় না, কারণ তিনি প্রত্যক্ষ বস্তু। সাধনার দ্বারা কেবল চোখের আবরণটুকু খুলে ফেলতে হয়। বস্তুজগৎ, মায়াজগৎ, যেখানে সত্যের ছদ্মবেশ ধারন ক'রে মনকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখতে চায়, তখনই প্রয়োজন সাধনার। দেহবোধ ও চিন্তার ভ্রান্তি কাটাবার জন্যই সাধনা। যে ভ্রান্তির ফলে অনিত্য বস্তু সত্য ব'লে প্রতীয়মান হয় তারই মূলোচ্ছেদ করে সাধনা। স্ব-স্বরূপকে জানবার জন্য আত্মসত্ত্বার আবার সাধনার প্রয়োজন হবে কেন? নিজের স্বরূপ যে জেনেছে সে তার বাইরে আর কোন কিছুর অস্তিত্বকে স্বীকার করবে কেন?'

ভগবান রমণের নানা ভাবের নানা কথার মধ্যে ওতপ্রোত হ'য়ে আছে একটি মাত্র পরম উপলব্ধি। বহুবিচিত্র বাণীর মণিখণ্ডগুলি গ্রথিত হয়েছে একটি মাত্র জ্যোতির্ময় হেমসূত্রে। যার ভাণ্ডারে যতটুকু ধরে, সে ততটুকু পেয়ে ধন্য হ'য়ে গেছে। কিন্তু রত্নাকর মহাসমুদ্রের অতলস্পর্শ গভীরে অবগাহন করার সামর্থ্য আছে কয়-জনের? প্রস্তুতি যার আছে, সে ভগবানের ভাবধারার মর্মমূলে প্রবেশ করবার অধিকারী। কিন্তু যার সে সৌভাগ্য হয় নি—সেও চায় একান্ত নির্ভরতার শান্তি। ভগবানের ছোটখাটো কথাগুলির মধ্যে ছড়িয়ে আছে সেই পরম-প্রার্থিত শান্তিপথের ইঙ্গিত। ভগবান বলেছেন, 'সবাই শান্তি চায় বলেই নিজেকে জানতে চায়। শান্তির স্বাদ অন্তরে অন্তরে জানে বলেই তো সবাইকার লোভ আছে শান্তির

উপরে। শান্তি যে পাওয়া যায় এবং তার চেয়ে বড় কাম্য যে কিছু নেই—এই প্রচ্ছন্ন বোধটুকু মানুষের মনে যদি না থাকতো, তা হ'লে সে এমন ব্যাকুল হ'য়ে শান্তির সন্ধান ক'রে ফিরতো না। নানাভাবে, নানা পথে মানুষ শান্তি খুঁজে বেড়াচ্ছে, কারণ শান্তির চেয়ে বড় সত্য আর কিছু নেই। এই শান্তিরই নামান্তর আত্মা, পরমাত্মা, সত্ত্বা। নাম বহু, কিন্তু বস্তু সেই এক এবং অদ্বিতীয়, যা প্রত্যেকের মধ্যেই বিদ্যমান। যা নিজের মধ্যেই আছে, তার জন্য তপস্যা করতে হয় না। কেবল মনের চাঞ্চল্যটুকু দমন করতে পারলেই স্বয়ংসিদ্ধ শান্তি স্ব-স্বরূপে চিদাকাশে ফুটে ওঠে। যা কিছু চেষ্টা কেবল এইটুকুর জন্য।

'অবান্তর কত বিষয় নিয়ে লোকে মাতামাতি করে। সৌরলোক পেরিয়ে মহাব্যোমে যেসব গ্রহ-নক্ষত্র আছে, লোকে ভাবে তারই কোনখানে আছে অনন্ত শান্তিধাম। কিন্তু সেই সমস্ত লোকে আর নতুন কি আছে? বেতার যন্ত্রের কল্যাণে যেমন ক'রে দূর-দূরান্তের ধ্বনি এখানে বসে শোনা যাচ্ছে, তেমনি মনের সূক্ষ্মযন্ত্রে ব্রহ্মাণ্ডের সকল রহস্যই ধরা যায়। কিন্তু তাতে কি লাভ? স্থানান্তরে ঘুরে ঘুরে শ্রান্ত ক্লান্ত হ'য়ে আবার তো সেই চিরন্তন হাহাকারের মধ্যে ফিরে আসতে হয় শাশ্বত শান্তির খোঁজে। বৈকুণ্ঠ, কৈলাস, ইন্দ্রলোক, চন্দ্রলোক কিছুই মিথ্যা নয়। সবই আছে, সবই সত্য। এখানে যেমন, সেখানেও তেমনি। জিজ্ঞাসুরা সেখানেও এমনি ভীড় ক'রে কোন এক জ্ঞানীকে প্রশ্ন করছে, উত্তর পাচ্ছে। সেখানেও লোকে এখানকার মত ক'রেই শান্তির অনুসন্ধান করছে, নিজেকে জানবার চেষ্টা করছে। এখানেও যা সেখানেও তাই। আর নিজেকে যদি জানা না হয়, তাহলে এখানকার, ওখানকার, সেখানকার চিন্তা নিয়ে কি হবে? বই পড়েই বা কি হবে? নিজেকে না জানলে কিছুতেই কিছু লাভ নেই।'

ভগবান রমণের নিজের মুখের কথাগুলি যতদূর সম্ভব আক্ষরিক

অনুবাদে এখানে দেওয়া হ'ল। ছোটখাটো বহু বিবরণ অনন্ত নিষ্ঠায় ও অসীম শ্রদ্ধায় তাঁর অসংখ্য চিঠিপত্রে যিনি লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন—সেই নিবেদিতপ্রাণা ভক্তিমতী সুরী নাগাম্মার কাছে মহর্ষির ভক্তবৃন্দ চিরঋণী হ'য়ে থাকবেন। তিনি বহুযত্নে এই মণিমাণিক্যগুলি সংগ্রহ ক'রে রেখেছিলেন বলেই স্থান-কালের ব্যবধান অতিক্রম ক'রে বহুদূরের মানুষটির এমন অন্তরঙ্গ পরিচয় আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে মহর্ষি রমণকে যারা কেবল নীরস অদ্বৈতবাদী রূপে কল্পনা ক'রে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়, তাঁর কাছে এসে তারা দেখেছে তাঁর সহজ সুন্দর আর একটি আশ্চর্য রূপ। এই মনোমুগ্ধকর আশ্চর্য রূপটি দু-চোখ ভ'রে না দেখলে বুঝি এই ব্রহ্মজ্ঞ পরমপুরুষকে দেখা সম্পূর্ণ হয় না। একমাত্র সুরী নাগাম্মার দৌলতেই আমরা কাছের মানুষ মহর্ষিকে এত কাছে দেখতে পেয়েছি। যেটুকু দেখেছি তাতেই আমরা কৃতার্থ।

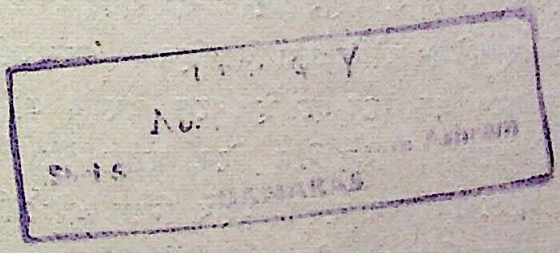

পরিনির্বাণ

এ পর্যন্ত মহর্ষি-জীবনীর একটানা ধারাবাহিকতার বক্ষে কোনরূপ পরিচ্ছেদের বিভাগ টানা হয় নি। ব্যতিক্রম ঘটলো, অপরিহার্য ভাবে এই তথাকথিত শেষ পরিচ্ছেদে। তথাকথিত—কারণ অসীমের নেই সীমা, অশেষেরও নেই শেষ। মরদেহে অধিষ্ঠান কালেই যিনি মরদেহের সমস্ত প্রাকারকে অতিক্রম ক'রে ভূমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন তাঁর জীবনের শেষ দুই তিন বৎসরের লীলা-কাহিনীর সঙ্গে বাস্তবিক পক্ষে তাঁর নিজের কোন যোগ নেই। কিন্তু তথাপি যে দেহ-মন্দিরের বেদীতলে শত সহস্র ভক্তের শ্রদ্ধাভক্তির আরতি-প্রদীপ জ্বলেছে দীর্ঘ চুয়ান্ন বৎসর ধ'রে, সেই দেহ-মন্দিরে মহর্ষি রমণের শেষ-লীলার পরম গম্ভীর পরিশিষ্টটুকুকে বাদ দিলে চলে না।

১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষি, মহর্ষি রমণের বাম বাহুর মধ্যগ্রন্থির পাশে ছোট একটি যব-পরিমাণ স্ফীতি দেখা গিয়েছিল। পতন জনিত সামান্য আঘাতের ফলে এর উদ্ভব হয়েছিল বলে প্রথমটা এদিকে বিশেষ কোন দৃষ্টি পড়েনি। কিন্তু দিনে দিনে, অত্যন্ত ধীরে ধীরে স্ফীতিটি বাড়তে লাগলো। বলা বাহুল্য মহর্ষি নিজে এই দৈহিক পীড়ার প্রতি ছিলেন সম্পূর্ণ অমনোযোগী।

১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে ফুলোটি বর্ধিত হ'য়ে প্রায় একটি আমলকির আকার ধারন করেছে দেখে, আর কালবিলম্ব না ক'রে অস্ত্রোপচার করানো হ'ল। মহর্ষির এ বিষয়ে কিছুমাত্র উৎসাহ ছিল না। কারণ চিরদিনই তিনি একভাবে স্বভাব-ধর্মে নির্ভরশীল। দিন দশেকের মধ্যে ঘা শুকিলে এলো, কিন্তু ঘায়ের

উপরের চর্মাবরণটিকে ঠিক সুস্থ বলে মনে হ'ল না। মাক্রভূতেশ্বর মন্দিরের কুম্ভ অভিষেক উৎসবে মার্চ মাসে তিনি যথারীতি যোগ-দান করলেন। উৎসবান্তে মাদ্রাজ থেকে অভিজ্ঞ শল্য চিকিৎসকগণ ক্ষতস্থান পরীক্ষা ক'রে ক্যান্সার বলে সিদ্ধান্ত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে এপ্রিল মাসে দ্বিতীয়বার অস্ত্রোপচার করা হ'ল। টিস্যু পরীক্ষায় জানা গেল রোগটি সারকোমা। ক্ষতস্থান শুকিয়ে আসতে লাগলো এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল নতুন ক'রে রোগের লক্ষণ ঠেলে উঠছে। চিকিৎসকগণ উপায়ান্তর না দেখে বাম হাতখানি কেটে বাদ দেওয়ার পরামর্শ দিলেন।

মহর্ষির অভিমত জিজ্ঞাসা করা হ'ল। তিনি স্বভাবসিদ্ধ ভাবে উত্তর দিলেন, 'দেহটাই তো একটা রোগ। আগে হোক পরে হোক এ দেহের মৃত্যু ও পতন অনিবার্য। তবে কেন অঙ্গহানি ক'রে এ মিথ্যা আতঙ্কের সৃষ্টি করা! ক্ষতস্থান ভাল ক'রে বেঁধে রাখলেই তো চলে!'

বলা বাহুল্য, ভগবানের এই নির্বিকার সিদ্ধান্ত আশ্রমবাসীরা কেউই খুশি মনে স্বীকার ক'রে নিতে পারেন নি, কারণ বেশ কিছুদিন থেকেই দেখা যাচ্ছিল যে মহর্ষির শরীরে ভাঙন ধরেছে। সামান্য একটু চলাফেরা করতেও যে তাঁর রীতিমত কষ্ট হয়, বাতের বেদনায় পা-দুটি অবশ, কাঁধে পিঠে পর্যন্ত অসহ্য যন্ত্রণা যে তিনি মুখ বুজে সহ্য করেন—এসব বিবরণ তাঁরা জেনেও বহুদিন পর্যন্ত চুপ ক'রেই ছিলেন। ভগবানের মরদেহ দিনে দিনে চোখের সামনে জরাজীর্ণ হ'য়ে উঠছে দেখে তাঁদের দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না। মহাসমারোহে যে বৎসর (১৯৪৬) সুবর্ণ-জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হ'ল, তখন থেকেই সকলের উদ্বিগ্ন দৃষ্টি পড়েছিল মহর্ষির স্বাস্থ্যের দিকে। আশ্রমে সবাই যা খায়, তদতিরিক্ত কোনরকম পথ্যই মহর্ষি কোনমতে গ্রহণ করতে সম্মত হন নি। মাত্র সত্তর বৎসর বয়সেই মহর্ষিকে দেখে মনে হত যেন

তিনি বার্ধক্যের শেষ প্রান্তের কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন। কিন্তু মহর্ষির মুখে সেই এক কথা—'তোমরা কেন ভাবো যে আমার অসুখ করেছে? আমি যেমন ছিলাম তেমনি আছি। আমাকে যদি সুস্থ ভাবো, তাহলেই আমি সুস্থ হতে পারি।'

কে বলবে মহর্ষির পূত, অপাপবিদ্ধ দেহে এত রোগ কোথা থেকে এলো! কথায় বা কাজে দেহকে তিনি কোনদিন স্বীকৃতি দেন নি, দেহ থেকে শুরু ক'রে সমগ্র বস্তুজগতের অস্তিত্বকে সত্য বলে মানেন নি। সেই চিরদিনের অবজ্ঞাত দেহ এখন সুযোগ পেয়ে শত্রুতা করতে ছাড়বে কেন? তা ছাড়া, দেহের উপরে আরও নানা প্রকারের পীড়নও বড় কম হয় নি। কত রকমের ব্যাধি নিয়ে, কত কামনা, কত প্রার্থনা নিয়ে কত লোক এসেছে গেছে ভগবানের কাছে। নীলকণ্ঠের মত ভগবান ব্যথিতের ব্যথা, দুঃখীর দুঃখ, পীড়িতের পীড়া নিঃশব্দে গ্রহণ করেছেন নিজের শরীরে। যারা নিজের প্রারব্ধের বোঝা ভগবানের চরণে অর্পণ ক'রে হাল্কা হ'য়ে চলে গেছে, তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে জানতেও পারে নি কিভাবে এই করুণাময় পরম পুরুষ গণ্ডুষে গণ্ডুষে হলাহল পান ক'রে অখণ্ড মানবতার ঋণ শোধ করেছেন। এই সমস্ত আশ্চর্য কাহিনীর ইতিহাস সঞ্চিত হয়ে আছে মহর্ষির অগণিত ভক্তের মনের মণি-কোঠায়।

চিকিৎসকদের পরামর্শ মানতে অস্বীকার ক'রে মহর্ষি বললেন, 'মিথ্যা দুশ্চিন্তা ক'রে লাভ কি? যথাসময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে।' তাঁর কথাকে যাঁরা বেদবাক্য বলে মনে করতেন, তাঁদের অনেকেই এই কথা শুনে স্বস্তির শ্বাস ফেললেন। ভগবান স্বয়ং বলেছেন, সব ঠিক হয়ে যাবে। তবে আর ভাবনার কি আছে! কিন্তু এই কথাতেও অনেকের উদ্বেগ গেল না, কারণ ঠিক-বেঠিকের দু-রকম সম্ভাবনার অস্তিত্ব ভগবানের কাছে নেই। যা কিছু ঘটে তাঁর কাছে

সবই তো ঠিক। কোনরকম ব্যতিক্রমের প্রশ্নটুকুও যার কাছে নেই তাঁর এই আশ্বাসে সাধারণ মানুষের স্বস্তি বোধ করবার হেতু কোথায়!

এই সময়ে আশ্রমবাসীরা যুক্তি ক'রে ডেকে আনলেন একজন গ্রাম্য চিকিৎসককে। বহু বৎসর পূর্বে ইনি একবার শ্রীভগবানের ভগ্ন কণ্ঠাস্থির চিকিৎসায় সফল হয়েছিলেন। কিন্তু এবারে এঁর চিকিৎসায় রোগের অবস্থা খারাপ হয়ে গিয়ে ক্ষত বিষাক্ত হয়ে উঠলো।

মাদ্রাজের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকমণ্ডলি পরামর্শ ক'রে স্থির করলেন যে অবিলম্বে অস্ত্রোপচার করা প্রয়োজন। তাঁরা বিধান দিলেন যে মহর্ষির প্রাণ রক্ষার আর কোন উপায় নেই। অতঃপর আগস্ট মাসের মাঝামাঝি শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকগণের সম্মিলিত ব্যবস্থায় তৃতীয়বার শ্রীভগবানের দেহে অস্ত্রোপচার হ'ল এবং রোগের পুনরাবির্ভাব প্রতিহত করবার উদ্দেশ্যে রেডিয়াম চিকিৎসাও করা হ'ল। পরবর্তী তিনটি মাস পর্যন্ত মহর্ষি সুস্থ রইলেন। মনে হ'ল যেন তাঁর শরীরেরও খানিকটা উন্নতি হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল কিছুতেই কিছু হবার নয়। ১৯শে ডিসেম্বর ১৯৪৯ তারিখে বিশিষ্ট শল্য-চিকিৎসকগণের সমবেত প্রচেষ্টায় আবার মহর্ষির দেহে হ'ল অস্ত্রোপচার। এবারে দেখা গেল রোগ ভিতরের দিকে মূল বিস্তার ক'রে বিষম জটিল হয়ে উঠেছে। বোঝা গেল, এই চতুর্থবার অস্ত্রোপচারের পরে কোন অবস্থাতে আর মহর্ষির দেহে এ আসুরিক চিকিৎসার প্রয়োগ সম্ভব হবে না।

এখন থেকে হোমিওপ্যাথি ও আয়ুর্বেদ মতে চিকিৎসা চলতে লাগলো। রোগের উপসর্গ উত্তরোত্তর সর্পিল ও দ্রুতগতিতে বেড়ে চললো। রোগ ক্রমে ঠেলে উঠলো বগলের কাছ পর্যন্ত।

এই মারাত্মক রোগের পরিপ্রেক্ষিতে এবার আমরা মহর্ষি রমণের তৎকালিন মনোভাব ও উক্তিগুলি পর্যবেক্ষণ করবো।

প্রথম থেকেই অস্ত্র চিকিৎসার ব্যাপারে মহর্ষি তাঁর নিজস্ব ভাবের কথায় বলেছিলেন, 'তেমন যন্ত্রণা যখন নেই তখন এ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি ক'রে কি হবে? আপনি যা হয় সেই তো ভাল!' আশ্রমের ভক্তরা জানতেন যে কথাটি মহর্ষির সমস্ত কথার মর্মকথা। স্থিরতা, মৌনতা, নিশ্চিন্ততা নিরপেক্ষতার কথাই যিনি সারা জীবন বলে এসেছেন এবং বলার চেয়েও জীবন দিয়ে প্রমাণ ক'রে এসেছেন, নিদারুণ দৈহিক যন্ত্রণাও যে মুহূর্তের জন্য তাঁর অন্তরে বিন্দুমাত্র ভাবান্তর সৃষ্টি করতে পারবে না তা স্বাভাবিক। বরং অনেক সময়ে মনে হতো, ডাক্তারদের সঙ্গে আলোচনায়, মহর্ষি যেন অন্য একজন কার কথা বলছেন।

১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর মাসে, হোমিওপ্যাথি বা আয়ুর্বেদ—কোন পদ্ধতিতে 'চিকিৎসা হবে, সেই প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি হেসে বলেছিলেন, 'চিকিৎসা কি আমি চাইছি? আমার হ'য়ে তোমরাই যদি চিকিৎসার ইচ্ছা ক'রে থাকো তবে তোমরাই মাথা খাটিয়ে যা হয় একটা ঠিক করো। আমাকে জিজ্ঞাসা করলে আমি চিরদিন যা বলে এসেছি তাই বলবো, কোন চিকিৎসারই প্রয়োজন নেই। আপনা থেকে যা হবার, হয়ে যাক!'

ভক্তবৃন্দের আগ্রহাতিশয্যে যখন মহর্ষিকে চিকিৎসার যাবতীয় বিড়ম্বনা স্বীকার ক'রে নিতে হ'ল, তখন দেখা গেল নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছার কিছুমাত্র মর্যাদা যেন তাঁর কাছে আর রইলো না। অত্যন্ত সহজ প্রসন্নতার সঙ্গে তিনি ক্ষণে ক্ষণে সবাইকার দুশ্চিন্তার বোঝা, প্রাণখোলা হাস্যে দিয়েছেন হাল্কা ক'রে। কে বলবে তিনি গুরুতর ভাবে পীড়িত। আগস্ট মাসে, যেদিন তাঁর দেহে তৃতীয় বার অস্ত্রোপচার হ'ল সেইদিন সন্ধ্যাবেলা তাঁর কক্ষের বাইরে শত শত উৎকণ্ঠিত নরনারী অপেক্ষা করছে শুনে, তিনি চিকিৎসকগণের সনির্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা ক'রেও, তাদের ডেকে এনে স্বেচ্ছায় দিলেন

দর্শন। যাঁরা সেইদিন দর্শন পেলেন—তাঁরা দেখলেন, কোথায় রোগী? সেই হাস্যমুখ সদাপ্রসন্ন দেবমূর্তি চিরাচরিত মহত্বে অনিন্দ্য রূপে বিরাজ করছেন।

পরিনির্বাণের দশদিন আগে পর্যন্ত তাঁর প্রাত্যহিক দিনচর্যার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হবার উপায় ছিল না। শরীর এত দুর্বল যে উঠে বসতেও কষ্ট হয়। সেই অবস্থাতেও ভোর পাঁচটায় উঠে প্রাতঃস্নান করেছেন সমাপন। দর্শনপ্রার্থীদের নিয়মিতভাবে দর্শন দিয়েছেন। আশ্রমের চিঠিপত্র পড়েছেন, পাণ্ডুলিপি দেখেছেন, যেমনটি যা হওয়া উচিত সমস্ত বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন। শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর দেবদুর্লভ কণ্ঠ ছিল সতেজ।

মহাপ্রয়াণের এক বৎসর আগে থেকে কত ভাবে কত বারই তিনি তাঁর আসন্ন বিদায়-বার্তার ইঙ্গিত সবাইকে জানিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, 'ভারবাহী কুলি যেমন নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে বোঝা ফেলে দিয়ে হাল্কা হ'য়ে যায়, জ্ঞানীও ঠিক তেমনি ক'রে দেহপাতে হাল্কা হ'য়ে যায়।' বলেছেন, 'দেহবোধ যার নেই দেহান্তরে তার কোনই ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। তার পক্ষে সবই তো আত্ম-স্বরূপ। মিছরি গুঁড়িয়ে ফেললেও তার মিষ্টতার কোন হ্রাস হয় না।'

মহাপ্রস্থানের দুদিন আগে ভাগ্যবান দর্শনপ্রার্থীরা যখন একটির পরে একটি ক'রে তাঁর শয্যাপার্শ্বে এসে দাঁড়াচ্ছিলেন, তখন তাঁদের প্রত্যেকের পানে বিশেষ অর্থপূর্ণ ভাবে দৃষ্টিপাত করেছিলেন। আশ্রমবাসী অনেকেরই তখন মনে হয়েছিল এই তাঁর অন্তিম কৃপাকটাক্ষ—শেষ দৃষ্টি-প্রসাদ। হ'লও ঠিক তাই। পরের দিন, বৃহস্পতিবার সকালে যে দর্শনপ্রার্থীরা তাঁর দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের দিকে চোখ তুলে চাইবার মত শারীরিক শক্তি তাঁর আর ছিল না। কিন্তু তখনো ছিলেন তিনি পূর্ণমাত্রায় সচেতন।

শারীরিক কোন কিছুকেই ভগবান কোনদিন আমল দিতে চান নি। শরীর সম্বন্ধে কোন বোধই তাঁর ছিল বলে মনে হয় না। অস্ত্রোপচারের সময়ে সকলের সঙ্গে সামনে হেসে হেসে কথা বলেছেন। অশক্ত অবশ দেহ ভেঙে পড়তে চাইছে, কিন্তু মুখের হাসিটি কখনো ম্লান হয় নি। রোগযন্ত্রণা চোখে দেখতে না পেরে ভক্তেরা যখন চোখের জল ফেলেছেন, তিনি তখন হাসিমুখে তাদের সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন, 'তোমরা কেন এত বিচলিত হচ্ছো? যন্ত্রণা যা আছে, সে তো এই দেহটার। তোমরা যাকে দেখছো সে কি এই দেহের মধ্যে সীমাবদ্ধ? দেহের যন্ত্রণায় তার কি এসে যায়? মন থাকলে তো থাকবে বেদনার বোধ। মন যেখানে নেই সেখানে যাতনার অস্তিত্ব কোথায়? এই সোজা কথাটা তোমরা বোঝ না কেন? তোমরা ভাবছো ভগবান বুঝি তোমাদের ছেড়ে চলে যাবেন। কিন্তু একথা কেন ভাবো না—তাঁর যাবার স্থান কোথায়, কেমন ক'রেই বা তিনি যাবেন!

শেষ দিনের সামান্য কয়েকদিন আগে পর্যন্ত, যখন আসন্ন বিচ্ছেদের ছায়া গভীর হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত ভক্তের মনে, ভগবানের দিনচর্যার এতটুকু ব্যতিক্রম হবার উপায় ছিল না। ওঠা হাঁটা করবার ক্ষমতা নেই; সামান্য নড়াচড়াতেও বোধ করতেন শ্রান্তি। কিন্তু বাইরে থেকে কিছুই বোঝবার উপায় ছিল না। দৈনন্দিন কৃত্য তখনো সমানভাবে পালন করেছেন, যথাসময়ে সূর্যোদয়ের পূর্বে স্নান ক'রে নিয়মিতভাবে দর্শন দেবার জন্য উঠে বসেছেন, বিছানায় বসেই আশ্রমের প্রাত্যহিক কর্ম করেছেন। অতিথি অভ্যাগতের সুখ-সুবিধার দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। নিজের অসুখের বিষয়ে ডাক্তারদের সাগ্রহ প্রশ্নের উত্তরে হেসে হেসে রসিকতা করেছেন। কথাবার্তা শুনে মনে হয়েছে যেন তাঁর দেহের সঙ্গে বা দেহাশ্রিত ব্যাধির সঙ্গে তাঁর নিজের কিছুমাত্র সম্বন্ধ নেই।

এ যেন অন্য কোন একজনের শরীরের ও রোগের আলোচনা হচ্ছে।

কথায় কথায় একদিন এক ভক্ত সেবককে এই সময়ে বলেছিলেন, 'ছাখো, দেহটা একখণ্ড কলাপাতার মত। ভোজের সময়ে কত-রকমের কত সুখাদ্য এই তুচ্ছ কলাপাতাটার উপরে সাজিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু উৎসবের শেষে কে আর সেটাকে যত্ন ক'রে তুলে রাখে? তার কাজটি হয়ে গেলেই তাকে তো আমরা টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিই। তাই যদি হয়, এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে তোমরা এত ভাবনা করো কেন? তা ছাড়া, ভাবো দেখি আমার কথাটা। এই তো দেখছো কি রকম অপটু অক্ষম হয়ে উঠেছে এই দেহটা। এই ভারি বোঝা নিজে বইতে পারি না: সব বিষয়ে থাকি পরমুখাপেক্ষী হয়ে। তোমরা কি চাও যে এই দুর্বহ ভার আমি বইতে থাকি?'

ভক্তেরা সাশ্রুনেত্রে বলেছিলেন, 'কিন্তু ভগবান, আমাদের যে আপনাকে নইলে চলবে না। আপনার অভাবে আমাদের কি হবে, এই কথা ভেবে আপনি আমাদের জন্য, কৃপা ক'রে এই রোগ ঝেড়ে ফেলে দিতে অনায়াসে পারেন। আপনি এ বিষয়ে একটু চিন্তা করলেই তো সব হয়।'

ভগবান হেসে বলেছিলেন, 'ইচ্ছা করলে না হয় হতে পারে। কিন্তু এই ইচ্ছাটা করবে কে? এমন ইচ্ছা যার মনে আসতে পারতো—তাকে এখন আমি পাই কোথায়? কেবল দেহটা নিয়ে তোমরা এমন মাতামাতি করছো কেন? আমি তো দেহ নই।'

ভগবানের পরম ভক্ত এক পার্শী মহিলা আকুল হ'য়ে কেঁদে বলেছিলেন, 'তোমার এ রোগ আমাকে দাও, ভগবান। তুমি ইচ্ছাময়, দয়া ক'রে আমার এই মিনতি রাখো। আমি অতি কৃতার্থ হ'য়ে এই রোগ ভোগ করি। তোমার সুস্থতায় বিশ্বের কল্যাণ। আমার এই প্রার্থনা তুমি পূর্ণ করো।'

ভগবান রহস্যময় হাসি হেসে বলেছিলেন, 'ভালো কথা। কিন্তু এ রোগ আমাকেই বা দিল কে?'

কে দেবে এই শেষ প্রশ্নের শেষ উত্তর?

কিন্তু এই অতি সহজ প্রশ্নটি প্রতিধ্বনি তুলেছে সমস্ত আশ্রম-বাসী ভক্তের অন্তরে। বড় বেদনার মত বেজেছে প্রত্যেকের প্রাণে। মুখে কেউ কিছু বলে নি, কিন্তু অন্তরে অন্তরে গভীর প্রতীতির সঙ্গে প্রত্যেকেই স্বীকার করেছে নিজ নিজ দায়িত্ব। বুকের মধ্যে ঠেলে উঠেছে অব্যক্ত বেদনা, চোখের জলে ফুটে উঠেছে মর্মন্তুদ স্বীকৃতি। প্রত্যেকের হৃদয় বিদীর্ণ ক'রে ঝঙ্কৃত হয়েছে নিরুপায় হাহাকার··· 'আমাদের আধিব্যাধি হরণ ক'রে তুমি হয়েছ জীর্ণ, শীর্ণ, পাণ্ডুর, হতশ্রী। আমাদের দুষ্কৃতির গুরুভার বরণ ক'রে তোমার দেহ হয়েছে বিবর্ণ। আমাদের সঞ্চিত কর্মের যাবতীয় মালিন্য নিজের শরীরে গ্রহণ ক'রে তুমি আমাদের মুক্তি দিয়েছো। দিনের পর দিন আমাদের যত গ্লানি, যত পাপ, যত বেদনা নৈবেদ্যের মত ক'রে সাজিয়ে এনে আমরাই তোমাকে নিবেদন ক'রে দিয়েছি। করুণার অবতার তুমি ভগবান, তুমি আমাদের ক্লেদাক্ত, বিষাক্ত অর্ঘ্য প্রীতিপ্রসন্ন চিত্তে প্রতিদিন গ্রহণ করেছো। তোমার এ রোগ যে আমাদের দেহমনের ব্যাধি, তোমার এই কঙ্কালসার দেহ যে আমাদেরই কৃতিত্ব, তোমার এই দুঃসহ অব্যক্ত যন্ত্রণা যে আমাদেরই আদরের গুরুদক্ষিণা, একথা তুমি অন্তর্যামী পুরুষ যেমন ক'রে জানো, আমরা অজ্ঞান অপজাত হয়েও তার চেয়ে কিছু কম জানি না। তোমার এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে আমাদের সবাইকে সমস্বরে আর্তনাদ ক'রে বলতে হয়— 'আমরা, আমরা, আমরা তোমার সমস্ত আধিব্যাধির হেতু।'

ভগবান হাসিমুখে নিজের মনে প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা ক'রে আর কিছুই বললেন না।

একটু পরে ভক্তবৃন্দের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মনে করো

একজন ভাড়া করা লোকের মাথায় ভারি একটা জ্বালানি কাঠের বোঝা চাপিয়ে, তাকে সঙ্গে নিয়ে তুমি নিজের বাড়ি ফিরছো। তোমার হয়তো পথে চলায় আনন্দ আছে, কিন্তু বাহকটি ভাবছে কতক্ষণে গন্তব্য স্থানে পৌঁছে সে তার মাথার গুরুভার নামিয়ে দিয়ে হাল্কা হতে পারবে। ঠিক এমনি ক'রে জ্ঞানী তাঁর দেহের ভার থেকে মুক্তি চান।'

এই পর্যন্ত বলেই ভগবান নিজেই নিজের উক্তি সংশোধন ক'রে বললেন, 'উপমা তো আর অক্ষরে অক্ষরে সত্য নয়। এই উপমা জ্ঞানীর ক্ষেত্রে পুরোপুরি খাটে না। আত্মজ্ঞানী যে, তার দেহবোধ নেই; অতএব বোঝা নামানোর আগ্রহ বা অনাগ্রহ তার নেই। দেহের অস্তিত্ব থাকা আর না থাকায় বিশেষ কোন পার্থক্য সে অনুভব করে না বলেই এ বিষয়ে সে থাকে একান্ত নিস্পৃহ।'

বৃহস্পতিবার সকালে সেবকেরা এলেন সেবা করতে। মহর্ষি বললেন, 'যাও নিজের কাজ করো গে—আত্মচিন্তা করো গে।' ডাক্তারকে বললেন, 'ঔষধের আর দরকার নেই। দু-দিনের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে।' কথাগুলি কি অর্থে তিনি বলেছিলেন তার চূড়ান্ত মীমাংসা পরের দিনেই হয়ে গেল। কিন্তু সরলপ্রাণ বহু ভক্তেরই মনে কথাগুলি শুনে আশা হয়েছিল বুঝি ভগবান এ যাত্রা ভক্তদের ছেড়ে যাবেন না।

শুক্রবার ১৪ই এপ্রিল ১৯৫০ তারিখের সকাল থেকে মহর্ষি শয্যা ছেড়ে উঠে বসেন নি। কিন্তু সারাদিন পুরোপুরি জ্ঞান ছিল। সেদিনও অপরাহ্নে দর্শনার্থী নরনারী একে একে এসে শেষ দর্শন লাভ করেছেন। পরিনির্বাণের দু-ঘণ্টা আগে মহর্ষি শায়িত অবস্থা থেকে উঠে বসতে চাইলেন। অতি সন্তর্পণে দেবদেহ সেবকেরা তুলে বসিয়ে দিলেন। দুর্বলতার জন্য মাথাটি সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ছিল বলে সেবকেরা সেটিকে যথাস্থানে ধরে রাখলেন।

সন্ধ্যার পর থেকেই ধীরে ধীরে শ্বাস গভীর হয়ে উঠতে লাগলো। সেবক ও ডাক্তারে মিলে মহর্ষির ঘরে তখন মাত্র দশ-বারোজন ছিলেন উপস্থিত। শ্বাস গভীর হতে গভীরতর হয়ে উঠতে লাগলো। কক্ষের মধ্যে নিরুদ্ধ নিস্তব্ধতা। বাইরের আকাশে বাতাসে অখণ্ড নীরবতা। সন্ধ্যার ছায়া অরুণাচল পর্বতের শিখরে ক্রমেই গাঢ় হতে গাঢ়তর হয়ে উঠছে।

ভগবানের দৈহিক অবস্থা দেখে সকলেই সেদিন মনেপ্রাণে বুঝেছিলেন যে এ-যাত্রায় আর কোন আশা নেই। সেবকরা সেবা করতে এসে নিরাশ হয়ে ফিরে গেলেন। কথা বলবার ক্ষমতা নেই, সোজা হয়ে বসতে পর্যন্ত পারলেন না। তবু প্রসন্ন স্নিগ্ধ হাস্যে সেবকদের বললেন : 'এই দেহটার জন্য আর কিছুরই প্রয়োজন নেই : তোমরা যাও, আত্মচিন্তা করো। তোমরা এ দেহের বহু সেবা করেছ। ইংরেজরা বলে ধন্যবাদ। আমরা বলি সন্তোষম্। 'সেই কথাই তোমাদের বলছি।'

দ্বিপ্রহরের সময় সামান্য একটু পানীয় নিয়ে সেবকেরা যখন কাছে এসে দাঁড়ালেন, চিরদিনের অভ্যাস বশে কটা বেজেছে একবার জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তর পাবার আগেই বললেন, 'সময় নিয়ে আর কি হবে? এখন থেকে সময়ের আর প্রয়োজন নেই।'

সারাদিন ধরে সন্ধ্যা পর্যন্ত সেদিন দর্শনপ্রার্থীর ভীড় লেগেই ছিল। সূর্যাস্তের পরে পর্যন্ত নিঃশব্দে এসেছে কত দেশের কত লোক। আশ্রমবাসীরা কেউ ঘরে ফিরে যায় নি। দলে দলে সার বেঁধে এসেছে অসংখ্য নরনারী মৃত্যুপথযাত্রী পরম পুরুষকে শেষ দেখা দেখে যাবার জন্য। দর্শনপ্রার্থীদের দর্শন দেবার জন্য আশ্রমের সমস্ত দ্বার রইলো অবারিত। পাছে তাদের দর্শনের অসুবিধা হয়, তাই ভগবান অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত অবশ দেহটিকে শয্যায় শোয়াতে দেন নি। ডাক্তারদের ও সেবকদের ঐকান্তিক নির্বন্ধ অগ্রাহ্য ক'রে

শেষ পর্যন্ত তিনি উপবিষ্ট রয়ে গেলেন। যখন প্রবল শ্বাস-কষ্টে নিশ্বাস ফেলার শ্রমটুকুও আর সইছে না, চিকিৎসকেরা অক্সিজেন দেবার ব্যবস্থা করলেন। ডান হাত নেড়ে তিনি সে প্রয়াস থামিয়ে দিলেন। নির্বাক ইশারায় বুঝিয়ে দিলেন যে, সে বিড়ম্বনার আর প্রয়োজন নেই। দুঃসহ যন্ত্রণায় সারা দেহ যখন জর্জরিত, সেই চরম ক্ষণেও তাঁর প্রশান্ত প্রসন্ন মুখে এতটুকু যন্ত্রণার আভাস নেই। সেই অন্তিম ক্ষণেও সেবকদের প্রত্যেকের মুখের পানে চেয়ে দৃষ্টির সুধা বর্ষণ করেছেন।

ঘরের বাইরে বিস্তৃত অঙ্গন জুড়ে অসংখ্য ভক্ত চিত্রার্পিতের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দূর থেকে ভগবানকে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু দুজন সেবক ভগবানকে দুপাশ থেকে তালপাতার পাখা দিয়ে হাওয়া করছে। সেই দুটি ব্যজনীর সঞ্চালন দেখে সবাই অন্তরে অন্তরে টের পাচ্ছে যে মহাপ্রাণ এখনো মরদেহের অধিষ্ঠান ছেড়ে যায় নি। কারুর মুখে কথা নেই। সন্ধ্যার অন্ধকারে নিঃশব্দে ঝরে পড়ছে ধারায় ধারায় অশ্রুজল। জনতার ভীড়ে মিশিয়ে আছে বিভিন্ন দেশের সাংবাদিক। তারাও যেন তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অকস্মাৎ আত্মবিস্মৃত হয়ে সবাইকার সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেছে। সঞ্চরণশীল দুটি হাতপাখার গতি পথে আবর্তিত হচ্ছে সমভাবে সকলের অন্তর।

বহুদূর থেকে ভেসে এলো কোন এক মন্দিরের সন্ধ্যারতির শঙ্খধ্বনি। সঙ্গে সঙ্গে স্বতঃপ্রবৃত্ত উচ্ছ্বাসে বাইরের একদল মৃদুস্বরে অরুণাচল-শিবস্তোত্র গেয়ে উঠলেন। মনে হ'ল যেন ভগবানের অমর আত্মা এই সঙ্কেতটির জন্যই অপেক্ষা ক'রে ছিলেন। মন্ত্রধ্বনি কানে আসার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ-বিস্ফারিত দুটি চোখ মেলে ভগবান সম্মুখের দিকে চাইলেন। মৃদু-মধুর প্রসন্ন হাস্যে যেন বিশ্বাতীত অমৃত ঝরে পড়লো। দুটি চোখের প্রান্ত বেয়ে আনন্দাশ্রু গড়িয়ে

পড়লো। গভীর একটি নিশ্বাস পতনের সঙ্গে সঙ্গে দেহ স্থির হয়ে গেল।

রাত্রি ৮টা ৪৭ মিনিটের সময় মহাপ্রয়াণের লগ্নটি এসে উপনীত হ'ল। ধীরে ধীরে শেষ নিশ্বাসটি মৃদু থেকে মৃদুতর হতে হতে পরব্যোমে গেল মিলিয়ে। ভাগ্যক্রমে যাঁরা কাছে ছিলেন তাঁরা সবাই রইলেন মন্ত্রমুগ্ধের মত স্তব্ধ হয়ে। বিদেহ মহাপুরুষের পরম প্রভাবে এই চরম ক্ষণেও মনে এলো না এতটুকু শোকের ছায়া। সকলেরই মনে হতে লাগলো তিনি রয়েছেন—আরও পরিপূর্ণভাবে, মরণাতীত গভীরভাবে তিনি বিদ্যমান। জীর্ণ বস্ত্রের মত অপ্রয়োজনীয় দেহটিকে পরিত্যাগ ক'রে দেহাতীত পরম সত্তায় ভাস্বর হয়ে তিনি আছেন।

মহর্ষি রমণের মহাপ্রয়াণ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য একটি নৈসর্গিক ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়। রাত্রি ৮টা ৪০ মিনিটের সময় যখন তাঁর শেষ নিশ্বাসটি অনন্ত মহাব্যোমে মিলিয়ে গেল, ঠিক সেই মুহূর্তে বহুদূরব্যাপী গগনের বক্ষ চিরে, অত্যুজ্জ্বল উল্কাপাতের মত একটি জ্যোতি-শিখা অরুণাচল পর্বতের শিখরে এসে গিয়েছিল মিলিয়ে। সমগ্র দক্ষিণ ভারতের লক্ষ লক্ষ লোকের দৃষ্টি যখন এই জ্যোতির উপরে নিবদ্ধ ছিল, তখন মহর্ষির কক্ষের দশ-বারোজন সেবক একদৃষ্টে মহর্ষির মুখের পানে চেয়ে ছিলেন।

মাথার উপরে দুটি পাখার সঞ্চালন থেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সকলের সমস্ত উৎকণ্ঠারও হ'ল পরিসমাপ্তি। কিন্তু স্তোত্র-গীতি সমানে চলতে লাগলো। যে যেখানে ছিল সবাইকার দৃষ্টি জুড়ে অন্তর জুড়ে রইলেন একমাত্র অমৃত-ধাম-যাত্রী ভগবান; তাই মহাকাশের কোন জ্যোতিষ্কের পানে চাইবার অবসর সমাগত ভক্তবৃন্দের হয় নি।

কিছুক্ষণ পরে গান থামার সঙ্গে সঙ্গে উঠলো শোকের ঝড়।

ক্রন্দনরত নরনারী চারিদিক থেকে ভীড় ক'রে প্রাণহীন দেহটির চারিপাশে এসে দাঁড়ালো। গগন মুখরিত হ'য়ে উঠলো সকলের সমবেত রোদনধ্বনিতে। সকলে মিলে ধরাধরি ক'রে দেহটিকে বারান্দায় এনে, পুষ্পমাল্যে সাজিয়ে বড় ঘরে এনে বসালো। ভক্তেরা সারারাত জেগে সেখানে বসে রইলেন। অরুণাচল শিবস্তোত্র ধ্বনিত হতে লাগলো অগণিত শোভাযাত্রীর মুখে মুখে। শোভাযাত্রার পরে শোভাযাত্রা আসতে লাগলো, দূরের সহর থেকে, নিকটের গ্রাম থেকে। মহাপ্রয়াণের মহোৎসব চললো সারারাত্রি ধরে নগর সংকীর্তনের রূপে।

দুঃখের রাত্রি পোহাতে না পোহাতেই শুরু হ'য়ে গেল শেষকৃত্যের তৎপরতা। ভগবানের পরিত্যক্ত দেহটি সমাহিত হ'ল পুরানো হলঘর ও মায়ের মন্দিরের মাঝামাঝি একটি স্থানে। সমাধির উপরে স্থাপিত হ'ল কালো পাথরের শিবলিঙ্গ। নির্বাক জনতা শোকে মুহ্যমান হয়ে চারিদিকে ভীড় ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো শেষ পর্যন্ত। বাইরে থেকে যারা এসেছিলো, তারা যে-যার ঘরে শূন্য মনে ফিরে গেল। আশ্রমের অধিবাসী, যাঁরা বৎসরের পর বৎসর ধরে একমাত্র ভগবানকে অবলম্বন ক'রেই পড়ে ছিলেন, তাঁদের অনেকেরই যাবার কোন স্থান ছিল না। স্থান থাকলেও, স্থানান্তরে যাবার কল্পনাও তাঁদের মনে হয় নি। বিদেহ ভগবানকে নিয়েই তাঁরা অরুণাচলের পাদমূলে রয়ে গেলেন। অন্তরে অন্তরে তাঁরা ভগবানের প্রত্যক্ষ অস্তিত্ব সর্বদাই অনুভব করেন, তাঁর কথা শুনতে পান, নির্ভরতার কেন্দ্রে কেন্দ্রে তাঁর নিত্য আবির্ভাব উপলব্ধি করেন। এমন কি, ভগবানের দেহান্তরের পরে নবাগত যাঁরা এখানে আসেন—তাঁরাও বলেন, 'এমন শান্তির স্থান আর কোথাও নেই। কে বলে ভগবান নেই? এখানকার ধূলিকণা থেকে আকাশ আলো পর্যন্ত ভগবান-ময় হ'য়ে আছে। ধ্যান এখানে চেষ্টা ক'রে করতে হয় না, আপনাআপনি

হয়ে যায়। এই আশ্চর্য স্তব্ধ মৌনতা প্রাণের মধ্যে মুখ রেখে অন্তরের গভীরতম লোকে আকর্ষণ ক'রে। জাগ্রত এই মহাতীর্থে এসে একটুখানি থাকলেই জাগরণের সাড়া লাগে সুপ্ত প্রাণে। মন্দিরে মন্দিরে কতই তো ঘুরেছি, পুণ্যভূমি কতই তো দেখেছি—কিন্তু এখানকার তুলনা কোথাও নেই।'

মহর্ষির লৌকিক লীলার কথা যেটুকু এই সামান্য জীবনীতে বলা হ'ল, এর মধ্যে এই অলৌকিক পরম পুরুষের পরিচয় কতটুকুই বা ফুটে উঠেছে! ঈশ্বরের সঠিক পরিচয় দিতে পারে আর একজন ঈশ্বর। ভগবান রমণের পরিচয় সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাটাই খাটে। গঙ্গাজল স্পর্শ ক'রে লোকে যেমন ক'রে পবিত্র হয়, তেমনি পবিত্র হয় ভগবানের জীবনী প্রসঙ্গে। মহর্ষি রমণের জীবন ভাগীরথীর পবিত্র বারি, এই পুণ্যকথা প্রসঙ্গে স্পর্শ ক'রে আমার ধন্য হয়েছি। ভগবান রমণের জয় হোক্।

LIBRARY
No.....
Shri Shri ... Ashram
BANARAS.

মিলারেপা ঃ তিব্বতের প্রাণপুরুষ

মহর্ষি রমণ তাঁর অগণিত ভক্তবৃন্দকে বারংবার যে একটিমাত্র জীবন-কাহিনী পাঠে অনুপ্রাণিত করেছেন, তা হ'ল তিব্বতের প্রাণপুরুষ মিলারেপার কাহিনী।

বাংলা দেশের যোগ ও তন্ত্রের প্রভাব শিশুকাল থেকেই মিলার জীবনে কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল, এবং বহু আয়াসে, বহু বেদনায়, অমানুষিক ত্যাগে ও অধ্যবসায়ে কেমন ক'রে তিনি ঘরের মায়া, মায়ের স্নেহ, প্রণয়িনীর প্রেমবন্ধন কাটিয়ে বহুপ্রার্থিত পরম-ধামে উপনীত হয়েছিলেন, তারই অনিন্দ্যসুন্দর কাহিনী উপন্যাসের মত ক'রে এই অনুপম গ্রন্থখানিতে বর্ণিত হয়েছে। লেখক শ্রীবিভুপদ কীর্তি পায়ে হেঁটে নেপাল তিব্বত সিকিম সীমান্তে ঘুরে ঘুরে, মিলারেপা-জীবনীর বহু তথ্য সংগ্রহ ক'রে এই বইখানিতে সন্নিবিষ্ট করেছেন।

শেফালিকা প্রকাশনী কর্তৃক অধুনা প্রকাশিত এই গ্রন্থখানি কলিকাতা বেতারকেন্দ্রে ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হয়েছে।

প্রকাশকের কাছে ছাড়াও বইখানি 'গ্রন্থপ্রকাশ'-এ পাওয়া যায়। দাম চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

বারো-চোদ্দ বছর বয়সের যে স্বপ্নাতুর শিশুটি অরুণাচলের নিঃশব্দ আহ্বানে জননীর স্নেহাঞ্চল ছেড়ে অজানা অন্তরের প্রেরণায় অকূলের পথে পাড়ি দিলেন এবং নিজের শাশ্বত কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত হ'য়ে পৃথিবীর দেশ-দেশান্তরের পথহারার চোখের সামনে নতুন আশার ও আলোকের মহাকাশ উন্মুক্ত ক'রে দিলেন, এই মহা-জীবনীতে আছে তাঁরই অলোক-সামান্য জীবনী ও বাণীর রেখাচিত্র।

অবিস্মরণীয় এই আশ্চর্য গ্রন্থটির যে তুলনা নেই, এই কথাটিই 'দেশ', বসুমতী', 'ভারত-বর্ষ', 'আনন্দবাজার' ইত্যাদি পত্রিকার সমালোচকেরা উচ্ছ্বসিত ভাবে বলেছিলেন, যখন এই বই-খানি বারো বছর আগে মহর্ষি রমণের প্রথম জীবন-কাহিনী রূপে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল। পরিবর্ধিত এই দ্বিতীয় সংস্করণে সেই দূরের মানুষটি, আরো অনেক কাছে সরে এসে যেন ঘরের মানুষ হ'য়ে গেছেন।

প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় যে-কথা বলা হয়েছে, সেই সার্থক কথাটির পুনরাবৃত্তি ক'রে বলা যায় যে এই গ্রন্থখানির শ্রেষ্ঠ গৌরব এই যে এর প্রাথমিক পাণ্ডুলিপি মহর্ষি স্বয়ং আগাগোড়া পড়ে-ছিলেন।